বৃটিশবিরোধী
স্বাধীনতা সংগ্রামে
মুসলমানদের
ভূমিকা
সত্যেন সেন

প্রকাশকের কথা

'বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা' সর্বজন-শ্রদ্ধেয় লেখক সত্যেন সেনের জীবন-উপান্তের রচনা। তিনি তখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন প্রায় সম্পূর্ণভাবে, নানা ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে শরীর কিন্তু মনের দিক দিয়ে অজেয় এই চির-সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব দু'জন সহকর্মীর সাহায্যে মুখে মুখে বলে প্রস্তুত করেছিলেন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। তাঁর ইচ্ছে ছিল শেরে-বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক বিষয়ক একটি অধ্যায় গ্রন্থে সংযোজন করবেন, তবে অসুস্থতাবশতঃ শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে উঠেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি হিসেবেই বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

সত্যেন সেনের অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আমরা সম্মানিত ও আনন্দিত বোধ করছি। আমাদের হাতে পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের জন্য তুলে দিয়েছেন কালিকলম প্রকাশনীর জনাব আবদুল আলীম, আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ মফিদুল হক

সূচীপত্র

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা

১৮০৩ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। ভারতের রাজধানী-দিল্লী-শহর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এসে গেল, আসলে এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। বহুদিন আগে থেকেই ভারতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাঁকে এই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। যাদের দেখবার মত চোখ ছিল, তারা দেখতেও পাচ্ছিলেন যে, তার সর্বদেহে ক্ষয়রোগের লক্ষণগুলি ফুটে উঠছে। এ এক বিরাট মহীরুহ, যার ভিতরকার সমস্ত সার পদার্থ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাহলেও সাধারণের দৃষ্টির সামনে এতদিন সে তার প্রভুত্বব্যঞ্জক মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, অবশেষে সেই মহীরুহের পতন ঘটল; চমকিত হয়ে উঠল সবাই। দিল্লীশ্বরেরা জগদীশ্বরেরা শেষকালে এই হল তার পরিণতি।

মুঘল সাম্রাজ্য, সত্য কথা বলতে গেলে একেবারে বিনা বাধায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের খাস তালুকে পরিণত হয়ে গেল। বহুকাল আগে থেকেই ভারতের অপরিমিত ধন সম্পদের সত্য ও কল্পিত কাহিনী সারা বিশ্বময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। তার মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় জলদস্যু ও বণিকের দল একের পর এক উন্মত্তের মত ছুটে আসছিল এবং তাদের পরস্পরের হানাহানির ফলে সমুদ্রের জল ও স্থলভূমি রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠেছিল—অবশেষে তার চূড়ান্ত অবসান ঘটল। ভাগ্যের নির্দেশে যাঁরা আগে এসেছিল তারা পিছনে পড়ে গেল। আর ভাগ্যলক্ষ্মী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠে তাঁর জয়মালা পরিয়ে দিলেন।

চমকিত হয়ে উঠল সবাই। যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা জেগে উঠল, যারা বসে ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এই পর্যন্তই, এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত শক্তি তাদের ছিল কি? হয়তো তা ছিল, কিন্তু এই উন্নততর মারণাস্ত্রে সু-সজ্জিত শক্তির বিরুদ্ধে কে তাদের সংগঠিত করবে, কে

তাদের নেতৃত্ব দেবে? তাদের নেতৃস্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর প্রভুরা তখন মধুপানে মত্ত হয়ে বিলাস ব্যসনে ডুবে আছেন। কে জানে হয়তো তখনও তারা নিশ্চিন্ত মনে সুখ স্বপ্ন দেখছিলেন—দিল্লী অনেক দূর।

প্রতিরোধ কি একেবারেই আসে নি? বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কি ক্রমে ক্রমেই জমে উঠছিলো না? কিন্তু বিক্ষোভ যতদিন পর্যন্ত চাপা দেওয়া আগুনের মত ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে, ততদিন ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ এল মুসলমান উলেমা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে।

মূলতঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসন অসহনীয় বলে তাদের কাছে মনে হয়েছিলো। কিন্তু যে কোনও ধর্মই হোক, ধর্মীয় জীবন বৈষয়িক জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য।

প্রথম প্রতিবাদ তুললেন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্। মুসলমানদের হাত থেকে বাদশাহী শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কাজেই আঘাতটা মুসলমানদের মনেই বেশী করে বাজবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই তাদের এই বিরোধিতা হয়তো এই ধর্মীয় নেতার অভিমতের মধ্য দিয়েই রূপ নিয়েছিলো।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ স্পষ্টই রায় দিলেন যে, ইসলাম তাঁর ধর্মীয় বিধান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, এই দুই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই এই পরাধীন পরিবেশে ইসলাম কখনই সজীবতা ও স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না। তাঁর এই সূত্রটির যুক্তিযুক্ত রূপায়ণ ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে তার শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে এসেছিলেন। সেই দীর্ঘায়ত সংগ্রামের অতি সামান্য অংশই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আর তা খণ্ডে খণ্ডে ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে পরিচালিত হয়ে এসেছিলো। তাঁদের চরিত্র ও ভূমিকা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এই জেহাদকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া চলে কি না এ বিষয়ে রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্-এর পুত্র ও তার পরবর্তী ধর্মগুরু আবদুল আজিজ তাঁর পিতার এই সূত্রটিকে কার্যকরী রূপে সম্প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় মুসলমানরা এই পরাধীন অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এই পরিবেশের মধ্যে কোনও প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে যথাযথভাবে ধর্মাচরণ করে চলা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে, ভারত হচ্ছে 'দার-উল-হরব' অর্থাৎ 'যুদ্ধরত দেশ।' তিনি এদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক ফতোয়া জারি করলেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদে শরীক হওয়া তাদের সকলের ধর্মীয় কর্তব্য। আর বৃটিশ শক্তিকে যদি তারা তাদের তুলনায় অনেক বেশি প্রবল বলে মনে করে অর্থাৎ এই সংগ্রামে যদি জয়লাভের আশা না থাকে, তবে তারা যেন অন্যান্য স্বাধীন মুসলমান দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বাইরের সেই সমস্ত শক্তির সাহায্য নিয়ে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতারিত করতে হবে। বাইরের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি যে এ বিষয়ে তাদের অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করবে এ সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না।

শাহ্ আবদুল আজিজের এই ফতোয়া ভারতের মুসলমানদের এক অংশের মনে সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর এই আহ্বানে তারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলো। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও মুসলমান রাষ্ট্রগুলির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধর্মগুরু আবদুল আজিজের কোন স্পষ্ট ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিলো না। 'আর যারা তাঁর এই ফতোয়াকে মান্য করে বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছিলেন এবং এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে যে সাহস, সংগঠনশক্তি ও আত্ম-ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই উত্তরাধিকার আমরা গর্বের সাথে বহন করি। এই ইতিহাসকে অবহেলা করে বিস্মৃতির তলায় চাপা দেওয়া এক জাতীয় অপরাধ।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী এই বৃটিশ বিরোধী জেহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল ক'জনেই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সু-পরিচিত। কিন্তু এ কথাটা সত্য

নয়। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নামকরণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আবছল ওয়াহ্হাবের প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কোনও সংযোগ ছিলোনা। তবুও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।

সৈয়দ আহমদ উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর অনুবর্তী ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীনতার আদর্শ থেকে তিনি তাঁর আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৮০৮ সালে তিনি তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে আসেন এবং বিবাহ করেন। তিনি যে আদর্শ নিয়ে পথে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনি 'টঙ্ক' রাজ্যের আমীরের কাছে এসে তাঁর সৈন্য বিভাগে যোগদান করেন। 'টঙ্ক' তখনও স্বাধীন রাজ্য ছিলো। তার ভবিষ্যৎ সংগ্রামী জীবনের পক্ষে এটা খুবই কাজে লেগেছিলো। এখানেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কেও তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ১৮১৭ সালে 'টঙ্ক' রাজ্যের আমীর যখন বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন, তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন।

'টঙ্ক' রাজ্য থেকে ফিরে এসে তিনি উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভ্রমণ করলেন এবং মীরাট, মজঃফরনগর ও সাহারানপুর জেলার উল্লেখযোগ্য শহর ও গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করলেন। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণে তিনি এলাহাবাদ, বারানসী, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ জেলাগুলি এবং তৃতীয়বারের ভ্রমণে রোহিলাখণ্ড অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন।

তিনি যেখানেই গেছেন সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। তাঁর উপদেশ শোনার জন্যে বহুলোক এসে জমায়েত হোত। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর মূল উপদেশ ছিলো দুটি—প্রথমতঃ খোদার কোনও শরিক নেই, তিনি একেশ্বর, একচ্ছত্র এবং ফেরেস্তা, ধর্মগুরু, পয়গম্বর বা পীর যেই হোক না কেন, খোদা আর মানুষের মধ্যে কেউ মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। মানুষকে সরাসরি খোদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, সত্যকারের মুসলমান বৃহৎ ব্যাপারেই হোক বা

সামান্য ব্যাপারেই হোক কোরান কর্তৃক নির্দেশিত বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন কোনও বিধান গ্রহণ করতে পারে না। সৈয়দ আহমদের সরল অনাড়ম্বর জীবন, তাঁর জ্বলন্ত আদর্শ নিষ্ঠা, গভীর আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ চরিত্রের জন্য যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সুফল ফলেছে। তাঁর বহু ভক্ত তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলাকে তাদের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করবার আগে তিনি মক্কায় তীর্থযাত্রা করার সংকল্প করলেন। ১৮২১ সালের জুলাই মাসে তিনি রাইবেরিলি থেকে মক্কার পথে কলকাতায় যাত্রা করলেন। এক বছর বাদে ১৮২২ সালে তিনি যখন মদিনায় গিয়ে পোঁছলেন, তখন দেখা গেল তাঁর পিছন পিছন ৮০০ জন ভক্ত চলে এসেছে। তিনি যখন রাইবেরিলি থেকে যাত্রা করেন তখন তাঁর সঙ্গে একটি কপর্দকও ছিলো না। অথচ এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তাঁদের ৭০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। আথিক সম্পদ বলতে তাঁর নিজের কিছুই ছিলো না। এই সমস্ত টাকা তাঁর অনুরাগী ও ভক্তরাই যুগিয়েছিলো। এর দুবছর বাদে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন।

এই দু' বছর আরবে বাস করে কি শিখে এলেন তিনি? এখানে এসে তাঁর সারা বিশ্বের মুসলমানদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল। আরও দেখতে পেলেন যে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কি দ্রুত-গতিতে প্রাচ্যের দেশগুলিকে একের পর এক গ্রাস করে চলেছে। এই কঠিন অভিজ্ঞতা ভাবাবেগ সম্পন্ন স্বপ্নালু সৈয়দ আহমেদকে বাস্তববোধসম্পন্ন নির্ভীক যোদ্ধায় পরিণত করল। স্বদেশে পদার্পণের সাথে সাথেই তিনি তাঁর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করে তোলার কাজে লেগে গেলেন। এই আন্দোলনকে সহজে দমন করে দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই বিদ্রোহের আগুন প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে অনির্বাণভাবে জ্বলেছিলো।

এই জেহাদের প্রস্তুতি হিসাবে তিনটি প্রাথমিক কাজে হাত দেওয়া হয়েছিলো: ১. শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যোদ্ধা ও উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করা। ২. এই বাহিনীকে

পরিচালিত করার জন্য একজন যোগ্য নেতা মনোনীত করা। ৩. এই যোদ্ধাদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্যে মুসলমান শাসিত কোনও অঞ্চল নির্বাচিত করা।

প্রথম দুটি কাজ সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগলো না। জেহাদের জন্য ভারত থেকে কয়েক শত যোদ্ধা সংগ্রহ করা হল এবং সৈয়দ আহমদ তাদের ইমাম হিসেবে মনোনীত হলেন। কিন্তু তৃতীয় কাজটির ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিল। তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের সীমার মধ্যে কোনও মুসলমান শাসিত স্বাধীন অঞ্চল ছিলো না। কাজেই বাধ্য হয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে তাঁদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হল। সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় অধিবাসীরা স্বভাবতই ধর্মোন্মাদ, মোল্লারা প্রয়োজন হলেই এই ধর্মমত্ততাকে তাঁদের কাজে লাগিয়ে এসেছে।

এখন প্রথম কাজ হল এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ধর্মযোদ্ধাদের 'দার-উল-হরব' অর্থাৎ 'যুদ্ধরত দেশ' ভারত থেকে হিজরত করিয়ে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের রাজ্য সীমান্ত প্রদেশে নিয়ে আসা। জেহাদের সংকল্পকে সামনে নিয়ে পাঁচ ছয় শত ধর্মযোদ্ধা ভারত ছেড়ে সীমান্ত প্রদেশে চলে এল। তাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক ও শিশুও ছিলো আর আর্থিক সম্বল বলতে তাদের সঙ্গে ছিলো পাঁচ হাজার টাকা। ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বাধীনে এই অভিযাত্রীদল রায়বেরিলি থেকে যাত্রা করেছিলো। পরিচালনার ব্যাপারে সৈয়দ আহমদকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজনকে নিয়ে একটি পরামর্শ পরিষদ গঠন করা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে দুজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন শাহ আবদুল আজিজের নিকট আত্মীয় মহম্মদ ইসমাইল ও আবদুল হাই। যাত্রার পর এই অভিযাত্রীদল প্রথম বিশ্রাম নিল গোয়ালিয়রে এসে। গোয়ালিয়রের মহারাজা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এইখানে বাহিনীটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। মধ্যভাগ, সম্মুখভাগ, দক্ষিণপার্শ্ব, বামপার্শ্ব ও সর্বশেষে বাহিনীর অনুচরবর্গ (camp followers)। গোয়ালিয়র থেকে তারা 'টঙ্ক' রাজ্যে এলো। সেখান থেকে আজমীরে, তার পরে রাজপুতানা হয়ে সিন্ধুতে এসে থামলো।

সিন্ধুর হায়দ্রাবাদে বিদ্রোহীরা এই প্রথম তাদের স্বধর্মীদের মধ্যে এসে পড়ল। তারা আশা করেছিল যে সিন্ধুর আমীরের কাছ থেকে যথোচিত সাহায্য পাবে। কিন্তু আমীরের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে তারা শিকারপুরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সৈয়দ আহমদ শিকারপুরের নেতৃস্থানীয়দের ও উলেমা সম্প্রদায়কে তাদের এই জেহাদে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের কাছ থেকেও তারা কোনও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেলেন না। আরো দূরে চলে যেতে হবে তাদের। তখন তারা বাধ্য হয়ে বেলুচিস্তানের মরুভূমি ও পার্বত্য-অঞ্চল অতিক্রম করে বুলানপাশ-এর মধ্য দিয়ে কোয়েটায় চলে গেল। তারপর কোয়েটা থেকে কান্দাহার, গজনী ও কাবুল হয়ে অবশেষে ১৮২৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারা পেশোয়ার গিয়ে পৌঁছলো। এই যাত্রায় তাদের প্রায় দশ মাস সময় লেগেছিলো এবং প্রায় তিন হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করতে হয়েছিলো।

এটা খুবই আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে যে বিদ্রোহীদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীটি ভারতের নানা অঞ্চল অতিক্রম করে স্বচ্ছন্দে চলে গেল। অথচ ভারত সরকার সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বসে বসে তা দেখলেন। তাদের কোন রকম বাধা দিলেন না। এ ক্ষেত্রে বৃটিশ কূটনীতির খেলোয়াড়েরা খুব পাকা চাল চেলেছিলেন। এরা বৃটিশ রাজ্যের সীমানা ছেড়ে যে অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছিল, সেটা রণজিৎ সিংএর রাজ্যের গা ঘেঁষে আছে। কাজেই বিদ্রোহীদের লড়াই করতে নামলে প্রথমে রণজিৎ সিংএর শিখ সৈন্যদলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। আর রণজিৎ সিং যদি এদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন তাতে ইংরেজদেরই সুবিধে। বিদ্রোহীরা প্রথমে গিয়ে পেশোয়ার অধিকার করে নিল। কিন্তু তারা চরসদ্দা শহরে গিয়ে তাদের সদর দফতর স্থাপন করল। এখান থেকে তারা শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা প্রচার করল। বিদ্রোহীরা তাদের এই ধর্মযুদ্ধে যোগদান করার জন্য সীমান্তের উপজাতীয় লোকদের প্রতি আহ্বান জানালো। উপজাতীয় লোকেরা এই আহ্বানে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিল। কিন্তু সেখানকার সর্দাররা এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখালেন না।

সৈয়দ আহমদ এই বাহিনীর ইমাম মনোনীত হয়েছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি ইমাম মেহদী, ইমাম-হমাম, আমীর-উল মুসলেমীন এবং খলিফা নামে আখ্যায়িত হতেন। সৈয়দ আহমদ তাঁর উপজাতীয় লোকদের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত করে তুলতে চেষ্টা করলেন। তিনি তাদের প্রতি উশর (আয়ের এক-দশমাংশ) ও যাকাত দান, ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত কাজীদের কাছে মামলা নিষ্পত্তির ভার প্রদান এবং ইমামকে মান্য করে চলার জন্য নির্দেশ দিলেন। উপজাতীয় লোকদের মধ্যে যে বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল তিনি তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন এবং ভারত থেকে আগত মহাজের ও পাঠান মেয়েদের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করলেন। উপজাতীয় লোকদের মধ্যে পুরানো দিনের শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সব সময়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। ইমাম এগুলিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন কেননা এর ফলে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

কিন্তু উপজাতীয় লোকদের সমাজের এই সমস্ত সংস্কার সাধন এবং ভারতীয় ও উপজাতীয় লোকদের মধ্যে এই মিলন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। প্রথমতঃ উপজাতীয় লোকেরা এই সমস্ত নতুন বিধানে সায় দিতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় লোকেদের উপর 'উশর' ধার্য্য করার ফলে নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের ব্যাপারে আঘাত পড়ায় মোল্লারাও এই সমস্ত বিধানের বিরোধিতা করেছিলো। এই অঞ্চলের সাধারণ দরিদ্র লোকদের মনে ধর্মবিশ্বাসের ভাব খুবই প্রবল ছিলো। জেহাদের আহ্বান শুনলে তারা পূণ্যলাভ ও লুটপাটের আশায় উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিত। কিন্তু তাদের খান ও সর্দাররা ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর স্বভাবের। স্বার্থের লোভে তারা চিরদিনই আত্মবিক্রয় করে এসেছে। ধর্মের বাণী শুনিয়ে তাদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া যেত না।

এই সমস্ত বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও তারা যে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলো তা অর্ধশতাব্দী কাল ধরে প্রজ্জলিত ছিলো। সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে পাঞ্জাবের শিখ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধল। এখানে ওখানে নানা স্থানে ছোট ছোট সংঘর্ষ ঘটছিলো। কিন্তু বড় রকমের সংঘর্ষ ঘটল

১৮৩১ সালে বালাকটের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বড় রকমের ঘা খেতে হয়েছিলো। স্বয়ং সৈয়দ আহমদ এবং মহম্মদ ইসমাইল এই যুদ্ধে প্রাণ দিলেন।

এত বড় আঘাতে যে বিদ্রোহীদের শক্তি ভেঙ্গে পড়ল না, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। সৈয়দ আহমদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সংগঠনকে এতই দৃঢ় করে তুলেছিলেন যে তাদের কাছ থেকেই সাহায্য পেয়ে সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহীরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পেরেছিলো। এই সংগঠন জনসাধারণের মধ্যে জালের মতই ছড়িয়ে পড়েছিলো। তারা অর্থবল ও লোকবল পাঠিয়ে জেহাদের এই আগুনকে জ্বালিয়ে রাখত। হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), মাদ্রাজ, বাংলা, বোম্বাই, উত্তর ভারতে এই সংগঠনের শাখাগুলি কাজ করে চলেছিলো। তাদের সদর দফতর ছিলো পাটনায়। অর্থসংগ্রহ ও যোগাযোগ পরিচালনায় উপযুক্ত লোকেদের নিযুক্ত করা হত। নানা জায়গা থোক সংগৃহিত অর্থ ও জেহাদে যোগদান-কারী বিদ্রোহীরা প্রথমে সদর দফতরে এসে জমায়েত হত; তারপর শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের সীমান্ত প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হত। সীমান্ত প্রদেশের সন্নিহিত শহরগুলিতে লোক মারফত হুণ্ডি পাঠাবার পাকা বন্দো-বস্ত ছিলো। জেহাদে যোগদানকারী বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাস্থলে চলে যেত। এই সমস্ত অভিযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য এবং তাদের রসদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরিবহন ব্যবস্থার জন্য থানেশ্বর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে দুটি গোপন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিলো।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা এদের অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে পাঠাতো। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে প্রচারের কাজ করে ফিরছিলো। মসজিদে মসজিদে জমায়েতের মধ্যে এই জেহাদকে সাহায্য করার জন্য প্রচার কার্য চলছিলো।

সৈয়দ আহমদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মৌলভী মহম্মদ কাশিম পানি-পাতী উপজাতীয় এলাকায় গিয়ে সেখানকার উপজাতীয় সর্দার সৈয়দ আকবর শাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করছিলেন। এই আকবর শাহ

সৈয়দ আহমদের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই মর্মে খবর দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে, সৈয়দ আহমদের মৃত্যু সম্পর্কে যে রটনা হয়েছে তা মোটেই সত্য নয়। পাটনার দলের নেতা মৌলভী বিলায়েত আলী সৈয়দ আহমদ যে জীবিত আছেন এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে এই জেহাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সীমান্ত প্রদেশে চলে গেলেন।

রনজিৎ সিংএর মৃত্যু এবং ১৮৪৫ সালে ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাবে ইংরেজদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এবার ইংরেজরাই বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। এ কথা সত্য যে বহু জায়গায় বহু সংঘর্ষে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটেছে কিন্তু তারা কোনদিনই আত্মসমর্পণ করেনি। ভারত সরকার এবার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দুই ফ্রণ্টে আক্রমণ শুরু করে দিলেন। প্রথমতঃ তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য এবং যে সমস্ত কেন্দ্র থেকে সীমান্ত প্রদেশে অর্থবল ও লোকবল পাঠাবার ব্যবস্থা করা হত সেগুলিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য একটি বিশেষ পুলিশ বিভাগের সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয়তঃ সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধরত বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য নিয়মিত সৈন্যবাহিনী পাঠাতে লাগলেন।

এই বিদ্রোহীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৮৫০ থেকে ১৮-৬৩ সাল পর্যন্ত ২০টি সামরিক অভিযান চালিয়েছিলো এবং সেই সমস্ত অভিযানে ৬০ হাজার নিয়মিত সৈন্যকে যোগদান করতে হয়েছিলো। এই ব্যাপক আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা সিথানা থেকে সরে এসে মালকায় তাদের ঘাঁটি স্থাপন করল। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তারা সিথানা পুনরাধিকার করে নিয়েছিলো। অবশেষে তাদের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে স্যার নেভিল চেম্বারলেইনের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সীমান্তের দিকে যাত্রা করল। এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য উপজাতীয় লোকেরা আম্বা-লায় এসে হানা দিয়ে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছিলো। শেষ পর্যন্ত তাদের এই প্রতিরোধকে চুর্ণ করার জন্য সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চলে সৈন্য-বাহিনীকে পাঠাবার প্রয়োজন হয়েছিলো। কিন্তু শুধুমাত্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন উপজাতীয়

লোকেরা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রবল বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে চলেছিলো। ইংরেজরা এবার তাদের চিরাচরিত কূটনীতি প্রয়োগ করে এই ঐক্যের মধ্যে ভেদ-বিভেদের ফাটল ধরালো। ইংরেজ সৈন্যরা প্রতিশোধের স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি মালকাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলো।

কিন্তু অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও একথা সত্য যে এতকিছু করার পরেও বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা সম্ভব হয়নি। তারা মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে সরকারী শক্তির বিরুদ্ধে হানা দিয়ে চলেছিলো। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা মৌলভী বিলায়েত আলী ও এনায়েত আলী মারা গিয়েছিলেন। তাঁদের ভাই ইয়াহিয়া আলী পাটনায় বিদ্রোহীদলের নেতৃত্ব করছিলেন। মৌলভী ফরহাত আলী এবং আহমদুল্লা এই বিদ্রোহ পরিচালনায় তাঁকে সহায়তা করে চলেছিলেন। এই সংগ্রামকে চালিয়ে যাবার জন্যে তাঁরা চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি করেন নি। ধর্মীয় সংস্কারসাধন ও জেহাদের প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করে চলেছিলেন। গোপনে অবস্থান ও আত্মরক্ষা করে চলার জন্য পাটনার সাদিকপুরে একটি বাড়ী তৈরী করা হয়েছিলো। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে তাঁরা সংগঠনের বহু শাখা-প্রশাখা স্থাপন করেছিলেন। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রচারকদল এবং সাধারণের কাছ থেকে কর সংগ্রহের জন্য কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয়েছিলো। অর্থবল ও লোকবল পাঠাবার উদ্দেশ্যে পাটনা থেকে সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথের স্থানে স্থানে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ছিল।

ভারত সরকার এদের ধ্বংস সাধনের জন্য বহুমুখী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে ১৮৬৩-১৮৬৪ সালে ইয়াহিয়া আলী, বিলায়েত আলীর উপযুক্ত শিষ্য মহম্মদ জাফর, কণ্ট্রাক্টর মহম্মদ শফী প্রমুখ বিদ্রোহীদের নেতারা সরকারের হাতে ধরা পড়লেন। আম্বালার আদালতে তাদের বিচার হয়েছিলো। তাদের মধ্যে সকলেই দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কয়েকজনকে আবার আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিলো।

১৮৬৫ সালে পাটনায় গ্রেফতারকৃত বিদ্রোহী নেতাদের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা শুরু করা হয়। এই নেতাদের মধ্যে ইয়াহিয়া আলীর ভাই আহমদুল্লাও ছিলেন। এই মামলায় তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই দীর্ঘকালব্যাপী কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিলো। এরপর ১৮৭০ সালে বাংলার মালদহ ও রাজমহলে আরোও কয়েকজন বিদ্রোহীর বিচারকার্য চলে। তাঁদের সকলকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিলো। ১৮৭১ সালে আরোও পাঁচজন নেতৃস্থানীয় মৌলভীকে দণ্ডিত করে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এর ফলে বিদ্রোহের শক্তি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

সরকার কিন্তু এতেও নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের আশংকা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কণ্টক হবার জন্য এবার তারা ধর্মধ্বজী মোল্লা মৌলভীদের শরণাপন্ন হলেন। এ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করার মত ধর্মীয় নেতার অভাব হোল না। ভারত সরকারের প্ররোচনায় মক্কার মুফতি এই বিদ্রোহকে নিষিদ্ধ করে ফতোয়া জারি করলেন। এদিকে সেই সুরে সুর মিলিয়ে ভারতের শিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা এই জেহাদের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। ভারতের উত্তরাঞ্চলের উলেমা সম্প্রদায় এই জেহাদকে অহেতুক বলে আখ্যা দিলেন এবং সর্বোপরি কলকাতার উলেমা সম্প্রদায় ঘোষণা করলেন যে, ভারত 'দার-উল-ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের রাজ্য। অতএব এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। কলকাতার মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি এ সম্পর্কে বিতর্কের ব্যবস্থা করে পরিশেষে এক পুস্তিকা মারফত এই অভিমত ঘোষণা করলেন যে বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। জৌনপুরের মৌলভী আবদুল লতিফের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এ সম্পর্কে একমত ছিলেন।

এই সমস্ত ঘটনার ফলে নতুন করে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার আর কোনও সম্ভাবনা রইল না। অবশ্য এর দীর্ঘকাল পরেও বিদ্রোহের অঙ্গারগুলি সীমান্ত প্রদেশের অভ্যন্তরে সরকারের শ্যেনদৃষ্টির আড়ালে ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছিলো।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ লোকের মুখে মুখে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এই নামটা আমরা পেয়েছিলাম ইংরেজদের কাছ থেকে। ব্রিটিশ সরকার এর নাম দিয়েছিলো (Sepoy Mutiny) অর্থাৎ সৈন্য বিদ্রোহ। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তাই মনে হবে বটে তার কারণ গোরা সিপাহীদের তুলনায় দেশীয় সিপাহীদের স্বল্পবেতন উর্ধ্বতন নাগরিক প্রভুদের দুর্ব্যবহার এবং নানা রকম অভাব-অভিযোগ সৈন্যদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ সঞ্চিত করে তুলছিল। এই সমস্ত অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল বলে ১৭৬৪ সালে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সৈন্যদের মধ্যে এই জুলুম অবাধেই চলে আসছিলো। ১৮৫৭ সালে দেশীয় সৈন্যরাই বিদ্রোহে প্রথম এবং প্রধান সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত কারণে এই বিদ্রোহকে সৈন্যবিদ্রোহ বলে মনে করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বৃটিশ ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদরা প্রথম দিকে এই শব্দটিকে ব্যবহার করে আসছিল। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণাটিকে সংশোধন করতে হয়েছিল।

এখানে এ সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদদের মন্তব্য তুলে ধরছি। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ডিজরেলি সর্বপ্রথম এই সত্যটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে পার্লামেন্টের হাউস-অফ-কমন্স সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, একে সামরিক মিউটিনি বললে ভুল বলা হবে, এ হচ্ছে জাতীয় বিদ্রোহ। এরপর অ্যায়লামবুরি সভায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "আমার বিশ্বাস, এখন এ বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন ভারতের এই দুর্ভাগ্যজনক ও অসাধারণ ঘটনাটি সম্পর্কে

প্রথমে যে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সমস্ত অবস্থা বিচার করে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। দিনের পর দিন আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ঘটনাটিকে প্রথম আমরা কতগুলি তুচ্ছ কারণের অথবা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট বলে মনে করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন এক জাতীয় ঘটনা যার ফলে ইতিহাসে যুগ পরিবর্তন ঘটে যায়। রাজনীতি-বিদগণ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে, এর মূল কোথায় তা উপলব্ধি করতে পারবেন।"

এ প্রসঙ্গে হ্যসটিন ম্যাকারফি লিখেছিলেন, প্রকৃত ঘটনাটি হচ্ছে এই ভারতেব উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ব্যাপক এলাকা জুড়ে দেশীয় জাতিগুলি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এটাকে নিছক সামরিক মিউটিনি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে সৈন্যদের অসন্তোষ, ইংরেজদের প্রতি ঘৃণ্য মনোভাব এবং ধর্মান্ধতা, এই কারণগুলির সংমিশ্রণের ফলেই এই ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশীয় রাজ্য ও দেশীয় সৈন্যরা এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের নিজেদের বিরোধিতা ও বাদ-বিবাদের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে চার্লস বল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, "অবশেষে এই বন্যা প্রবাহ দুকূল ভাসিয়ে সমগ্র ভারতবাসীর জীবন প্লাবিত করে দিয়ে গেল। তখন আশঙ্কা করা গিয়েছিল, এই মহাপ্লাবনের ফলে এ দেশ থেকে ইউরোপীয়দের নাম নিশানা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন এটাও মনে হয়েছিল এই বিদ্রোহের বন্যা অবসানের পর যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে তখন দেশপ্রেমিক ভারত বিদেশী শাসকদের পরিবর্তে কোন এক দেশীয় রাজার আনুগত্য স্বীকার করবে।"

অথচ সেই সময়কার পরিস্থিতিতে এই ধরনের বিদ্রোহ সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না, এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। লর্ড ক্যানিং এদেশে বড়লাট হয়ে আসার প্রাক্কালে বিলাতে তাঁর বিদায়কালীন ভোজসভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাজনৈতিক গগনে একখণ্ড ঘনক্লিষ্ট মেঘ দেখা দিয়েছে, কে জানে এ কোন

দুর্যোগময় পরিণতি বয়ে নিয়ে আসবে।" ভারত থেকে বহুদূরে এসেও লর্ড ক্যানিং সেদিন ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

ডালহাউসি তার কলমের এক খোঁচায় প্রথমে অযোধ্যা রাজ্য, পরে একের পর এক দেশীয় রাজ্য গ্রাস করে চলেছিলেন, তার পক্ষে এটা একটু দুঃসাহসের কাজই হয়েছিল, কেননা এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে মারাত্মক দুর্যোগ দেখা দিতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন। এদেশে, আবহমান কাল থেকে প্রজারা রাজাদের সঙ্গে রাজভক্তি ও আনুগত্যের সূত্রে বাঁধা। রাজমহিমায় আঘাত পড়লে এবং তাদের সম্পদ ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হলে সেই আঘাত তাদের বুকেও এসে বাজে। বিদেশী শাসকদের এই অতর্কিতে আক্রমণ তাদের মনেও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে তুলেছিল।

কিন্তু শুধু রাজভক্তি বা আনুগত্যের প্রশ্নই নয়, দেশের বহু সংখ্যক লোক এই সমস্ত রাজা ও ভূস্বামীদের অধীনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছে। সর্ব ব্যাপারে এদের উপরেই তাদের নির্ভর করে থাকতে হত। এমন অনেক লোক ছিল যারা এদের অধীনে সৈনিক হিসাবে কাজ করে এসেছে। বংশানুক্রমে যুদ্ধবৃত্তিই ছিল তাদের পেশা, তাদের সামনে জীবিকা অর্জনের অন্য পথ খোলা ছিল না। এছাড়া ধর্মীয় নেতারা, শিক্ষাদাতা পণ্ডিত ও আলেমরা, পুরোহিত ও মোল্লা-মৌলবীরা, লেখক, কবি ইত্যাদি জ্ঞানী-গুণী লোকেরা এবং কুশলী শিল্পীরা এই সমস্ত রাজা এবং ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। ঐ সমস্ত রাজা ও ভূস্বামীরা তাদের ভূসম্পদ ও ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে তাদের উপর নির্ভরশীল এই সমস্ত লোকেরাও বেকার ও অসহায় হয়ে পড়ল। তাই বিদ্রোহের প্রবল স্রোতে এরাও আকৃষ্ট হয়ে চলে এসেছিল।

কিন্তু এই শেষ নয়, আরও কথা আছে। একটি প্রাচীন ধারাবাহিক সামন্ততান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্যবাদের কব্জার মধ্যে পড়লে যে অবস্থা হয় তার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে চলেছিল। ব্রিটিশের বাণিজ্য লিপ্সার মত্ত হস্তী এদেশের সনাতনপন্থী গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পদদলিত করে সবকিছু ভেঙ্গে তছনছ করে চলেছিল। যন্ত্রশিল্পে উন্নত ইংলণ্ড থেকে অবাধে আমদানী

করা মালের প্রতিযোগিতার সামনে এদেশের শান্তিপ্রিয় কুটিরশিল্পীরা কেমন করে দাঁড়াবে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বনিয়াদ কুটির-শিল্পগুলি একের পর এক ধ্বসে পড়ছিল। ফলে দলে দলে লোক বেকার হয়ে পড়তে লাগল। এইজন্য যারা দায়ী সেই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ, দিশাহারা এই দুর্ভাগারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে, তাতে আর বিচিত্র কি? বিদ্রোহের সম্ভাবনা ও ব্যাপকতা এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে।

সম্প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এই বিদ্রোহের চরিত্র কি? নামে সিপাহী বিদ্রোহ হলেও আমরা এতকাল একে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই জেনে এসেছি। ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস, এ সম্পর্কে মতানৈক্য ও বিতর্কটা দেখা দিল সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালে, ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের' শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে একদল একে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' আখ্যা দিতে রাজী নন। তাদের মতে এটা দেশীয় রাজা ও ভূস্বামীদের হৃত সম্পদ ও অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা মাত্র। তাঁদের মতে ভারত তখনও একটি 'নেশন' বা জাতি হিসাবে গড়ে ওঠেনি, কাজেই তারা জাতীয়তার মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা বৃথা। এই বিদ্রোহে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নয়, তাদের নিজ নিজ প্রভুর অধিকারের পুনরুদ্ধারের জন্যেই সংগ্রাম করেছিল। কাজেই এই অবস্থায় এই বিদ্রোহকে কোন মতেই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা চলে না।

কালক্রমে সেই বিতর্কের অবসান হয়েছে, প্রশ্নটা কিন্তু অমিমাংসিত রয়ে গেছে। ভারত তখনও 'নেশন' অর্থাৎ জাতি হিসাবে গড়ে ওঠেনি, সেকথা মেনে নিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের এক বিরাট অঞ্চলের এই ব্যাপক বিদ্রোহকে কি 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাম দেওয়া যেতে পারেনা? খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন, তখন ভারতের বিভিন্ন রাজারা যদি মিলিতভাবে তাকে প্রতি-রোধ দিতেন, তবে তাদের সেই সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দিলে

কি ভুল বলা হত ? অনুরূপভাবে হিন্দু ও মুঘল যুগে বহিরাগত মুসলমান ও ব্রিটিশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা যদি মিলিতভাবে সংগ্রাম করতেন, তাহলে আমরা তাকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলতে দ্বিধা করতাম কি ? এক্ষেত্রেই বা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাম দিতে আপত্তি ওঠে কেন ? তাছাড়া এটাও স্মরণ রাখতে হবে, শুধু রাজা, ভূস্বামী, ও সৈন্যরাই নয়, সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণে জড়িত এদেশের সাধারণ মানুষও সেদিন তাদের হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছিল।

সর্বশেষে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। বস্তুতঃপক্ষে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের আগে থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী ১৮২৬ সাল থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে জেহাদ চালিয়ে আসছিল, তাকে অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলতে হবে।

বিদেশী ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকারের পর হৃত-গৌরব মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব খুবই প্রবল ছিল। মুজাহিদ বাহিনীর এই দীর্ঘায়িত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের সেই ব্রিটিশ বিরোধিতা আরোও বেশী প্রখর হয়ে উঠেছিল। এই অনুকূল পরিপক্ক পরিবেশেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বিস্ফোরিত হয়েছিল।

মুজাহিদ বাহিনীর সেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এই বিদ্রোহের উপর কিছুটা প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করেছিল। আর একথাও আমরা জানি, সৈয়দ আহমেদের অনুবর্তী সেই বীর যোদ্ধারা এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই দুটি সংগ্রাম পৃথকভাবে গড়ে উঠলেও যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কথাও বলা যায় না।

বিদ্রোহের প্রচার বাহিনী

মহাবিদ্রোহের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এই বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং বিদ্রোহের পরিচালনার ব্যাপারে তাদের পরস্পর বিরোধিতা পদে পদেই প্রকট হয়ে উঠত। এই বিদ্রোহের এটাই ছিল সবথেকে বড় দুর্বলতা। তাদের সংগঠনও মজবুত ছিল না, থাকার কথাও নয়। কিন্তু তা হলেও তাদের প্রচার-যন্ত্র বেশ কুশলতার সঙ্গেই কাজ করে চলেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। এ সম্পর্কে সত্যেন সেন কর্তৃক লিখিত 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে ঃ

"একথা প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামে, প্রদেশ থেকে প্রদেশে সমস্ত ভারতময়। হিন্দু মুসলমান সকলের মধ্যেই একথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট বড় সবাই একথা জানত। হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র এ আলোচনা চলত ; পলাশী যুদ্ধের একশো বছর পরে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ জুন ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে, দেশ আবার দেশের মানুষ-দের হাতে ফিরে আসবে।

কে প্রথম একথা প্রচার করেছিল, কেউ তা' বলতে পারে না। কোন ফকীর, কোন সন্ন্যাসী, নাকি কোন বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা? নাকি সমগ্র দেশের মানুষের প্রাণের উদগ্র কামনা এ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে দিয়ে রক্ত রঙীন গোলাপের মতই ফুটে উঠেছিল?

যেই প্রচার করুক, ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, মানুষের মন উন্মুখ হয়ে উঠে-ছিল। তাই এ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যুতের মতই খেলা করে গেল। এ চিন্তা মানুষের প্রাণে এক অদ্ভুত আশা ও প্রেরণা সৃষ্টি করে তুলল। তাই দেখতে পাই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সূচনা থেকেই ভারতের মানুষ যেন রুদ্ধ আবেগে দুলে দুলে উঠছে। একটা বিরাট কিছু আসছে, দূর থেকে তার অস্ফুট পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

একটা বিরাট প্রচার-সংগঠন কাজ করে চলেছিল সে বিষয়ে কোনই

সন্দেহ নেই। এ সংগঠনের কতটুকু কেন্দ্রীয় কতটুকুই বা আঞ্চলিক এ হিসেব কেউ দিতে পারবে না। তবে এ সমস্ত প্রচারকেরা কি অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এ প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। ফকীর, সন্ন্যাসী, দরবেশ বা জ্যোতিষী সেজে এ সমস্ত প্রচারকেরা তাবুতে তাবুতে, কেল্লায় কেল্লায় ঘুরে যেখানে যেটুকু সুযোগ পেতেন তারই মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন। এরা পোষাকের আড়ালে অস্ত্র নিয়ে চলতেন। বিপদে পড়লে গোপন ঝোলা থেকে শাণিত তরোয়াল ঝকমক করে উঠত। হঠাৎ বিপন্ন হয়ে সাধুবাবা তার বাঘের চামড়ার আসনের তলা থেকে "হ্যাণ্ডগান" নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। সব সময়ই এদের প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হত, ধরা পড়লে অনিবার্য মৃত্যু। মৃত্যুর আশংকা সম্মুখে নিয়েই এ দুঃসাহসিক প্রচারকের দল ব্যারাকপুর থেকে মীরাট, মীরাট থেকে এলাহাবাদ বা কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আম্বালা, পেশোয়ার— যেখানে যেখানে সেনানিবাস আছে, সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে গিয়েছেন বা একজায়গার গোপন খবর অন্য জায়-গায় পৌঁছে দিয়েছেন। এদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী কিন্তু লোকচক্ষের অগোচরেই থেকে গেছে।

কেল্লা বা সেনানিবাসের কাছাকাছি জায়গায় প্রায়ই দেখা যেত কোথাও সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয়ে বসে গঞ্জিকা সাধনায় ডুবে আছেন, কোথাও কোন ফকীর একাগ্রমনে কোরান পাঠে নিরত, কোথাও বা কোন জ্যোতিষী ভাগ্য-গণনার ফাঁদ পেতে বসে আছেন। হিন্দু মুসলমান সিপাইরা দলে দলে তাঁদের কাছে ধন্না দিত, ভক্তিতে গদগদ হয়ে ধর্মোপদেশ ও তত্ত্বকথা শুনত। এই ধর্মকথার অন্তরালে লোক বুঝে বুঝে তারা বিদ্রোহের বীজমন্ত্র দান করতেন।

শুধু সিপাইদের মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এদের প্রচারের ক্ষেত্র বিস্তারিত ছিল। কোন কোন জায়গায় ইংরাজদের নজরেও এ জিনি-সটা পড়ল। তারা লক্ষ্য করল, যখনই সে অঞ্চলে কোন সাধু বা দরবেশ আসে, কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের চাকর বাকর আর বাবুর্চি আয়া

মহলে একটা দুর্বিনীত ভাব দেখা দেয়। বাজারের ফিরিঙ্গীদের দেখলেই দেশী লোকেরা ফিসফিস করে কি সব কানাকানি করে। পরের দিন ভিস্তি-ওয়ালার দেখা নেই, সাহেব সারাদিন পানি পান-না। বলা নেই কওয়া নেই, আয়াগুলো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। মেমসাহেবের সামনে বাবুর্চি খালি গায়ে এসে দাঁড়ায়। সাহেবকে দেখে বয় সেলাম করে না, এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন সাহেবকে দেখতেই পায়নি। কিন্তু সাধু ও ফকিরেরা যে কোন রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে পারে, এ সন্দেহ তাদের মনে দেখা দেয়নি।

দেশী সিপাইদের মধ্যে ধর্মচর্চার ব্যবস্থার জন্য সরকার থেকে মৌলবী ও পুরোহিত নিযুক্ত করা হোত। শোনা যায় বিদ্রোহীদের পক্ষের অনেক লোক মৌলবী ও পুরোহিতদের ছদ্মবেশে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

উত্তর ভারতে 'তামাসার' বলে একটা সম্প্রদায় ছিল। এরা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তামাসা দেখিয়ে বেড়াত। বিদ্রোহীরা তাদের প্রচারের কাজের জন্য এদের সাহায্য নিত। এরা সাধারণতঃ ধর্মীয় কাহিনী অব-লম্বন করেই গান গাইত। এ ধরনের অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ সমস্ত গান শোনবার জন্য হাজার হাজার লোক এসে ভীড় করত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনত। এ সমস্ত ধর্মীয় কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে তারা স্বদেশ-প্রেমের গান গাইত আর গানের মধ্য দিয়ে ফিরিঙ্গী বিদ্বেষ প্রচার করত।

ঝাঁকে ঝাঁকে ইশ্‌তাহার বের হচ্ছিল। কতগুলি অঞ্চলে ইশ্‌তাহার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হোত। ফৈজাবাদের বিদ্রোহী মৌলবী তো তরোয়াল আর লেখনী দুই-ই সমানভাবে চালিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত ইশ্‌তাহার অগ্নিবর্ষণ করত, মানুষকে পাগল করে দিত।

সেসব ইশ্‌তাহারের নমুনা আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়। বিদ্রো-হের গতি ও প্রকৃতিকে বোঝবার জন্য সে সমস্ত-ইশতাহারগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজনে লাগত সন্দেহ নেই। মাদ্রাজ শহরের দেয়ালে এ ইশ্‌তা-হারটি সেঁটে দেওয়া হয়েছিল :

'স্বদেশবাসীগণ, স্বধর্মে অনুরাগীগণ, ওঠো, ফিরিঙ্গীদের দেশ থেকে ভাগিয়ে দেবার জন্য সবাই মিলে উঠে দাঁড়াও। ওরা ন্যায়কে পদদলিত করেছে, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, ওরা স্থির করেছে আমাদের

জাতিকে ধুলির সাথে মিশিয়ে দেবে। এ ফিরিঙ্গীদের অসহনীয় অত্যাচার থেকে হিন্দুস্থানকে মুক্ত করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে রক্তাক্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এ হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য জেহাদ, ন্যায়ের জন্য জেহাদ। যারা এ যুদ্ধে জীবন হারাবেন, তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন। বেহেশতের দুয়ার শহীদদের জন্য সদাই উন্মুক্ত। কিন্তু যে সকল ভীরু যে সকল দেশদ্রোহী এ জাতীয় কর্তব্য থেকে দূরে সরে যাবে, দোযখের আগুন সে সব দুর্ভাগাকে ঘিরে ফেলবে। স্বদেশবাসীগণ, এ দুয়ের মধ্যে কোনটা তোমরা চাও? বেছে নাও—এখনই বেছে নিতে হবে।'

লক্ষ্ণৌ শহরের পার্কে পার্কে ইশ্‌তাহার দেখা যেতে লাগল। জনসাধারণের মনকে আলোড়িত করে তোলবার জন্য আবেগময়ী ভাষায় তাদের আহ্বান করা হোত : 'হিন্দু ও মুসলমান; মিলিতভাবে উঠে দাঁড়াও। এই শেষবার-কার মত তোমাদের ভাগ্যকে নির্ধারণ করে নাও। এ সুযোগ যদি হাত-ছাড়া হয়ে যায় তবে আর দেশের মানুষের বেঁচে থাকবার কোন উপায় থাকবে না। এ হচ্ছে শেষ সুযোগ। পার তো এখনই কর নইলে আর নয়।'

সরকারী লোকেরা জানতো প্রতিদিনই এ ধরনের নিত্য নতুন ইশ্‌তাহার বের হচ্ছে। দেখলেই তারা ছিঁড়ে ফেলত। তার বেশী আর করবেই বা কি। কিন্তু ছিঁড়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই কারা যেন আবার সে জায়গায় নতুন ইশ্‌তাহার লাগিয়ে দিয়ে যেত।

পুলিশ বলতো এগুলো কারা লাগায় কখনই বা লাগায় এটা খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তার কারণটা কিছুদিন বাদেই জানা গেল। সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে যে। পুলিশের লোকদের মধ্যে অনেকে নিজে-রাই এ সমস্ত গোপন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। বিদ্রোহের উদ্দীপনা তাদেরও মাতিয়ে তুলেছিল।"

মহাবিদ্রোহের বিস্ফোরণ

অবশেষে সমগ্র পৃথিবীতে চমক লাগিয়ে ভারতের বুকে এই মহাবিদ্রোহ ভেঙে পড়ল। এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত

পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল। ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এই ধরনের ঘটনা আর কখনও ঘটেনি, অতীতে দেশের ভিতরে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে— বারবার বাইরে থেকে আক্রমণকারী দল এসে হানা দিয়েছে, যুগে যুগে রাজশক্তির ধারক হিসাবে বহু জাতি ও বংশের উত্থান ও পতন ঘটেছে। কিন্তু তার ফলে সারাদেশে এমন সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। নাদির শা ও আহমদ শা আব্দালির বর্বর আক্রমণে সারা পাঞ্জাব প্রদেশ কেঁপে উঠেছিল, অগণিত শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষের রক্তে নগর ও পল্লীর মাটি সিক্ত হয়ে উঠেছিল, তা সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শান্তি ব্যাহত হয়নি, এর বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া সেখানে দেখা দেয়নি। ইংরেজরা বাংলাদেশ জয় করল, নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটল, কিন্তু লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, হায়দ্রাবাদ, পুনা ও মাদ্রাজের স্বাভাবিক অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, সেগুলি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাদের প্রভাব সেই সমস্ত অঞ্চল বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিদ্রোহে সংঘটিত ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে ও ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সারাদেশ স্পন্দিত ও আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল এবং আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয় পক্ষই এক চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক এ বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। কোন কোন অঞ্চলে বিরাট আকারে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং হাজার হাজার সৈন্য সেই যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। আবার কোথাও কোথাও এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ ঘটেছিল। কিন্তু সে সময় এই বিশাল দেশের কোন অঞ্চলেই ইংরাজরা নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করতে পারেনি, এমন কোন স্থান ছিলনা যেখানে বিদ্রোহ সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয়নি।

ভারতের সকল প্রদেশই অল্পাধিক পরিমাণে এই বিদ্রোহের প্রবাহে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উত্তর ভারত অর্থাৎ বাংলা থেকে

পাঞ্জাব পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চল বিদ্রোহের প্রকাশ্য রণাঙ্গনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একথা বললে ভুল বলা হবে না যে নানা কারণে এই বিদ্রোহ মোটামুটিভাবে সর্ব-সাধারণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল নতুন জেগে ওঠা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তবে এদের অস্তিত্ব প্রেসিডেন্সী শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। ইংরাজী শিক্ষার বদৌলতে এদের ভাগ্যে কিছু সরকারী চাকুরী জুটছিল। ভবিষ্যতে ইংরাজদের মতো সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং ইংরাজদের সঙ্গে সমমর্যাদা লাভ করার উচ্চাশার দিকেও তাদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল, শুধু তাই নয়, ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে বিপুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দ্বার তাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল, তা তাদের মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে ফেলেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পড়া-শোনা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে ঢুকেছিল। এই কারণেই বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ বিদ্রোহের ডাকে সাড়া দেয়নি।

কিন্তু বেঙ্গল আর্মী উত্তর ভারতের লোকদের নিয়েই গঠিত ছিল। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সৈন্যদের ঘাঁটি ছিল। সেই কারণেই বাংলাদেশের ব্যারাকপুর, মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা ইত্যাদি অঞ্চলগুলি বিদ্রোহীদের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইংরাজদের মনে এই আশংকা খুবই প্রবল ছিল যে, এই বাংলাদেশ থেকে বিদ্রোহীদের বড়ো রকমের অভ্যুত্থান দেখা দেবে। মাঝে মাঝে এই ধরনের জনরব ছড়িয়ে পড়ত, আর কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যাকুল হয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে গড়ের ময়দানে গিয়ে আশ্রয় নিত।

প্রথম অভ্যুত্থান ঘটল মীরাটে। ১৮৫৭ সালে ১০ই মে মীরাটের সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে মীরাট শহর অধিকার করে বসল। কিন্তু মীরাট দখল করে ক্ষান্ত রইল না তারা, তাদের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী, মীরাট ত্যাগ করে তারা রাজধানী দিল্লী শহর অভিমুখে যাত্রা করল। রাজধানী অধিকার করে নিতে তাদের খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। তারা সম্রাট বাহাদুর শাহকে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য

অনুরোধ জানাল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ প্রথমে এ গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী হতে হল। স্বাধীন দিল্লী মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হল এবং বিদ্রোহ সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ করল। পরে ইংরেজদের আক্রমণে দিল্লী পতনের পর বিদ্রোহের কেন্দ্র অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হল। মহিমাময়ী অযোধ্যার বেগম হযরত মহল বিদ্রোহের মূল নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এইভাবে বহু ভাঙ্গাগড়া এবং বহু সাফল্য ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের রক্তাক্ত অভিযান এগিয়ে চলল। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতা, সংগঠন ও নেতৃত্বের দিক দিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবার মতো যোগ্যতা বা প্রস্তুতি তাদের ছিল না। ফলে ব্যাপক আত্ম-বিসর্জন ও ধ্বংস-যজ্ঞের পর এই মর্মান্তিক বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকাপাত ঘটল।

এই মহাবিদ্রোহকে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দেই আর না দেই, দেশের জন্য হাজার হাজার বীর শহীদদের আত্মত্যাগের অমর কাহিনী দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয়। বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে যত ত্রুটি-দুর্বলতাই থাকনা কেন, বিদ্রোহের অগ্নি-আভায় সেদিন সেই মূর্তিগুলি সবার সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম এখানে উপস্থিত করা যাচ্ছে, আজীমুল্লাহ্ খান, বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে, ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ শাহ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, পাটনার পীর আলী, কুনওয়ার সিং, তাঁতীয়া টোপী, শাহজাদার ফিরোজ শাহ, ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ আলী খাঁ, নাজিম মহম্মদ হাসান, শঙ্করপুরের বেনী মাধো। মাত্র কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া গেল। মহাবিদ্রোহে এদের উজ্জ্বল ভূমিকা সবার সামনে তুলে ধরার মতো। কিন্তু এখানে তার স্থানাভাব। তাহলেও ফৈজাবাদের বিদ্রোহী মৌলবীর সংগ্রামী জীবনের একটু অংশ নিবেদন করতে চাই :

"দাবানল যেমন লকলকে শিখায় বনের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ায়, বিদ্রোহী মৌলবী যেন তারই প্রতিমূর্তি।

শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষা বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। মৌলবীর নাম বিদেশী শাসকদের কাছে পরম আতঙ্কের

বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অযোধ্যা প্রদেশের অখ্যাত, অজ্ঞাত, সামান্য একজন তালুকদার। কেই বা তাকে চিনত, কেই বা জানত এ শান্ত, সৌম্য মানুষটির বুকের মধ্যে কি বিপুল তেজঃপুঞ্জ সংহত হয়ে আছে। স্তূপীকৃত বারুদরাশি, তার মধ্যে কত বড় শক্তিই না লুকিয়ে থাকে। একটু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়।

ডালহাউসীর সর্বগ্রাসী নীতি এ স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করল। স্বেচ্ছাচারী রাজ-প্রতিনিধি কতগুলি মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে অযোধ্যাকে আত্মসাৎ করে নিল, বহু তালুকদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ শাহ সে তালুকদারদেরই একজন। মৌলবী পথে এসে দাঁড়ালেন, সেদিন থেকে পথই হল তার আশ্রয়। সারাদেশ জুড়ে কোম্পানীর অত্যাচার ও লুণ্ঠন চলেছিল, তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করলেন, "এ জুলুমবাজ ফিরিঙ্গীরাজকে খতম কর," সিংহগর্জনে গর্জে উঠলেন।

মৌলবী ধর্ম পথের পথিক। কিন্তু মানুষের সুখ দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে বসে ধ্যানধারনা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখাকেই তিনি ধর্ম বলে মনে করতেন না। তাঁর ধর্মের মুলমন্ত্র ছিল ঃ

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

সেদিন থেকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত নিজের কায়মনপ্রাণ নিজের সর্বস্বের মায়া ছেড়ে দিয়ে তিনি এ ধর্ম পালন করে চলেছেন।

হতাশায় হাল ছেড়ে দেওয়া, ভেঙ্গে পড়া মানুষকে কি করে নতুন আশায় ও উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুলতে হয়, সে মন্ত্র তাঁর জানা ছিল। নিঃস্ব ফকিরের বেশে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, প্রদেশে প্রদেশে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিদ্রোহের বাণী প্রচার করবার জন্য। অদ্ভুত তাঁর আকর্ষণী শক্তি। যেখানে যেতেন সেখানেই শহরের মানুষ গাঁয়ের মানুষ, শিক্ষিত মানুষ মুর্খ মানুষ দলে দলে এসে তাঁর চারিদিকে ভীড় করে দাঁড়াতো।

ঘুমন্ত মানুষের চোখের ঘুম তিনি কেড়ে নিতে পাড়তেন। হ্যাঁ, এমন মানুষই ছিলেন মৌলবী। অ-বোলা মানুষের মুখে কথা ফুটাতে পারতেন তিনি, তাকে দেখলে দুর্বল মানুষও সবল হয়ে উঠত। লোকে বলত, মৌলবী সাহেব অদ্ভুত তাঁর কেরামত। তার হাতের ছোঁয়া পেলে মরা হাড়েও প্রাণ জেগে ওঠে। কথাটা মিথ্যে নয়।

অযোধ্যার জনসাধারণ তাঁকে তাদের প্রাণের মানুষ বলে মনে করত। এক-বার তিনি প্রকাশ্যে লক্ষ্মৌ শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ফিরিঙ্গীর রাজত্বকে ধূলিসাৎ করে দেবার জন্য বজ্র নির্ঘোষে পবিত্র জেহাদ ঘোষণা করলেন। সে আহ্বানে জোয়ারের টানে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত জনতার প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল।

শুধু বক্তৃতাই নয়, সাথে সাথে তার লেখনীও অবিরাম অগ্নিবর্ষণ করে চলল, তাঁর লেখা বৈপ্লবিক ইশ্‌তাহারে সারা অযোধ্যা প্রদেশ ছেয়ে গেল। হুকুমজারী হল, গ্রেফতার কর মৌলবীকে।

অযোধ্যায় এ জনপ্রিয় নেতাকে কেউ গ্রেফতার করতে ভরসা পেল না। তখন তাঁকে ধরে আনবার জন্য সৈন্যদল পাঠানো হল। তার বিরুদ্ধে রাজ-দ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। বিচারে তাঁর ফাঁসীর আদেশ হয়ে গেল। মৌলবী আহম্মদ শাহ ফৈজাবাদের কারাগারে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন।

কিন্তু বাতাস হয়ে উঠেছে এলোমেলো, পুরানো যা কিছু ছিল, সবই যেন উলটে গিয়েছিল। কে কাকে দণ্ড দেবে, কাল যে ছিল দণ্ডবিধাতা আজ সে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে ওখানে, যেখানে যেদিকে কান পাতো, শোনা যাবে বিদ্রোহের পদধ্বনি।

যারা এতদিন ভয়ে কথা বলত না, তারাও আজ গর্জন করে উঠেছে।

ফৈজাবাদের মানুষ তাদের জনপ্রিয় নেতার উপর এ হামলা নিঃশব্দে মাথা পেতে নিলনা। তাকে গ্রেপ্তার করবার ফলে, যে আগুন হয়তো বা আরও দুদিন পরে জ্বলে উঠত, সেটা এখনই জ্বলে উঠল। সিপাই ও নগরবাসীরা একই সঙ্গে রুখে দাঁড়াল।

ইংরাজ অফিসাররা সিপাইদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে প্যারেড ময়দানে জমায়েত হবার জন্য হুকুম দিলেন। সিপাইরা সে কথা গ্রাহ্য করল না। বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল, এখন থেকে দেশী অফিসার ছাড়া তারা কারো কথা মানবেনা।

সরদার দলীপ সিং ইংরাজ অফিসারদের আটক করবার জন্য হুকুম দিলেন। শহর বিদ্রোহের অধিকারে এসে গেল। জনসাধারণ ও সিপাইরা জয়ধ্বনি করে জেলের দরজা ভেঙ্গে তাদের নেতাকে বের করে নিয়ে এল।

(মহাবিদ্রোহের কাহিনী)

দেওবন্দ শিক্ষা-কেন্দ্র

দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র ও আলীগড় শিক্ষা কেন্দ্র এই উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে বিশেষ পরিচিত। অবশ্য আজকালকার দিনের শিক্ষিত তরুণ মুসলমানেরা আলীগড়ের নাম যেভাবে জানে দেওবন্দ এর নাম তেমন করেই জানে না। হিন্দুদের পক্ষে এ কথা সত্য; আলীগড়ের কথা তারা অনেকেই জানে কিন্তু দেওবন্দের কথা খুব কম লোকেই জানে। অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র যে দেশপ্রেমিক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, সেজন্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছেই তা' স্মরণীয় থাকা উচিত ছিল।

এই উপমহাদেশে সুদূর পল্লী অঞ্চলে মুসলমানদের কাছে একসময় আলীগড়ের চেয়েও দেওবন্দের নামই কিন্তু অনেক বেশী পরিচিত ছিল। এর প্রধান কারণ দেওবন্দ কেন্দ্র উলেমাদের দ্বারা পরিচালিত এবং এখানে প্রাচীন ধারায় ধর্মীয় শিক্ষার উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। অপর পক্ষে আলীগড়কে মুসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচারের পীঠস্থান বলা চলে। সেদিক দিয়ে এর একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু আরও একটি কারণ আছে এবং সেই কারণটা একেবারেই তুচ্ছ নয়। আলীগড়ে অভিজাত ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান ছেলেরাই শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে থাকে কিন্তু দেওবন্দের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলেনা। সারা দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ ঘরের শিক্ষার্থীদের জন্যও তার দ্বার অবারিত। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ছিল সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে এবং তাদের সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে অব্যাহতভাবে তার সম্পর্ক রক্ষা করে এসেছে।

ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত এই শিক্ষা কেন্দ্রটির স্বরূপ বোঝাতে হলে তার অতীত দিনের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরে আলীগড়ে তাঁর শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। দেওবন্দের শিক্ষা কেন্দ্র প্রায় একই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী ঐতিহ্য। এই সংগ্রামী প্রেরণার মূলে ছিলেন দিল্লীর শাহ-ওয়ালীউল্লাহ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহের ছুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমটি ধর্মীয়—তিনি ইস্‌লাম ধর্মকে পরবর্তীকালের নানারূপ কুসংস্কার ও আচার-বিচারের জাল থেকে মুক্ত করে হযরত মহম্মদের (দঃ) প্রবর্তিত ধর্মের প্রাথমিক বিশুদ্ধতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি বৈষয়িক—ব্রিটিশের ভারত অধিকারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের যে সমস্ত সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে তিনি তার সমাধান করতে চেয়েছিলেন।

১৮০৩ সালে ইংরেজদের আক্রমণে দিল্লীর পতনের পর তাঁর পুত্র ও শিষ্য শাহ আবদুল আজীজের উপর এক গুরু দায়িত্ব এসে পড়ল, তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতকে 'দার-উল-হরব' অর্থাৎ যুদ্ধেরত দেশ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন এই ফতোয়ায় সমস্ত মুসলমানদের উপর এই নির্দেশ দেওয়া হল যে তারা হয় জেহাদ ঘোষণা করে এই দেশকে বিজেতা খ্রীষ্টান-দের হাত থেকে মুক্ত করুক নয়ত এদেশ ত্যাগ করে যে-কোন স্বাধীন মুসল-মানের দেশে চলে যাক। কিন্তু শুধু দেশত্যাগ করে গেলেই চলবেনা, বাইরে থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে আবার তাদের ইংরাজদের হাত থেকে এই দেশকে মুক্ত করতে হবে। একমাত্র তখনই এই দেশে 'দার-উল্‌-ইসলাম' অর্থাৎ 'শান্তির রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হবে।

সেই নির্দেশকে মান্য করে উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য ও আত্মীয় স্বজনরাও এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বর্ণিত এই 'ওয়াহবী'-দল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্গম বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলকে ঘাঁটি করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা

করেছিল। তারা সেই সময় থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাঁচিয়ে রেখেছিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দলের কিছু কিছু লোক বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান করেছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেওয়ার পর জেহাদের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার সম্ভাবনা বহুদূরে পিছিয়ে গেল। উলেমাদের মধ্যে একটি দল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। তারা উত্তর মজঃফরনগর জেলার শামলীতে তাদের কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। বিদ্রোহ ভেঙ্গে যাওয়ার পর তাঁরা কোনমতে ইংরাজদের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে শাহারানপুর জেলার দেওবন্দে চলে এলেন এবং মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তৈরী করে দেওয়ার জন্য সেখানে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই উলেমাদের মধ্যে যে দুইজন তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের নাম মহম্মদ কাশিম ন্যানাউতবী ও রশিদ আহমদ জানগোহী, এরা দুজনেই হাজী ইমাদউল্লাহর শিষ্য। হাজী ইমাদউল্লাহ ১৮৫৭ সালে দেশত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন।

১৮৬৭ সালে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে দেওবন্দের এ শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল :

১. কোন প্রলোভন, পৃষ্ঠপোষকতা, চাপ অথবা অনুগ্রহের বশবর্তী না হয়ে খোদার বাণীর মহিমা ঘোষণা করা,
২. ইসলামের মূল নীতিগুলির অনুসরণ করে জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তার করা,
৩. সরকার ও অভিজাতবর্গের সাথে কোনরকম সহযোগিতা করে চলা এই শিক্ষায়তনের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিজনক, এই সত্য উপলব্ধি করা,
৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র উপদেশগুলিকে দৃঢ়ভাবে ও যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা,

৫. অভিজাতসুলভ ও স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিহার করা এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে গণতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে কাজ করে চলা।

ইসলামের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী এখানকার পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছিল। পাঠ্যসূচী, আর্থিক ব্যবস্থা ও প্রশাসনের দিক দিয়ে এই শিক্ষা-কেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, ফলে যে সমস্ত শিক্ষার্থী এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে বেরিয়ে যেত, তাদের কোনরকম সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকতনা। এটা ছিল গরীবদের বিদ্যালয়, কাজেই এখানকার শিক্ষক ও ছাত্র সবাইকে অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করতে হত। শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে উজ্জলতর রাখাটাই ছিল এই শিক্ষা-কেন্দ্রের লক্ষ্য। পার্থিব সাফল্যের দিকে তাঁদের একেবারেই দৃষ্টি ছিলনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য আধিপত্য তাঁরা খুবই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের নৈতিক ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে তাঁরা এশিয়ার দেশগুলিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন।

যদিও এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাবিস্তার ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাহলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যাগুলি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাজেই ভারতে ও ইসলামী জগতে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটত, সেগুলি স্বভাবতঃই তাদের মনকে নাড়া দিয়ে তুলত। ১৮৫৯-৬০ সালে নীলকর বিদ্রোহ, ১৮৭৬ সালে দক্ষিণাত্যের হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ এবং গ্রামের কৃষক ও কুটির শিল্পীদের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থার ফলাফল তাদের প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করতে হয়েছে। বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং বিশেষ করে ১৮৮৩ সালে এলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছিল। এই অসন্তোষ দিন দিনই বেড়ে চলছিল।

অপরদিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছিল তাতে সমগ্র

ইসলামী জগতে নিদারুণ হতাশা ও বিক্ষোভের ভাব দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যেভাবে মিশর, তুরস্ক, পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা ইত্যাদি মুসলমান দেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছিল, ভারতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সৈয়দ জামাল আলদীন আফগানি সে সময়ে এই সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করে ফিরছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি ভারতেও একটি বছর কাটিয়ে গেছেন। তাঁর বক্তৃতার ফলে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মুসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। দেওবন্দ শিক্ষা-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত প্রশ্নে জামাল আলদীন আফগানির সঙ্গে একমত ছিলেন। তাই ১৮৮৫ সালে নবগঠিত কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাল, দেওবন্দ তখন এই আহ্বানে সাড়া দিতে ত্রুটি করেনি। সেই সময় এই শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যক্ষ ছিলেন রশিদ আহ্‌মদ জান্‌গোহী। তিনি ঐ সম্পর্কে তাদের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বললেন শাহ্ আবহুল আজিজের ফতোয়া অনুযায়ী ভারত হচ্ছে দার-উল-হর্ব অর্থাৎ যুদ্ধে রত দেশ। কাজেই এই বিদেশী দখলদার শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা প্রত্যেকটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। হিন্দুদের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বৈষয়িক ব্যাপারে জাতীয় উদ্দেশ্য সফল্ করবার জন্য মুসলমানরা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। সেই কারণে তিনি ভারতে মুসলমানদের কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করে চলতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এর বাইরে রইলেন। কেননা তিনি ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু কংগ্রেস তখনও সেই আদর্শকে গ্রহণ করেনি। দেওবন্দের উলেমারা সম্পূর্ণ একমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি জাতির সৃষ্টি করে তোলা ইস্লামী নীতির বিরোধী নয়।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে দেওবন্দ ও আলীগড়ের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে গেল। ১৮৮১ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ আরবী

পাশার বিদ্রোহের ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই বৃটিশ সমর্থক মনোভাব প্রদর্শন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতামতের বিরুদ্ধে দেওবন্দ তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছিল। সর্বশেষে ১৮৯৭ সালের তুরস্ক ও গ্রীসের যুদ্ধে স্যার সৈয়দ আহমদের তুরস্কের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে সমর্থনদান এই ব্যবধানকে আরও বেশী বাড়িয়ে তুলল। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে সারা দেশ যখন বিভ্রান্ত সেই সময়েও দেওবন্দ কংগ্রেস ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এসেছে।

দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রের চরিত্র ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে এটা প্রথমেই চোখে পড়বে যে, এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই যুগোপযোগী নয়। ইংরাজেরা ভারত অধিকারের পর মুসলমানরা বিরুদ্ধ মনোভাবের বশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন করে চলার যে বিভ্রান্তিকর পথে পা বাড়িয়েছিল, দেওবন্দের শিক্ষা ব্যবস্থা তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছিল। এটা অবশ্য মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিকূল কিন্তু দেওবন্দ দুইটি বিষয়ে আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ তারা আলীগড়ের মত মুসলমান সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখার পরিবর্তে সাধারণ মুসলমানদের সথে যোগাযোগের বিস্তার সাধন করে চলত এবং সুদিনে দুদিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়াত। দ্বিতীয়তঃ তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে তাদের আদর্শ বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এই উলেমারা রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদের ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ ও সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেইজন্য ভারতীয় কংগ্রেস যখন তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সমস্ত দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাল, তখন দেওবন্দ সেই আন্দোলনে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘোর দুর্দিনেও তাঁরা স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামের পুরোধা কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস হারান নি।

ভারতের সমস্ত প্রদেশ বিশেষ করে উত্তর ভারতে শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে সাধারণ মুসলমান ঘরের শিক্ষার্থীরা দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষালাভের জন্য এসে জড়ো হতো। তারা যখন তাদের শিক্ষা শেষ করে যার যার ঘরে ফিরে যেত তখন তারা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিবাণীও বহন করে নিয়ে যেত। এইভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশের মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা ছড়িয়ে চলেছিল। সর্বশেষে এই কথা উল্লেখযোগ্য, এই দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে মামুদ আল হাসান, ওবেদুল্লাহ্ সিন্ধি ও জামালউদ্দিন মদনীর মত তিনজন বীর যোদ্ধা বেরিয়ে এসেছিলেন, যাদের নাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিস্মরণীয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। দুঃখের বিষয় এই অধ্যায়টি সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষ খুব কম খবরই রাখে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

বদরুদ্দিন তায়াবজী

জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কিন্তু নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের ত্রুটি বিচ্যুতির দরুণ এই সমস্ত নাম বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে যায়। এমনি একটি নাম বদ্‌রুদ্দিন তায়াবজী। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টদের নামের ধারাবাহিক তালিকায় তাঁর নামটা খুঁজে পাওয়া যায় বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাঁর দেশের মানুষ তাঁর সম্পর্কে খুব কম খবরই রাখে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রথম গঠিত হয়, সে সময় যে ক'জন নেতৃস্থানীয় মুসলমান তার সঙ্গে যোগদান করেন, নিঃসন্দেহে বদ্‌রুদ্দিন তায়াবজী তাঁর মধ্যে প্রধান। তিনি সে সময় ভারতের একজন 'বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলমান' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এটা এখনকার মুসল-মান সমাজ তথা সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা যে, সেই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানকারী স্বল্প সংখ্যক মুসলমান নেতা ও কর্মীদের এই বিচিত্র নামের এক বিশেষ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কে অজ্ঞতা, অবিশ্বাস ও বিরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রদায়িক কূটনীতি এর জন্য দায়ী। যে সমস্ত মুসলমান নেতা ও কর্মী জাতীয়তাবাদী নীতিকে ভিত্তি করে কংগ্রেসে যোগ দিতেন, নিজেদের সম্প্রদায় থেকে তাঁদের বহু বাধা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বদ্‌রুদ্দিন তায়াবজীকেও 'বীরের মত' এই বিরোধিতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

বদ্‌রুদ্দিন তায়াবজী বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল পরিচয়, তিনি ছিলেন তখনকার দিনের সারা ভারতের অন্যতম প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি শৈশবে তাঁদের সামাজিক রীতি

অনুযায়ী মুসলমানী মাদ্রাসায় পড়েছিলেন। তারপর বোম্বাইয়ের এলফিন্‌-স্টোন্‌ ইন্‌স্টিটিউট কলেজে শিক্ষালাভ করেন। লর্ড লিটন কর্তৃক ১৮৭৮ সালে 'ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' ঘোষণার পর থেকেই তিনি রাজনীতি চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৮৮৩ সালে যখন সারা দেশে ইলবার্ট বিল নিয়ে বিতর্ক বাঁধল, তখন তিনি এই বিলের প্রবলভাবে বিরোধিতা করেছিলেন।

এখানে ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট ও ইলবার্ট বিল সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া দরকার। গত শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় সংবাদপত্রের শক্তি ও প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছিল; তা অনেক সময় নির্ভীকভাবে সরকারের কাজের সমালোচনা করত এবং তার প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। তাদের এই সমালোচনার ফলে সরকার বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও আতংকিত হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে যখন বরদার মহারাজা মল্‌হার রাও গাইকোয়াড়কে গদিচ্যুত করা হল, তখন বোম্বাই-এর 'ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকা' সরকারের এই কাজে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পত্রিকাটিতে এ পর্যন্ত বলা হয়েছিল যে সরকার এ কাজ করে তাঁর অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন, অতঃপর দেশীয় পত্রিকাগুলিকে শায়েস্তা করবার জন্য ভারত সরকার নানা ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে তাদের দণ্ডিত করা সম্ভব হল না।

এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য বড়লাট লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে 'ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' নামে এক বিশেষ আইন পাস করিয়ে নিলেন। এই আইনের বিধান অনুযায়ী পত্রিকা সম্পাদকদের এই মর্মে কথা দিতে হবে যে তারা কোনরকম আপত্তিজনক প্রবন্ধ বা লেখা প্রকাশ করবেন না। নয়ত লেখা প্রকাশের পূর্বে তা সংশ্লিষ্ট ও সরকারী কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে নিতে হবে। এই আইনের বিরুদ্ধে দেশীয় সংবাদপত্র মহল থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠলো। শুধু সংবাদপত্র নয়, এই নিয়ে সারা দেশে একটি ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

এখানকার এই আন্দোলনের প্রতিধ্বনি ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছল। সে সময় সরকার পরিচালনার ভার কনজার্ভেটিভ পার্টির হাতে। লিবারেল

পার্টি এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অতঃপর দেশের শাসন ক্ষমতা লিবারেল পার্টির হাতে চলে যাবার পর ১৮৮২ সালে এই আইনটিকে বাতিল করে দেওয়া হলো।

ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট এর গোলমালটা মিটে যাবার পরই আর একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিলো। সে সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন রিপন। ভারতীয় প্রজারা যাতে ন্যায়সঙ্গত আচরণ পায়, তিনি সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। আইনসচিব (Law member) স্যার কোর্টনি ইলবার্ট এই মর্মে এক বিল আনয়ন করলেন যে, ভারতীয় জজদের একমাত্র ইউরোপীয়, ব্রিটিশ প্রজা ছাড়া আর সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের বিচার করবার অধিকার থাকবে। ইতিপূর্বে কৃষ্ণাঙ্গ জজদের শ্বেতাঙ্গদের বিচার করবার কোনো অধিকার ছিল না। এই বিলটি উত্থাপনের সাথে সাথেই সমগ্র এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল। 'ইলবার্ট বিল' নামে খ্যাত এই বিলটিকে প্রতিরোধ করবার জন্য তারা প্রতিরক্ষা তহবিল (Defence Fund) গঠন করল এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। শুধু তাই নয়, এর বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ হয়ে লড়বার জন্য তারা লণ্ডনে এজেন্ট পাঠিয়ে দিল। লণ্ডনেও এই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল। তখন 'লিবারেল পার্টির' সরকার দেশ শাসন করছিল। এই বিলের পিছনে লিবারেল পার্টির সমর্থন ছিল। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ কনজারভেটিভ পার্টি এবং বলতে গেলে প্রায় সমগ্র ইংরাজ সমাজ প্রস্তাবিত বিলটির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন চালান। কৃষ্ণাঙ্গ বিচারকদের দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার মধ্য দিয়ে তাদের মর্যাদাহানি ঘটবে, এই অবমাননা তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। এই আন্দোলনের চাপে লিবারেল পার্টিকে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হল এবং শেষ পর্যন্ত ইলবার্ট বিলকে সংশোধন করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

উপরোক্ত ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট ও ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বদরুদ্দিন তায়াবজী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হিসাবেও সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। শুধু বোম্বাই প্রদেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁকে বোম্বাইএর

লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের অতিরিক্ত সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন্ গঠিত হয়। এই এ্যাসো-সিয়েশনের সভায় দাঁড়িয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর এই রাজনৈতিক অভিমত ব্যক্ত করেন :

"আমার মতে রাজনৈতিক জীবনের প্রসারের সাথে সাথে ব্যক্তিগতভাবে ও জাতিগতভাবে নূতন নূতন আশা আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ হতে থাকে। এবং এই আশা আকাঙ্ক্ষাকে যথোচিতভাবে প্রকাশ করার জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন হয়। আবার এই সংগঠন সেই সমস্ত জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখে, তাদের নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশ সাধন করে, এবং যথোচিতভাবে পথে পরিচালিত করে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আমরা আমা-দের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছি এবং জাতি, বর্ণ ও ধর্মের বিভিন্নতা এতকাল আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ক্ষতিকর পার্থক্যের সৃষ্টি করে এসেছে শিক্ষার প্রভাবে তা এখন বিদূরিত হয়ে গেছে।"

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে যখন বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হল তখন বদরুদ্দিন তায়াবজী তার প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানা-লেন। 'লণ্ডন টাইম্‌স' পত্রিকা এই মন্তব্য করল যে, বোম্বাইয়ের মুসলমানরা এই সভায় যোগদান করেনি। তখন তিনি তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করে পাঠালেন। এ সম্পর্কে তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় বলেছিলেন, আমি আপনাদের এই আন্দোলন সম্পর্কে আমার ও আমার মুসলমান ভাইদের সহানুভূতি জানাচ্ছি। লণ্ডনের টাইম্‌স্ পত্রিকা এই আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, বোম্বাইয়ের মুসলমানেরা এ ব্যাপারে কোনরূপ অংশগ্রহণ করেনি। আমি সেই সভায় উপস্থিত থাকতে পারিনি একথা সত্য, কিন্তু তা হলেও রহমতুল্লা সায়ানি আবদুল্লার মত বিশিষ্ট মুসলমান নেতারা এই সভায় যথারীতি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তায়াবজী পুনরায় এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়ে বলেছিলেন, সরকারের কাছে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ জানিয়ে এবং তাদের নিজেদের দেশের রাজনৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়এর

লোকেদের সাথে মিলিতভাবে আন্দোলন করতে রাজী হবে না, আমি এ কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মুসলমানরা যাতে কংগ্রেসে যোগদান না করে বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড রে সে বিষয়ে চেষ্টা করে দেখেছিলেন। বড়লাট লর্ড ডাফরিন ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমদকে নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে পুরতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, সেই একই কৌশলে বদরুদ্দিন তায়াবজীকেও নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবেন। তারই শুভস্থচনা স্বরূপ বন্ধুত্ব ও প্রীতির নিদর্শন হিসাবে তাঁকে তাঁর নিজের একখানা ফটো উপহার দিয়েছিলেন। যারা ইংরাজ প্রভুদের অনুগ্রহের জন্য লালায়িত এটা তাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু এই এই মানুষটি যে কি ধাতু দিয়ে তৈরী সে সম্পর্কে তাদের কোনোই ধারণা ছিল না।

এই প্রসঙ্গে বড়লাট তাঁকে লিখেছিলেন যে, সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানরা খুবই প্রশংসার যোগ্য এবং তিনি তাদের বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন। এই ধরনের নানা রকমের মিষ্ট বাক্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মন ভোলাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা কোনো কাজেই এলোনা।

সৈয়দ আমির আলিও তাঁকে হাত করবার জন্য চেষ্টা করে দেখেছিলেন। কলিকাতার মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসাবে তিনি তায়াব-জীকে তাদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তায়াবজী স্পষ্ট কথায় তাঁর এই আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছিলেন, "আপনি নিঃসন্দেহে একথা অবগত আছেন যে, মুসলমানদের এদেশের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করা উচিত। কাজেই এ সমস্ত ব্যাপারে হিন্দু ও পার্শী সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে যদি আমাদের কোনোরকম মতানৈক্যের সৃষ্টি করে তোলা হয়—তবে আমি সে বিষয়ে তীব্রভাবে আপত্তি জানাব। এই কারণে কলিকাতার মুসলমানরা যে বোম্বাই ও কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন নি এটাকে আমি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। এই প্রস্তাবিত মুসলমান-দের সম্মেলন যদি কেবল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়াবার

উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আমি অবশ্য এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব। যেহেতু আমার বিবেচনায় সমস্ত মুসলমানদেরই জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করা এবং কংগ্রেসের অধিবেশনেই তাদের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ অবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা উচিত।"

পরবর্তীকালে তাঁর লেখা একটি চিঠিতে তিনি অবিকল এ অভিমত প্রকাশ করেছেন, "আমি মনে করি যে সমস্ত সাধারণ রাজনৈতিক প্রশ্ন সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষে প্রযোজ্য সে সব ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষিত ও জনহিতৈষী ব্যক্তির জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পরস্পরের সাথে একযোগে কাজ করা উচিত।"

বদরুদ্দিন তায়াবজী ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সরকার অথবা ফ্রন্টের যে সমস্ত রকম বড় বড় সাধারণ রিফর্ম এবং যে সমস্ত বড় বড় অধিকার আমাদের সকলের কল্যাণ সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এবং যে জন্য আন্তরিক ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সেগুলিকে অর্জন করতে হলে দেশের সকল সম্প্রদায়ের মিলিতভাবে কাজ করে চলা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেস সাধারণ জনতার সমাবেশ মাত্র, যারা এই ধরনের কথা বলেন, আমার সঙ্গে এই সম্মেলন ভবনে প্রবেশ করুন এবং এর চেয়ে অধিকতর অভিজাতদের সমাবেশ আপনি আর কোথায় পাবেন? অবশ্য এরা বংশ ও ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়ে অভিজাত নন, এদের আভিজাত্য বুদ্ধি বৃত্তি, শিক্ষা ও মর্যাদার দিক দিয়ে।" কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ অভিজাত মহল থেকে কখনও কখনও এই ধরনের প্রচার কার্য চালানো হত যে, কংগ্রেস বিচার বুদ্ধিহীন জনতার সমাবেশ মাত্র। এই ধরনের প্রচারের প্রত্যুত্তর দেবার জন্যই তিনি উপরোক্ত কথাগুলি বলেন।

১৮৮৭ সালের পরেও অনেক বছর ধরে তিনি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আলাপ আলোচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের একথা সবসময়েই বোঝাতে চেষ্টা করে এসেছেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারবে, এ বিষয়ে কংগ্রেস কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না কিন্তু জাতীয় স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়

কার্যকলাপের ব্যাপারে তারা যেন অবশ্যই নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করে এবং উন্নততর সরকার, ভারতীয়দের প্রতি অধিকতর ভাল ব্যবহার, ট্যাক্স্ কমানো, শিক্ষালাভে অধিকতর সুব্যবস্থা—অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নতি লাভের ব্যাপারে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে হলে তাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে চলতে হবে। বদরুদ্দিন তায়াবজী একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন, অপরপক্ষে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন একান্ত অনুরক্ত, আনুগত্যসম্পন্ন ও নির্ভীক নেতা হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন।

তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আলীগড় শিক্ষা-কেন্দ্রে ইংরাজীর অধ্যাপক মিস্টার বেক্-এর নামটাও উল্লেখযোগ্য। এই ভদ্রলোকটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন ঝানু এজেন্ট। স্যার সৈয়দ আহমদের জীবনের শেষভাগে তিনি তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে নিয়েছিলেন। তখনকারদিনের একজন লেখকের ভাষায় স্যার সৈয়দ আহমদ শেষকালে মিস্টার বেকের চোখ দিয়ে দেখতেন, তার কান দিয়ে শুনতেন এবং তার মুখ দিয়ে কথা বলতেন। স্যার সৈয়দ আহমদকে এইভাবে হজম করে নিয়ে তিনি বদরুদ্দিন তায়াবজীর দিকেও হাত বাড়িয়েছিলেন। বদরুদ্দিন তায়াবজীর কাছে লেখা এক চিঠি থেকে আমরা তার পরিচয় পাই। তিনি লিখেছিলেন যে তার এই চিঠির মধ্য দিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ এবং তার নিজের উভয়ের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। "কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযোগ তা কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের জন্য নয়, আমাদের আপত্তির কারণ মৌলিক। কংগ্রেস জনসভায় অনুষ্ঠান করে সাধারণ দুঃখদুর্দশার কথা প্রচার করে এবং এই জন্যে নানারকম পুস্তিকা ছড়িয়ে বেড়ায়। আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেসের এই ধরনের কার্যপদ্ধতি দুদিন আগে হোক আর পরে হোক, সমস্ত প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তুলবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরো লেখেন, "উত্তরভারতে মুসলমানেরা একেবারে নিঃস্ব। একবার যদি তাদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যায় যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের এই শোচনীয় দারিদ্র্যের জন্য দায়ী, তাদের মধ্যে সহজেই বিদ্রোহ দেখা দেবে। তাদের হৃত

গৌরবের কথা স্মরণ করে তাদের মনে গভীর ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়ে ওঠে। বাদশাহী আমলের অট্টালিকাগুলি তাদের সম্প্রদায়ের অবনতির প্রত্যক্ষ প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিল্লীর প্রাচীন লোকেরা এখনও তৈমুরের বংশধর দিল্লীর সম্রাটের কথা স্মরণ করে। সেই সঙ্গে তাদের ধর্মান্ধতার কথাও চিন্তা করে দেখেন, তা কিন্তু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এখনও কখনও কখনও এখানে ওখানে জেহাদের আওয়াজ শোনা যায়। ইতি-পূর্বে দিল্লী এবং ঐরোয়াতে আমরা যা দেখেছি তার মতই সাধারণ মানুষও উত্তেজনাপ্রবণ এবং যুদ্ধলিপ্সু। যদি এভাবে প্রচার কার্য ছড়িয়ে পড়তে থাকে তবে সারা উত্তর ভারতে আগুন জ্বলে ওঠার খুবই আশংকা আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি দুটি কারণে এটা পছন্দ করিনা—প্রথমতঃ আমার গলা কাটা পড়ুক আমি এটা চাইনা, দ্বিতীয়তঃ—যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি এতকাল কাজ করে এসেছি, তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে; এই পতনের পর মুসলমানেরা আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।''

বদরুদ্দিন তায়াবজীকে সরিয়ে আনার জন্য, প্রথমে সরকার, স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী এবং আরো অনেকে নানাভাবে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা তাঁর উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেননি। হিন্দু মুসলমানদের মিলিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস কোনোদিন হারান নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন।

সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে

১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই দিনটি অবিস্মরণীয়। অবিস্মরণীয় বটে, কিন্তু স্মরণ করা যাক এই দিবসটির ইতিহাস ও তাৎপর্য আমাদের কজনেরই বা জানা আছে! আমাদের দেশের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অধিকাংশের অজ্ঞতা, অবহেলা বা একদেশ-দর্শিতার বশে এই দিবসটি বিস্মৃতির তলায় চাপা পরে গিয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ, এমনকি রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পর্যন্ত এই দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে উদাসীন। অথচ এই সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা, এই তারিখেই যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) রায়বেরেলির সৈয়দ আহমদ তাঁর দীর্ঘস্থায়ী ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ শুরু করেছিলেন।

এই ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রাম একমাত্র মুসল-মানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তার দুটো কারণ আছে। প্রথম কথা, ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকারের ফলে মুসলমানদের মনে যে গভীর আঘাত ও মর্মবেদনার সৃষ্টি হয়েছিল, হিন্দুদের মনে ঠিক সেইরকম প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। এতকাল প্রধানত মুসলমানেরাই সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ সুবিধা লাভ করে আসছিল। ব্রিটিশ সরকার সেই প্রচলিত ব্যবস্থাকে এক কথায় নাকচ করে দিয়ে হিন্দু সমাজের দিকে অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করে দিলেন। হিন্দুদের মধ্যে একটি শ্রেণী একান্ত আনুগত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়ে চলল। সেই আনুগত্য ও রাজভক্তির যুগে ব্রিটিশের বিরোধিতা বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি।

দ্বিতীয় কথা, সৈয়দ আহমদের এই ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ মূলত স্বাধী-নতা সংগ্রাম হলেও তা ইসলামের-ধর্মীয় বিধানের আবরণে এমনভাবে

ঘেরাও করা ছিল যে হিন্দুদের মধ্যে কারো ইচ্ছা থাকলেও তাদের পক্ষে সে সংগ্রামে যোগদানের সুযোগ ছিল না। ফলে এই সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তারা সবাই মুসলমান। কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণেই এই সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম নয় বলে কেউ যদি আপত্তি তোলেন; তবে এই যুক্তিকে কোনমতেই গ্রাহ্য করা যায় না। একমাত্র হিন্দুদের সংগ্রামের ফলে স্বাধীনতা লাভ যদি সম্ভবপর হতো, তাহলে আমরা বিনা দ্বিধায় তাকেও স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যাই দিতাম।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হলেও এ বিষয়ে সবাই একমত যে এই বিদ্রোহে মুসলমানেরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ফলে বিদ্রোহ যখন ভেঙ্গে পড়ল, তখন মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ সরকারের আক্রমণ নগ্নমূর্তিতে নেমে এল। অপরপক্ষে মুসলমান-রাও পাশ্চাত্য শক্তির প্রতি বিরুদ্ধতার বশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির বিরুদ্ধে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধার সৃষ্টি করে তুলেছিল। এযুগে মুসলিম বিদ্বেষ ও হিন্দুদের তোষণই ছিল ব্রিটিশ রাজনীতির মূল কথা।

কিন্তু পরবর্তীকালের নূতন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ রাজনীতির চাকা সম্পূর্ণ-ভাবে ঘুরে গেল। বিশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে হিন্দুদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিল, তার ফলে তারা যে শুধু শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নতি লাভ করল তা নয়, তার প্রভাব রাজনীতির ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য স্বাধীনতার স্বপ্ন তখনও বহুদূরে, তাহলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছিল। দেশ বিদেশে শাসন ও শোষণের অভিজ্ঞ-তায় পরিপক্ক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাষ চিনে নিতে একটুও দেরি হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল, তার মূল কথা দাঁড়াল হিন্দু বিদ্বেষ ও মুসলিম তোষণ। ঝানু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত শাসনের প্রথম থেকে শেষদিন পর্যন্ত তার 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতির সাহায্যে এই দুই সম্প্রদায়কে দিয়ে বাঁদর নাচ নাচানোর

খেলাটা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে এসেছে।

লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তার ফলে সারা বাংলাদেশে এক যুগান্তর ঘটে গেল। এই 'Settled fact'কে 'Unsettle' করার জন্য নেমে এল তীব্র প্রতিরোধ। বাংলার কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করে এইবারই প্রথমবারের মত সক্রিয় গণ-আন্দোলনের পথে নেমে এল। এই আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত, পরবর্তীকালে যার প্রভাব সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রকাশ্য আন্দোলনের পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ বাংলার বুকে কয়েকটি গোপন বিপ্লবী দল অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ছিল তাদের আদর্শ।

লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল। এই প্রদেশ গঠনের ফলে নানারূপ সুযোগ সুবিধা ও রাজনৈতিক অধিকার মুসলমানদের হাতে আসবে, এই প্রচারের ফলে মুসলমানদের ব্যাপক অংশ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের সপক্ষে ছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত কিছু সংখ্যক নেতা ও কর্মী সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতাকামী গোপন বিপ্লবীদলগুলির সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের কোনই যোগাযোগ ছিলনা। অবশ্য সেজন্য শুধু মুসলমানরাই যে দায়ী তা নয়, এই বিপ্লবী দলগুলি হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাবে এমন-ভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে, কোন মুসলমানের সামনে তাদের মধ্যে প্রবেশ করার পথ উন্মুক্ত ছিলনা। তা সত্ত্বেও এখানে ওখানে এই সাধারণ সত্যের কিছুকিছু ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে অন্যতম মওলানা আবুল কালাম আজাদ তার কৈশোরে এই বিপ্লবীদলের আদর্শেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজের উদ্যোগে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্মে মুসলমান সেই কারণে তার প্রবেশ পথে বাঁধার প্রাচীর দাঁড়িয়েছিল। কোন মুসলমান যে

সত্য সত্যই দেশপ্রেমিক হতে পারে, এই সমস্ত হিন্দু বিপ্লবীরা সে কথা বিশ্বাস করতে পারতো না। এই চিন্তা থেকেই তাঁরা কোন মুসলমান তরুণ-কে দলভুক্ত করার পক্ষপাতি ছিলনা। কিন্তু চির বিদ্রোহী আজাদকে বাঁধা দিয়েও তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারলনা। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সহায়তায় সেই অদম্য কিশোর বাঁধার প্রাচীর ভেঙ্গে বিপ্লবীদলে যোগদান করল।

বিপ্লবীদলে যোগদান করার পর তিনি হিন্দু বিপ্লবীদের মন থেকে মুসল-মানদের সম্পর্কে সে ভ্রান্তধারণা দূর করার জন্য উঠে পরে লাগলেন। তিনি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, মুসলমানরা রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে থেকে দেশপ্রেমিক কর্মীরা বেড়িয়ে আসবেনা, এমন একটা কথা সত্য হতে পারেনা। বিশেষ করে যেহেতু তারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়, সেহেতু তাদের সচেতন করে তোলার জন্য দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করা দরকার। অত্যন্ত দুঃখের কথা হলেও একথা সত্য যে বিপ্লবী আজাদ সেদিন তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে এবিষয়ে তেমন কোন সাড়া পাননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত বিপ্লবী জীবনে তিনি শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের মধ্যে তার বিপ্লবী আদর্শের প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই আদর্শের আহ্বানে তিনি তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়াও পাচ্ছিলেন।

মওলানা আজাদ মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, পেশোয়ার ও উত্তর ভার-তের সফর শেষ করে কোলকাতায় ফিরে এসে "হালিবুল্লা" নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠনের মধ্যে তিনি কোলকাতার ও বাইরের মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে অনেক দেশপ্রেমিক কর্মীকে এনে জড়ো করেছিলেন। ১৯১৮ সালের পরেও তিনি একই সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন, হিজরত আন্দোলন, এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক কার্য-কলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে সরকার তার কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন।

কোলকাতার আবদুর রজ্জাক খান মওলানা আজাদের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক দলে যোগদান করেছিলেন। তিনি প্রধানত যুগান্তর দলের জন্য

বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে আবদুর রজ্জাক খান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। আজও তিনি পশ্চিম বঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে পরিচিত।

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবী দলগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ তখন সংকটে বিব্রত, ভারত থেকে সৈন্যদলকে যুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাঠানো হচ্ছে, বিপ্লবীদের মতে এইটাই ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মহেন্দ্র লগ্ন। একদিকে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থানের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিলেন অপরদিকে ভারতের বাইরের প্রবাসী বিপ্লবীরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জার্মান সরকারের সঙ্গে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে আসছিলেন। এই উদ্দেশ্যে 'বার্লিন কমিটি' গঠিত হয়েছিল এবং এই পরিকল্পিত অভ্যুত্থানে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের ব্যাপারে ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান সরকারের সঙ্গে এক সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অনেক মুসলমান বিপ্লবী প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৌলবী বরকতুল্লাহ-এর নাম তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবীদের দ্বারা কাবুলে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্র জাতীয় এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল না। এই শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ-ছিলেন মাহমুদ আল হাসান।

তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্বে কোন বিপ্লবী-দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সৃষ্টির জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ও তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তার সুযোগ্য ছাত্র মওলানা ওবেদুল্লাহ সিন্ধির মিলিত উদ্যোগে এই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলেছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে তাঁরা তাদের বিদ্রোহের গোপন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পরে গ্রেপ্তারের হাত এড়াবার জন্য তাঁদের দেশত্যাগ করে ভারতের বাইরে চলে

যেতে হয়েছিল। তারপর থেকে মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, সোভিয়েত রাশিয়া ইত্যাদি অঞ্চল তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

ভারতীয় বিপ্লবীরা ব্রিটিশের এই যুদ্ধসংকটের সুযোগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের প্রচার চালিয়ে আসছিলেন। সৈন্যদের বিদ্রোহের জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখও ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে এই সংবাদটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক গ্রেপ্তার চলে এবং এই সমস্ত বাহিনীকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। ফলে সৈনিক বিদ্রোহের এই প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচারের কাজ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রাচ্য অঞ্চলে যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের ঘাঁটি ছিল, প্রবাসী বিপ্লবীরা তাদের মধ্যেও বিদ্রোহের প্রচার করে চলেছিল। এই বিপ্লবীরা সিঙ্গাপুর, মান্দালয়, রেঙ্গুন, জাভা, সুমাত্রায় অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে তাদের এই প্রচারের কাজ চালিয়েছিল। এই সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মুসলমান। এই সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন বন্দর ও ডকের নাবিকরা 'জাহান-ই-ইসলাম' নামক বিপ্লবী পত্রিকা ছড়িয়ে বেড়াত। এই পত্রিকার একটি সংখ্যায় ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে মিশরের নেতা আনোয়ার পাশার একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেই আবেদনে বলা হয়েছিল, "হিন্দু ও মুসলমান ভাইরা, তোমরা একই বাহিনীর সৈনিক, তোমরা পরস্পরের ভ্রাতৃতুল্য। এই ঘৃণ্য ইংরাজরা তোমাদের দুশমন। তোমরা এই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হও। এর মধ্য দিয়ে তোমরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এর মধ্য দিয়েই তোমরা স্বাধীনতা লাভ করবে।"

এই প্রচারের ফলে ১৯১৫ সালে জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক ও সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ১৯১৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে অবস্থিত "ফিফথ লাইট ইনফ্যানট্রির" মধ্যে বিদ্রোহ

দেখা দিল। সেখানকার সৈন্যদের মধ্যে সবাই ছিল মুসলমান। কিন্তু তাদের এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। বিদ্রোহীদের মধ্যে দুজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এবং তেতাল্লিশ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, বাকি সবাই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ১৯১৫ সালের জুন মাসে সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অভিযোগে সিঙ্গাপুরের কালিম ইসমাইল খান মান্নুর নামক একজন ধনী ব্যবসায়ীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে বনুউল্লাহ্, খান, ইমতিয়াজ ও রুকনউদ্দিন নামক তিনজন সৈনিককে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে তারা শেষবারের মতো পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে সিঙ্গাপুরে ৪৫ জন এন. সি. ও বিদ্রোহ করেছিল। তাদের মধ্যে হাবিলদার সুলেমন, নায়ক মুসলিম খান, নায়ক জাফর আলী খান, নায়ক আবদুর রেজ্জাক এবং তাদের সাতজন শিখ সহকর্মীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ১৯১৭ সালে দ্বিতীয় মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলায় জয়পুরের মুস্তফা হোসেন, লুধিয়ানার অমর সিং এবং ফইজাবাদের আলি আহমেদ, এই তিনজন সৈনিককে বিদ্রোহের অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এর পরবর্তীকালে যে সমস্ত স্বাধীনতাকামী তরুণ মুসলমান বিপ্লবী দলগুলির কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে তাদের মধ্যে অনেকের নাম বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি নামের উল্লেখ করছি :

ময়মনসিংহ জেলার যুগান্তর পার্টি দলভুক্ত যে ক'জন মুসলমান বিপ্লবীর নাম জানা গেছে, তাঁরা হচ্ছেন নেত্রকোনার মুকসুদ্দিন আহমদ, নাসিরুদ্দিন আহমেদ ও তার মেয়ে রিজিয়া খাতুন এবং আবদুল কাদের উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত রিজিয়া খাতুন তাঁর এই পরিণত বয়সেও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ময়মনসিংহ শহরে সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা আলতাব আলি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে অনুশীলন পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া কিশোরগঞ্জের ওয়ালি নওয়াজ, মহম্মদ

ইসমাইল ও চাঁদ মিয়া 'রিভোল্ট গ্রুপের' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সিরাজুল হক ও হামিদুল হক হুগলী যুগান্তর পার্টির কর্মী ছিলেন। বগুড়ার সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা ডাক্তার ফজলুল কাদের চৌধুরী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় অনুশীলন সমিতির দলভুক্ত ছিলেন। হিলি ডাকলুট মামলায় দণ্ডিত হয়ে তাঁকে দীর্ঘদিন আন্দোলনে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয়েছে। এরা সকলেই দেশের জন্য যথেষ্ট নির্যাতন ও ত্যাগ স্বীকার করে এসেছেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে বেশী সংখ্যক লোক প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবীদলের কাজে অংশগ্রহণ না করলেও বিপ্লবীদের সম্পর্কে মুসলমান জনসাধারণের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ভাব ছিল, মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে এবং নানাভাবে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা যুগিয়ে এসেছে। এ জন্য তাদের বহু দুঃখও বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের নাম-ধাম-পরিচয় চিরদিন অপ্রকাশিত থেকেই যাবে। এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তীকালের ঘটনাগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। চট্টগ্রাম জেলার মুসলমান চাষীরা সেই সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল। তাদের সাহায্য ছাড়া পুলিশের বেড়াজালের ফাঁক দিয়ে বেড়িয়ে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোনাপুরের কল-কারখানার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এক ব্যাপক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের তীব্র সংঘর্ষ ঘটেছিল। এই মামলায় চারজন শ্রমিক মারবেদা জেলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন মুসলমান, তাদের নাম আবদুর রসিদ ও কুরবান হোসেন। মৃত্যুকে এড়াবার জন্য তাঁরা জীবন ভিক্ষা চাইতে রাজী হন নি।

এখানে একটি মূল্যবান জীবন আত্মাহুতির কাহিনী দিয়ে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করব। উত্তর ভারতে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখের উদ্যোগে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি' নামে একটি

বিপ্লবী দল গঠিত হয়েছিল। আশফাকুল্লাহ্ ছিলেন সেই দলের একজন সক্রিয় ও বিশিষ্ট কর্মী। সেই সময় বিপ্লবী দলগুলির অর্থ সংগ্রহের প্রধান পন্থা ছিল ডাকাতি।

১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট তারিখে এই বিপ্লবীদলের কর্মীরা লক্ষ্মৌ থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে কাকোরী স্টেশনে ডাক গাড়ী থেকে টাকা সিন্দুক লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বহুলোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের নিয়ে লক্ষ্মৌতে ১৯২৬ সালের ১লা মে থেকে সুপরিচিত কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করা শুরু হয়। এই মামলায় চারজনকে মৃত্যুদণ্ডে এবং অন্যান্যদের দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। যাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন রাজেন লাহিড়ী, আশফাকুল্লাহ, রামপ্রসাদ বিসমিল ও রোশন সিং। ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর, ১৯শে ডিসেম্বর ফায়জাবাদ জেলে আশফাকুল্লাহ ও গোণ্ডা জেলে রামপ্রসাদ বিসমিলের এবং ২১শে ডিসেম্বর নাইনী জেলে রোশন সিং-এর ফাঁসি হয়।

ফাঁসির আগের দিন ফায়জাবাদ জেলে আশফাকুল্লাহ-র সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা এসেছিলেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের মরণের আগে এই সুযোগটুকু দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। যারা দেখা করতে এসেছিলেন তাদের সকলের চোখে জল, বিশেষ করে তার আদরের ভাইপোটির। শেষবিদায় দেবার মুহূর্তে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, মৃত্যুপথগামী আশফাকুল্লাহ ভাইপোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আমার জীবনের এই সর্বোচ্চ পরীক্ষাটিকে যথোচিত মর্যাদা ও ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে দাও। তা নাহলে আমার এই পরম উৎসবে কলঙ্কপাত ঘটবে। মাতৃভূমির মুক্তির পবিত্র ও মহান দায়িত্ব আজ আমার উপর ন্যস্ত, এ আমার পক্ষে এক বিরাট সম্মান। তোমার আপনজনদের মধ্যে একজন এই মহৎ কাজে আপনার জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ পেয়েছে, এজন্য তোমার সুখী ও গর্বিত বোধ করা উচিত। একথা স্মরণ রেখো, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের মত বহু দেশপ্রেমিক মাতৃভূমির মুক্তির জন্য জীবনকে ডালি দিয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

হয়েও আমি যে সেই শহীদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার সুযোগ ও অধিকার লাভ করেছি, এটা আমার পক্ষে বহু ভাগ্যের কথা।"

সৈয়দ আহমদ কর্তৃক পরিচালিত মুজাহিদ বাহিনীর অর্ধশতাব্দীকাল-ব্যাপী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে এই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত সশস্ত্র বিদ্রোহে বহু মুসলমান দেশপ্রেমিক মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য শাহাদত বরণ করে গেছেন। প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্যই হোক অথবা বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার ফলেই হোক আমাদের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মনে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় যেন না থাকে। তাদের আদর্শ ও প্রেরণা বর্তমানের হতাশার অন্ধকারেও আমাদের ভবিষ্যৎ পথকে প্রদীপ্ত করে তুলুক।

স্বদেশী-আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এক নূতন রূপ—সংগ্রামী রূপ গ্রহণ করল। নানা কারণে সারা ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করেছিল। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে সমগ্র ভারতকে এক নূতন পথের নিশানা দিল। এই আন্দোলন প্রধানতঃ বাংলা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বটে কিন্তু তার প্রবাহ দেখতে দেখতে সারা দেশে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মূলে যার দায়িত্ব সর্বাধিক তিনি হচ্ছেন ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন। অবশ্য দুদিন আগে হোক বা পরে হোক ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যেত না। বাংলাদেশকে দুভাগে ভাগ করার চক্রান্তের ফলে লর্ড কার্জন যে সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে ত্বরান্বিত করে এনেছিলেন, সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে এটাকে তার একটা বিশেষ অবদান বলা চলে।

ব্রিটিশ রাজনীতির ধুরন্ধরদের ইঙ্গিতে ও সহায়তায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ জন্মলাভ করল। ব্রিটিশ সরকারের পরম বশংবদ অভিজাত মহলের মুসলমান নেতাদের নিয়ে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল। একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ফলে রাজনৈতিকভাবে অচেতন ভারতের শিক্ষিত মুসলমান সমাজ এই নবগঠিত মুসলিম লীগকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানিয়েছিল।

১৯০৪ সালে বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি নূতন প্রদেশ গঠনের এই পরিকল্পনা শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

এতকাল সরকারী চাকুরী লাভের সুযোগ সুবিধা হিন্দুদেরই একচেটিয়া ছিল। বাংলার শিক্ষিত মুসলমানরা স্বাভাবিভাবেই আশা করেছিল যে সংখ্যাধিক্য মুসলমানদের বাসভূমি এই নবগঠিত প্রদেশে তারা এই বিশেষ বিষয়ে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার লাভ করবে। এই সমস্ত শিক্ষিত মুসলমানদের প্রচারের ফলে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে বঙ্গভঙ্গের অনুকূল মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃটিশ সরকার সেদিন তার 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতির সাহায্যে বাংলা তথা ভারতের মুসলমান সমাজকে তার ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানরা সেদিন প্রত্যক্ষভাবে এই স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছিল, কারো মনে যদি এই ধারণা থেকে থাকে, তাহলে তাদের কিছুটা ভুল বোঝা হবে। এই আন্দোলনের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সরকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের উস্কানীদাতাদের প্ররোচনার ফলে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও হাঙ্গামা ঘটেছিল একথা সত্য, কিন্তু তাই দিয়ে সমস্ত মুসলমান সমাজকে বিচার করা চলে না। অবশ্য মুসলমানদের বেশি সংখ্যক লোকই এই স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেনি। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তারা আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করত, আন্দোলনের প্রভাব তাদের উপরও এসে পড়েছিল, কিন্তু তাদের নিজেদের নেতাদের বাধা ও নিষেধের ফলে তারা বেশী এগিয়ে যেতে পারেনি। এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। সে সময়কার সংবাদপত্র থেকে একথা জানা যায় যে বঙ্গভঙ্গের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ, বরিশাল ও শ্রীরামপুরের বিভিন্ন মসজিদে প্রার্থনা করা হয়েছিল। এরপর থেকে সারা প্রদেশময় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। এই উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, মাদারীপুর বানরিপাড়া, খানখানপুর, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত কোন কোন সভায় স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোকেরা, এমনকি মুসলমান জমিদারেরা পর্যন্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন। এই সব ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে

পুলিশ রিপোর্টে একটু তিক্ততার সঙ্গেই এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে, "এই সমস্ত সভার হিন্দু সংগঠকরা যোগ্যতা থাক আর নাই থাক, যে কোন মুসলমানকে এনে সভাপতির আসনে বসিয়ে দিত"। যারা নিয়মিতভাবে এই সমস্ত স্বদেশী সভায় বক্তৃতা দিতেন, তাদের মধ্যে মুসলমান বক্তাদের সংখ্যাও একেবারেই নগণ্য ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলনের এই জোয়ারের সময় বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে কলিকাতায় এবং মফঃস্বল জেলাগুলিতে বহু সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল। এই সমস্ত সভায় যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান বক্তারা বক্তৃতা দিতেন। সরকার পক্ষের রিপোর্টে এই সমস্ত মুসলমান নেতা ও কর্মীদের হিন্দু আন্দোলনকারীদের হাতের পুতুল বা দালাল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সরকারের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তাদের এই মিথ্যা প্রচারণা প্রকৃত ইতিহাসকে চাপা দিতে পারে নি, যে সমস্ত বিশিষ্ট মুসলমান বক্তা সে সময় এই সমস্ত সভায় বক্তৃতা দিতেন তারা সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র। সরকার পক্ষ যতই চেষ্টা করুক না কেন তাদের হিন্দুদের দালাল বলে প্রতিপন্ন করতে পারে নি। সেই সমস্ত বক্তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত মুসলমান নেতাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, মৌলবী আবদুল কাশীম, দেদার বক্স, দীন মোহাম্মদ, লিয়াকত হোসেন, ইসমাইল সিরাজী, আবদুল হালিম গজনবী প্রমুখ।

এই আন্দোলনের সামনের সারিতে যারা ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাকে এবং তার সহকর্মী অন্যান্য মুসলমান নেতা ও কর্মীদের এ জন্য বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতনের পাত্র হতে হয়েছে, এমনকি তাদের শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আদর্শনিষ্ঠ অদম্য মানুষগুলিকে দমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে পুলিশের লাঠির ঘায়ে শহরের রাজপথ রক্ত রঞ্জিত হয়েছিল। আবদুর রসুল সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। তিনি পুলিশের আক্রমণের হাত থেকে অব্যাহতি পান নি।

সরকারী এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ১৪ই মে তারিখে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে চার হাজার মুসলমান সমবেত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বিভেদ পন্থী মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে ব্যাপক প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সেই সময় 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় ২৫টি রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠানের সভার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, এই সভাগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান যোগদান করেছিলেন।

এই স্বদেশী আন্দোলনে সারা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছিল বরিশাল। বরিশালের মুকুটহীন রাজা সর্বজনপ্রিয় অশ্বিনী-কুমার দত্ত এবং তাঁর সহকর্মীরা বেশ কিছুকাল আগে থেকেই হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী মন্ত্র প্রচারের কাজ চালিয়ে আস-ছিলেন। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, এই বিষয়ে সারা ভারতে তিনিই প্রথম পথদ্রষ্টা। ১৯০৮ সালে বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার নামে খ্যাত বরিশাল জেলায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে সুসংগঠিত সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে অশ্বিনীকুমার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মধ্যে সে এক অতুলনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তার বলে তার স্বদেশী আন্দোলনের আহ্বান বরিশালের শহর ও গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে মফিজউদ্দিন বয়াতী জারিগানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। বরিশালের হিন্দু মুসলমানের এই মিলিত প্রতি-রোধের ফলে সেদিনকার বরিশাল বৃটিশ সরকারের কাছে দুর্ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৃটিশ সরকারের পরম অনুগত ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ নানা-ভাবে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী দিয়ে বরিশালের মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানদের মধ্যে কিছু না কিছু সহযোগিতার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। স্বদেশী ব্যবসার ক্ষেত্রে টাঙ্গা-ইলের আবদুল হালিম গজনবী এবং বগুড়ার নবাবের উদ্যোগে 'ইউনাইটেড বেঙ্গল কোম্পানী' ও 'বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণা থেকেই চট্টগ্রামের মুসলমান ব্যবসায়ীরা 'দি বেঙ্গল স্টীম কোম্পানী' নামে একটি স্টীমার কোম্পানী দাঁড় করিয়েছিলেন। যে সমস্ত স্বদেশী নেতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন, আবদুর রসুল ছিলেন তাদের অন্যতম। ৯২ জন সভ্য নিয়ে গঠিত 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' এর মধ্যে ৭৬ জন সভ্য ছিলেন মুসলমান। ব্রাহ্ম নেতৃত্বে পরিচালিত অ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটিতে মুসলমান কর্মীরা সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন। ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়ে'র ধর্মঘটের সময় আবুল হোসেন ও লিয়াকত হোসেন প্রচারকার্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে'র ৬ জন মুসলমান ড্রাইভার তাদের কাজ থেকে বিরত থাকবার জন্য কোরান ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের বিপ্লবীদের আদর্শ কি এখানকার মুসলমান তরুণদের মনকে একেবারেই আকর্ষণ করতে পারেনি? আমরা জানি এই পূর্ণ স্বাধীনতা ও সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ তাদের মধ্যে কারো মনে সাড়া জাগিয়েছিল, কিন্তু সে যুগের বিপ্লবীরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোহে মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন, কোন মুসলমানকে তারা বিশ্বাস করতে পারতেন না। এমন একটা ঘটনা ঘটতে শোনা গেছে, যখন মুসলমান তরুণরা এই সমস্ত বিপ্লবীদলে যোগ দেবার জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সন্দেহের বেড়াটি এমন শক্ত করে বাধা ছিল যে তাদের পক্ষে তার ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল।

কয়েকজন মুসলমান জমিদার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ও এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী, ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র ভাই খাজা আতীকুল্লাহ্‌, ময়মনসিংহ জেলার করটিয়ার জমিদার চাঁদমিঞা এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েসান' এর সভাপতি খান বাহাদুর মোহাম্মেদ ইউসুফ প্রমুখের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। ঢাকার নবাব পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রচারের জন্য কুখ্যাত। সেই পরিবারেরই একজন এবং মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতি-

ষ্ঠাতা সলিমুল্লাহ্র ভাই খাজা আতীকুল্লাহ্ কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্য দিয়ে তিনি যে তার নির্ভীক দেশপ্রেমিকতা ও সবল ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবাব পরিবারের আরও কয়েকজন তরুণ পরবর্তীকালে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে জমিদারদের মধ্যে আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়। বরিশালের জমিদার চৌধুরী গোলাম আলী মওলানা ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালে রাখীবন্ধনের আবেদনে স্বাক্ষর করেছিলেন। ঐ জেলারই আর একজন জমিদার সৈয়দ মোতাহার হোসেন স্বদেশবান্ধব সমিতির প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ফরিদপুরে এক হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। এই প্রতিবাদ-লিপির সর্বপ্রথমে জমিদার চৌধুরী আলীমুজ্জামান নামে স্বাক্ষর ছিল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে জমিদার, তালুকদার, জোতদার এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা ছিলেন। অবশ্য প্রভাবশালী জমিদারদের মধ্যে প্রায় সবাই বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্তের সমর্থক ছিল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ ও ময়মনসিংহের নবাব আলী চৌধুরীর নাম করা যেতে পারে।

এছাড়া যারা স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে বর্ধমানের জমিদার আবুল কাশেম, কুমিল্লা নিবাসী ব্যারিস্টার আবদুর রসুল এবং টাঙ্গাইল নিবাসী কলিকাতার আইনজীবী আবদুল হালিম গজনবীর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী দুজন অর্থাৎ আবদুর রসুল ও গজনবী, স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সমানভাবে কাজ করে গেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই দুটি নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর এক পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের ব্যাপারে মুসলমান দোকানদারদের মধ্যে প্রচারের জন্য বিশেষভাবে গজনবী সাহেবকেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে সময় চাঁদনী চকে বিলাতী জুতা আমদানীকারী মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল তার নিজ জেলা ময়মন-

সিংহের লোক। আবদুল হালিম গজনবী 'বেঙ্গল মহামেডান অ্যাসো-সিয়েসন'-এর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ব্যারিস্টার আবদুর রসুল উক্ত 'বেঙ্গল মহামেডান অ্যাসোসিয়েসনের প্রথমে সভাপতি এবং পরে সম্পাদক ছিলেন। পুলিশ রিপোর্টে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে সময় যে স্বল্পসংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল সবচেয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে আবদুর রসুল চরমপন্থীদের একজন ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এর 'সন্ধ্যা' 'স্বরাজ' পত্রিকা উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত।

এই স্বদেশী আন্দোলনে যে সমস্ত মুসলমান কর্মী সক্রিয়ভাবে কাজ করে গেছেন তাদের মধ্যে দীন মহম্মদ অন্যতম। তাঁর কিছুকাল আগেই তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা লোকের মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। সরকারী রিপোর্টেও একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে তিনি যে সমস্ত সভায় বক্তৃতা দিতেন, সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে লোক জমত এবং শ্রোতাদের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান-দের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যেত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে আমরা তাঁর রানাঘাট, গোবরডাঙা ও দিনাজপুরের সভার খবর জানতে পেরেছি।

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী দেদার বক্স ছিলেন কলিকাতার একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি কলিকাতার বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিতেন। শুধু তাই নয়, ১৯০৭ সালের প্রথমদিকে আমরা তাকে তমলুক, বাগনান, রাজশাহী ও মালদহের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করতে দেখতে পাই। রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে তিনি মডারেট পন্থী ছিলেন। সেই কারণেই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতেন। ১৯০৮ সালে হাওড়া হুগলী ডিসট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন-এ মডারেট পন্থীদের প্রাধান্য ছিল। দেদার বক্স এই অ্যাসোসিয়েশন-এর নিয়মিত প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত

হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে হুগলীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

১৯০৭ সালের মে মাসে সরকার কয়েকজন স্বদেশী বক্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। স্কুল শিক্ষক হেদায়েত বক্স ও স্বদেশী সমর্থক 'সুলতান' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত মনিরুজ্জামানের নাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সিরাজগঞ্জের সৈয়দ আবু মুহাম্মদ ইসমাইল হুসেন সিরাজী অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিতেন এবং স্বদেশী কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে সকলের মন মাতিয়ে তুলতেন। এজন্য বঙ্গভঙ্গের সমর্থক প্রতিপক্ষ মুসলমানদের দ্বারা তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহারিত হতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তাঁকে তার চলার পথ থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি। হুগলীর আবুল হুসেন এবং বাটাজোর-এর কর্মী প্রাক্তন শিক্ষক আবদুল গফুরের মত জোরদার বক্তা সে যুগে কমই ছিল। তারা নদীয়া, দিনাজপুর, পাবনা, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ডায়মণ্ড হারবার, এক কথায় বলতে গেলে বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলেই বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। তারা জামালপুর ও আসানসোলের ধর্মঘটী শ্রমিক এবং বরিশালের কৃষকদের প্রতিও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে আবদুল গফুর তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন সরকার তাদের বন্দুক চালাবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, অতএব তারা যেন নিয়মিতভাবে লাঠি খেলার চর্চা করে এবং তারা যেন এই অর্ধ-শিক্ষিত বিদেশীদের সমুদ্রের ওপারে তাড়িয়ে দেবার জন্য কোমর বেঁধে কাজে লাগে।

কিন্তু এই সমস্ত মুসলমান বক্তা ও কর্মীদের মধ্যে লিয়াকত হোসেন নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। বিখ্যাত সন্ধ্যা পত্রিকায় তার প্রশংসনীয় কার্যাবলীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি স্বদেশীর প্রচার এবং জনসাধারণের সেবার কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯০৮ সালে বরিশালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অশ্বিনীকুমারের সহকারী

হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি অ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত চরম পন্থী হিসাবে তিনি মডারেট পন্থী-দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সে যুগের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যে সমস্ত মুসলমান নেতা ও কর্মী বিদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, 'দি মুসলমান' ও 'সুলতান' এই দুটি ইংরেজী-ও বাংলা সাপ্তাহিকের মধ্য দিয়ে আমরা তাদের মনোভাবের পরিচয় পাই। ১৯০৭ সালে আবদুর রসুল ও আবদুল হালিম গজনবীর উদ্যোগে একটি লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক 'দি মুসলমান' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদক হিসাবে আবুল কামালের নাম লেখা হলেও তিনি নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন। কার্যত মুজিবর রহমান সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন করে চলতেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা এই 'দি মুসলমান' পত্রিকাটির সঙ্গে সহযোগিতা করে চলত এবং তাকে ৩৫০০ টাকার ঋণ দিয়েছিল। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে 'দি মুসলমান' পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কর্মনীতি অর্থাৎ মডারেট নীতি অনুসরণ করে চলত এবং চরমপন্থী 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার বিরোধিতা করত। সুরাট কংগ্রেস ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারে 'দি মুসলমান' তিলককেই সর্বতোভাবেই দায়ী করেছিল। আগেই বলা হয়েছে আথিক ব্যাপারে 'দি মুসলমান'কে 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার উপর কিছুটা নির্ভর করতে হত। কিন্তু তা হলেও এই পত্রিকাটি মুসলমান সমাজের স্বার্থ এবং মুসলমানদের যথার্থ মনোভাব সম্পর্কে স্বাধীনভাবেই তার মতামত প্রকাশ করত।

স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী শিল্পের গঠনের কর্মসূচীকে 'দি মুসলমান' পুরোপুরিভাবেই সমর্থন করে চলত। সে সময় স্বদেশী শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্পই প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। 'দি মুসলমান' পত্রিকার মতে, যেহেতু হিন্দু তাঁতীদের তুলনায় মুসলমান জোলাদের সংখ্যা অনেক বেশী, সেই কারণে স্বদেশী বস্ত্র শিল্পের উন্নতি হলে মুসলমানরাই বেশী উপকৃত হবে। কিন্তু মুসলমান সমাজের অধিকাংশের

মনোভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে এই পত্রিকাটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার প্রশ্নটিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চাইত। কাউন্সিলের রিফর্মের ব্যাপারে 'দি মুসলমান' এক সময় সে সম্পর্কে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেছিল। মুজিবর রহমান ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের সরকারী চাকুরীর প্রতি মোহগ্রস্ততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। সে সময় শিক্ষিত মুসলমান সমাজে একটা চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যেত, তাদের মধ্যে অনেকে উৎপত্তি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নিজেদের বাঙালী বলে স্বীকার করতে চাইত না এবং বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে নিজেদের ভাষা বলে দাবী করতেন। 'দি মুসলমান' পত্রিকা সব-সময় এই লজ্জাকর মনোবৃত্তির উপর তীব্র কশাঘাত করে এসেছে।

যে সমস্ত মুসলমান লেখক বা কর্মচারী 'দি মুসলমান' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, হিন্দুদের আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাদের মনে কিন্তু বহু অভিযোগই সঞ্চিত হয়েছিল। তাদের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং কোনমতেই এটাকে অসঙ্গত বলা চলে না। মুজিবর রহমান সব সময়ই তার 'দি মুসলমান' পত্রিকার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের বাণী প্রচার করে এসেছেন। কিন্তু তিনিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা স্বীকার করে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ 'হিন্দুস্তান রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে তার এই রচনাটি 'দি মুসলমান' পত্রিকায় পুনর্মুদিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, কোন মুসলমান ঘরে এসে ঢুকলে হিন্দুরা তাদের হুকোর জল ফেলে দেয়, গো-হত্যার নাম শুনলে তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং মুসলমান কৃষকদের বকর ঈদ উপলক্ষে গরু জবেহ্ করার ব্যাপারে জমিদাররা যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করে থাকেন। অথচ অ-হিন্দুদের খাদ্য হিসাবে প্রতিদিন হাজার হাজার গরু হত্যা করা হচ্ছে', এই সত্যটা কারুর কাছেই অজানা নয়। মুসলমানদের হাতে ছোঁয়া জল খেলে হিন্দুদের জাত যায়, কিন্তু মুসলমানদের হাতে তৈরী সোডা লেমনেড ইত্যাদি খেতে তাদের দিক থেকে কোনই আপত্তি ওঠে না। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত মুসলমানদেরও নিজেদের সমশ্রেণীর লোক বলে মর্যাদা দিতে চান না।

তাদের সাহিত্যে 'যবন'দের বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালানো হয়ে থাকে।

কিন্তু জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রশ্নে 'দি মুসলমান' পত্রিকার সঙ্গে 'সুলতান' পত্রিকার যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তার দৃষ্টি ছিল প্রখরতর। কোন কোন ব্যাপারে এই পত্রিকার মতামত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকত। এই পত্রিকায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে নানারকম সমালোচনা করা হত। কিন্তু আলীগড় ও ঢাকার শিক্ষিত মুসলমানদের রাজনীতি যে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহ ও দয়াদাক্ষিণ্যের উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল 'সুলতান' পত্রিকা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে চলত।

কিন্তু তা হলেও 'সুলতান' পত্রিকা যে মুসলমান সমাজের যথার্থ উন্নতির ব্যাপারে সচেতন ছিল, নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যাবে :

"আত্মনির্ভরশীলতা ছাড়া কোন জাতি কখনও বড় হতে পারে না…… আমাদের নিজেদের দেশীয় শিল্পের প্রতি আমাদের কোনমতেই অবহেলা করা চলে না। আমরা যদি নিজেদের পায় দাঁড়াতে না পারি, তাহলে কি বৃটিশ কি হিন্দু কেউ আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে না……স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াও এবং উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যে সচেষ্ট হও।"

'সুলতান' পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলন ও বিলাতী দ্রব্য বর্জনের এবং মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করত।

এই সমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ও কর্মীরা প্রধানত ব্যক্তিগত ভাবেই কাজ করে আসছিলেন, তাদের নিজেদের কোন স্বতন্ত্র সংগঠন ছিল না। লিয়াকত হোসেন এই উদ্দেশ্যে আঞ্জুমান-ই-ইসলামীয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাব করেছিলেন বটে কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্যকর হয় নি। 'বেঙ্গল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল বটে। কিন্তু বছরে একবার করে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন করা ছাড়া তার আর বিশেষ কোন কাজ ছিল না। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আবদুর রসুলের বাড়ীতে এক

সভায় ভারতের বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের নিয়ে ইনডিয়ান মুসলমান এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল। মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মাহমুদ, দিল্লীর সৈয়দ হায়দার রেজা এবং মহম্মদ আলী জিন্না এই প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটিও কাগুজে প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে এর কোন বাস্তব অস্তিত্বও ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলনের তিন পুরুষ

মওলবী লিয়াকত হোসেন

আজকের দিনে এই নামটি খুব কম লোকের কাছেই পরিচিত। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ নামটি বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। বস্তুতঃ লিয়াকত হোসেন বাঙালী নন, তাঁর জন্ম হয়েছিল বিহারে। তা হলেও বাংলাদেশকে তিনি জন্মভূমির মতই আপন বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আমরা বাঙালীরাও যেন সেই দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে দেখতে পারি।

মৌলবী লিয়াকত হোসেন-এর প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের কোন কিছুই জানা নেই। একজন উদ্যোগী ও সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেই তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ১৯০৫ সালের কথা। সে সময় বড়লাট লর্ড কার্জন নবজাগ্রত বাঙালী শক্তিকে নিষ্পেষিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিধান জারি করেছিলেন। বাংলাদেশ নিঃশব্দে মেনে নেয়নি, এই "Settled fact Unsettled"-করে দেবার জন্য বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিবাদের তুমুল ঝড় উঠেছিল। সেই তাণ্ডবের সময় জনসাধারণকে পথ-প্রদর্শন করার জন্য যাঁরা পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মৌলবী লিয়াকত হোসেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় সে যুগের বাংলার একচ্ছত্র নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর প্রভাব পড়েছিল। পরে তিনি অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন।

সে যুগে যে সমস্ত মুসলমান নেতা বৃটিশ সরকারের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি প্রতিরোধ করে চলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে লিয়াকত হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে প্রচারিত কুখ্যাত 'কারলাইল সার-

কুলারের' বিরুদ্ধে এবং স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে অক্লান্ত হয়ে প্রচারকার্য চালিয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু রাজনৈতিক হিসাবেই নয় সামাজিক সংস্কার সাধনের দিক দিয়েও তাঁর অবদান বড় কম নয়। প্রচলিত অর্থে যাদের 'শিক্ষাবিদ' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে লিয়াকত হোসেন তা ছিলেন না। তা হলেও দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি তাঁর সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে গেছেন। সামাজিক সংস্কার ও জনহিতকর কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ১৯১৬ সালে 'ভারত হিতৈষী সভা' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে দরিদ্র জনসাধারণকে নানাভাবে সাহায্য করাই ছিল এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য। মৌলবী লিয়াকত হোসেন ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। এই সমিতি দরিদ্র ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা-লাভের ব্যাপারে সাহায্য দান করত। সে যুগে হিন্দুদের মধ্যে নিষ্ঠুর পণপ্রথা সমাজের অভিশাপ স্বরূপ ছিল। ফলে দরিদ্র সংসারগুলিতে মেয়েদের পাত্র জোটানো এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাবা-মাদের এই নিদারুণ সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য কত কুমারী মেয়ে আত্মহত্যার পথায় তাদের কিশোরী জীবনের ছেদ টেনে দিয়েছে। লিয়াকত হোসেনের 'ভারত হিতৈষী সভা' মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও গরীব পরিবারগুলিকে অর্থ সাহায্য করত। সমিতির এই সমস্ত কাজের পিছনে তিনিই ছিলেন মূল প্রাণশক্তি। একজন অবাঙালী মুসলমান যে বিশেষ করে বাঙালী হিন্দু সমাজের জন্য এমন গভীর দরদ দিয়ে চিন্তা করতে পারে এবং তাদের সেবায় আপনাকে প্রাণ ঢেলে উৎসর্গ করতে পারে, আমাদের পক্ষে এটা কল্পনাতীত। মৌলবী লিয়াকত হোসেন ছাড়া আর কোথাও এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এটা স্মরণ রাখতে হবে, লিয়াকত হোসেন ছিলেন মূলতঃ রাজনৈতিক কর্মী। বিদেশী ইংরেজদের শাসনপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে অক্লান্ত কাজের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করে চলেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে

অনুসরণ করে চলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথের নরমপন্থী নীতির প্রতি হতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী চরমপন্থী নীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, ১৯০৫-০৮ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যে সমস্ত মুসলমান কর্মী ও বক্তা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন লিয়াকত হোসেনকে তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলা চলে। সেই সময়কার বিখ্যাত 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় তাঁর প্রশংসনীয় কার্যাবলীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের কাজ ছাড়াও ১৯০৮ সালে বরিশালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অশ্বিনীকুমারের সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯০৬-০৭ সালে নরমপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর তিনি বিপিন পাল ও ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন। এই সময় কিছুকালের জন্য 'সন্ধ্যা' পত্রিকা অফিসটাই ছিল তাঁর আস্তানা।

মৌলবী লিয়াকত হোসেন তাঁর স্বদেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এই স্বদেশ শুধু তাঁর দেশের মাটি দিয়ে গড়া নয়, স্বদেশ বলতে তিনি তাঁর দেশের দুঃখ-দুর্দশায় নিপীড়িত, নিষ্পেষিত জনসাধারণকেই বুঝতেন। তাঁর দৃষ্টিতে স্বদেশের মুক্তির একমাত্র অর্থ ছিল তাঁদের মুক্তি। সেই জন্যই যেখানেই অত্যাচার, যেখানেই দুঃখ-লাঞ্ছনা, তার প্রতিকারের জন্য তিনি তাঁর সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তখন বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের সবেমাত্র সূচনা। কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চলত। দেশের নেতারা এমন কি স্বদেশী নেতাদের মধ্যেও খুব কম লোকই এই হতভাগ্য শ্রমিকদের জন্য সত্যিকারের দরদ নিয়ে চিন্তা করতেন। কিন্তু লিয়াকত হোসেন মূলতঃ রাজনৈতিক কর্মী হলেও শ্রমিকদের মধ্যেও তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল। সে সময়কার শ্রমিক আন্দোলনে, বিশেষ করে রেলওয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত নেতা। তাঁর বক্তৃতা অতি সহজেই শ্রমিকদের

হৃদয়কে স্পর্শ করত। তিনি আসানসোল ও বাড়িয়ায় রেলওয়ের ধর্মঘটী শ্রমিকদের বহুসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং আসানসোলের রেলওয়ের ধর্মঘটী শ্রমিকদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে তুলেছিলেন। বর্তমানে যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছেন, অন্যতম পথ প্রদর্শক হিসাবে মৌলবী লিয়াকত হোসেনের নাম তাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সরকারের অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে এবং ঢাকার নবাব ও আরও কয়েকজন সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতার চক্রান্তের ফলে ১৯০৬-০৭ সালে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় পরপর কতগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ওপর এ এক পাষণ্ড আঘাত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরকার এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আন্দোলনকারীদের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এই দাঙ্গার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিয়াকত হোসেন নিজের উদ্যোগেই ময়মনসিংহ ছুটে গিয়েছিলেন। প্রথম অবস্থাতেই এই দাঙ্গাকে রুখবার জন্য তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এই উপলক্ষে পুলিশ তাঁর হাতে লেখা একটি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি হস্তগত করেছিল। সেই পুস্তিকায় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পিছনে যে সমস্ত চক্রান্তকারী মুসলমানের দুষ্ট হস্ত কাজ করে চলেছিল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

মৌলবী লিয়াকত হোসেনের রাজনৈতিক জীবনের শেষ অধ্যায় সম্পর্কে যেটুকু খবর পাওয়া গেছে, এবার তার উল্লেখ করছি। ১৯০৭ সালে ৩রা জুন তারিখে তাঁর লিখিত একটি উর্দু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় তিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, এই অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। লিয়াকত হোসেন ও তাঁর সহকর্মী আবদুল গফুর এই পুস্তিকাটি বিতরণের জন্য বরিশাল গিয়েছিলেন। এই খবর পাবার সাথে সাথেই তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই রাজদ্রোহাত্মক মামলার বিচারে লিয়াকত হোসেনকে দীর্ঘ তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

দেশপ্রেমিক লিয়াকত হোসেনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমরা কোন

কিছুই জানি না। তাঁর এই কর্মময় মহৎ জীবনের পরিণতি কোথায় গিয়ে পেঁৗছেছিল, সে সম্পর্কেও কোন তথ্য, আমাদের জানা নেই। এটা খুবই দুঃখের কথা, লজ্জার কথাও বটে। তবুও আশাকরি, তাঁর এই জীবনাদর্শ প্রদীপ্ত মশালের মত তাঁর উত্তর-সাধকদের পথ দেখিয়ে চলবে।

আবদুর রসুল

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা আবদুর রসুল সে যুগের বাংলার একটি বিশেষ স্মরণীয় নাম। তিনি ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভূমি বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। কিন্তু তাঁর শিক্ষা-জীবন শুরু হয় ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ শহরে। ১৮৮৮ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পরই উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। সেখানে ১৮৯৮ সালে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন।

আবদুর রসুল সবশুদ্ধ নয় বৎসরকাল বিলেতে ছিলেন। সেখানে থাকতেই তিনি সেখানকার এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করতে শুরু করলেন। আইন ব্যবসায় তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যারিস্টার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম কটি বছর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাল। সারা ভারতের জনগণ তখন এক নূতন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। জাগ্রত বাংলা সেদিন সারা ভারতে পথ দেখিয়ে চলেছিল। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের বিধান জারি করার ফলে বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দিল' তার প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলন আবদুর রসুলের মনকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। মতামত ও আচার ব্যবহারে অনেকটা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হলেও তিনি দেশের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এই পথে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি দেশপ্রেমিক নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করে চলেছিলেন। তাঁর নির্ভীক ব্যক্তিত্ব ও সক্রিয় ভূমিকার জন্য তিনি দেখতে দেখতে এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দিনের পর দিন উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল। ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। এই আন্দোলনের রূপ দেখে তারা ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে সমূলে চূর্ণ করার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কুখ্যাত বিভেদ পন্থার সাহায্য নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে তোলার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করে চলল। তাদের এই চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। তাঁদের ইঙ্গিত ও প্ররোচনার ফলে ১৯০৬-০৭ সালে পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলায় পর পর কতগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেল। আবদুর রসুল সেদিন এই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর নির্ভীক চরিত্র ও একনিষ্ঠ দেশসেবার জন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি এবং তাঁর অন্যান্য মুসলিম সহকর্মীরা অক্লান্ত প্রচেষ্টার সাহায্যে এই দাঙ্গার আগুনকে নিভিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দূরদর্শী আবদুর রসুল এই সত্যকে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে উপযুক্ত শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা ছাড়া জাতীয় আন্দোলনকে যথোচিতভাবে শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব নয়। সেজন্য এমন শিক্ষার প্রয়োজন যার সাহায্যে তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং যার মধ্য দিয়ে তারা দেশবাসীর প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করবে। এই নিয়ে শুধু চিন্তা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য তাঁরই উদ্যোগে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' নামক সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। তিনি নিজেই ১৯১৩-১৬ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে কাজ করে গেছেন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আবদুর রসুলের এই ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯০৬ সালে বরিশাল শহরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলন চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকার দমন নীতির সাহায্যে এই সম্মেলনকে ভেঙে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফলে এই সম্মেলন এক রক্তাক্ত রণাঙ্গনে পরিণত হয়ে গেল। সরকারী পুলিশের বর্বর আক্রমণে সেদিন বরিশাল ও বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে আগত প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের রক্তে বরিশাল শহরের রাজপথ লাল হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতে উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠেছিল, আবদুর রসুল ছিলেন এই সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি। সেই সঙ্কট মুহূর্তে সভাপতির ভাষণে তিনি দেশবাসীর কাছে অবিরাম সংগ্রামের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের স্মৃতির মধ্যে দিয়ে আবদুর রসুল-এর স্মৃতি আমাদের মনে জীবন্ত ও ভাস্বর হয়ে আছে।

আবদুর রসুল ১৯১৭ সালে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। দেশ তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছুই আশা করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকে অসময়ে হারাতে হলো।

ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ১৯০৭ সালে ত্রিপুরা জেলার রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তার এবং তার সহকর্মী মুসলমান নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার স্বরূপ বোঝার জন্য তাঁর সভাপতির অভিভাষণ থেকে নিম্নোক্ত অংশগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

"এ কথা সবাই জানেন গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের সকল অঞ্চল থেকেই মুসলমান প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন, সম্মেলনের ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ১০০ জন মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ·· এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা যে ধরনের শাসনাধীনে আছি, যতদিন পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন আমাদের এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারবে না। সেই কারণেই আমরা বর্তমান আমলাতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটিয়ে কংগ্রেসের সম্মেলনে গৃহিত দাবী অনুযায়ী অ-ঔপনিবেশিক ধরনের সরকার গঠনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাব।"

"বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক বিবেচনা-সম্পন্ন, জনসাধারণের-উন্নতিকামী মুসলমান অন্যান্য যে কোন সম্প্রদায়ের লোকের মতই ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য উৎসুক এবং ভারতীয়রা যাতে সরকারের মধ্যে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে সে ব্যাপারে সমান আগ্রহশীল। এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন ভারতীয় মুসলমানরা তাদের দেশ-বাসী হিন্দুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে। হয়তো একদিন হঠাৎ তারা জেগে ওঠে দেখবে যে এত-দিন তারা তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ঐক্য এবং তাদের দেশের অন্যান্য স্থায়ী অধিবাসীদের সহযোগিতার উপর নির্ভর না করে বিদেশী সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে তাদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

"যারা মনে করেন মুসলমানরা রাজনৈতিক আন্দোলনের গণ্ডীর বাইরে শান্তিতে অবস্থান করতে পারবে, তারা স্বচ্ছন্দে একথা ভুলে যান যে কত অভাব অসুবিধা ইতিমধ্যেই আমাদের জীবনে এসে জড়ো হয়েছে এবং দিন-দিনই তাদের মাত্রা বেড়ে চলেছে। শুধুমাত্র জানাশোনার আগ্রহ নিয়েই মানুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। কঠিন বাস্তব সত্য ঘটনা ও জীবনের একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই জাতিসমূহের পক্ষে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। একমাত্র নির্বোধ ছাড়া এমন কথা কি কেউ বলতে পারে যে ভারতের সাতকোটি মুসলমানের জাতীয় ও নৈতিক প্রয়োজন দেশের অবশিষ্ট একুশ কোটি লোকের প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে? হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্মসূচী ক্রমশই পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে, এমন একটা কথা কি আমরা বিশ্বাস করতে পারি?"

১৯০৫ সালে জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রতিবাদে ২৩ শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজারবাজারে দশ হাজার লোকের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন কলকাতার হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা পরস্পর হাতে হাত ধরে সেই সভায় যোগদান করতে গিয়েছিল। এই সভায় বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে আবদুর রসুল বলেছিলেন:

"আমরা হিন্দু মুসলমান একই বাংলা মায়ের সন্তান।" সেদিনকার

সেই সভায় ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণ মুসলমান আলিঙ্গণাবদ্ধ হয়েছিলেন, 'বন্দে মাতারম' ও 'আল্লা হো আকবার' ধ্বনি একই সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

আবদুল হালিম গজনবী

আবদুর রসুলের মুসলমান সহকর্মীদের মধ্যে আবদুল হালিম গজনবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবদুল হালিম গজনবী ১৮৭৬ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আবদুর রসুলের মত তাঁরও সারাজীবনের কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা। কেবলমাত্র জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি তাঁর জন্মভূমি টাঙ্গাইলে কাটিয়েছিলেন।

এক ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ী পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার নাম ছিল আবদুল হাকিম খান গজনবী। তিনি তাঁর ছাত্র জীবনে প্রথমে কলকাতার সিটি কলেজ স্কুলে এবং পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও ব্যবসায়ী জীবন কলকাতা শহরের বুকেই কেটেছিল।

বিশ শতকের শুরু থেকেই তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। এ বিষয়ে তাঁর পথ-প্রদর্শক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া তিনি তখনকার দিনের বাংলাদেশের সমস্ত বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। একজন জাতীয়তাবাদী কর্মী হিসাবে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি ১৯০৫ সালে বারানসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তিনি বাংলাদেশের সরকারী দমন নীতির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন।

১৯০৫-০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে যে দুর্বার প্রতিবাদ আন্দোলন চলেছিল, গজনবী তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণে বিরাট সভা আহুত হয়েছিল, তিনি তাতে উপস্থিত ছিলেন। সেই বছরই ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে সেই একই উদ্দেশ্যে কলকাতায় যে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তিনি তাঁর

মধ্যেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই একই তারিখে উভয় বঙ্গের ঐক্যের প্রতীক স্বরূপ ফেডারেশন হলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়। গজনবী এই অনুষ্ঠানেও যোগদান করেছিলেন।

১৯০৬ সালের ১৪ই, ১৫ই এপ্রিল তারিখে বরিশাল শহরে ঐতিহাসিক প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আবছুর রসুল ছিলেন তার নির্বাচিত সভাপতি। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে তাঁর সভাপতির ভাষণ দিতে পারেননি। আবছুল হালিম গজনবী সম্মেলনে তাঁর সেই অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। সম্মেলন উপলক্ষে বরিশাল শহরের রাজপথে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, সরকারের পুলিশ তার উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার কথা সর্বজন পরিচিতি। গজনবী এই মিছিলেও শরীক হয়েছিলেন। পুলিশ এই সম্মেলনকে পণ্ড করে দেবার জন্য ত্রুটি করেনি, কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

সর্বসাধারণের মধ্যে স্বদেশজাত দ্রব্যাদির প্রচলনের জন্যে গজনবী নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছেন। এই উদ্দেশ্যে বহুবাজার স্ট্রীট ও লালবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থলে তিনি একটি স্বদেশী ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এর পিছনে যতই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকনা কেন শেষ পর্যন্ত এজন্য তাঁকে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই জাতীয় প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন নি।

একথা সত্য, আবছুল হালিম গজনবীর রাজনৈতিক জীবন খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তা হলেও যতদিন তিনি কাজ করেছেন, গভীর নিষ্ঠা নিয়েই কাজ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রামী জীবনের পট-পরিবর্তন ঘটল ১৯০৭ সালে। এই বছর সুরাটে কংগ্রেসের বিখ্যাত বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মারামারির ফলে শেষ পর্যন্ত সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়। এই ঘটনা গজনবীর মনে দারুণ হতাশা ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তার ফলে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নির্দলীয় উদারনীতির সমর্থক হিসাবে কাজ করে গেছেন। তিনি ১৯৫৩ সালে তাঁর জন্মভূমি টাঙ্গাইলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেখ উল হিন্দ মাহমুদ আল হাসান

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা, মাহমুদ আল হাসান নামটি আমাদের দেশের খুব কম লোকের কাছেই পরিচিত, দেশকে যারা ভালবাসেন, এই নামটি তাদের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই পতাকাবাহীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে এই শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাকর্মীরা সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

মাহমুদ আল হাসান ১৮৫১ সালে উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি তাঁর পিতার সাথে মিরাটে ছিলেন। এই মিরাটেই সিপাহীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। ছয় বছর বয়সের বালক মাহমুদ আল হাসান তখন থেকেই এই বিদ্রোহীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এবং বিদ্রোহ ভেঙ্গে পড়ার পর ব্রিটিশ সরকারের নৃশংস অত্যাচারের কথা শুনে এসেছে। এই সমস্ত ঘটনা সেই সময় থেকেই তার মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তিনি সে সব কথা কোনদিনই ভুলে যেতে পারেন নি এবং তাদের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর ভবিষ্যতের চলার পথের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। এ এক বিচিত্র কথা, এই সিপাহী বিদ্রোহের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার তীব্র প্রতিক্রিয়া আলীগড় শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোর বিরোধীতে পরিণত করেছিল। আবার সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মাহমুদ আল হাসান স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান বাণী শুনতে পেয়েছিলেন। সারা ভারতের মুসলমান সমাজের সামনে আলীগড় শিক্ষা-কেন্দ্র ও দেওবন্দ শিক্ষা-কেন্দ্র সম্পূর্ণ দুটি বিপরীত আদর্শ রেখে এগিয়ে চলেছিল। প্রথমটি ব্রিটিশের অনুগ্রহ ও করুণার উপর নির্ভর করে চলাকেই উন্নতির একমাত্র চলার পথ হিসাবে গ্রহণ করেছিল, অপরটি চেয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে

উৎখাত করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে।

পনের বছর বয়সের এই কিশোর দেওবন্দে শিক্ষালাভ করতে এলেন : এখানে তিনি মহম্মদ কাশেম নানাউতোভী ও রশিদ আহমদ গানগোহীর মত বিখ্যাত আলেমদের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই নয় দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রেরণালাভ করেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ সংগ্রামী জীবনের পক্ষে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মাহমুদ আল হাসান এখানকার শিক্ষা শেষ করে ১৮৭৫-৭৬ সালে, এই শিক্ষাকেন্দ্রেই শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশেষে ১৮৮৭-৮৮ সালে তিনি এখানকার অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কৈশোরের দিনগুলি থেকেই তিনি স্বদেশের মুক্তি সাধনকে তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। সেই থেকেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কোনদিন সে আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হননি। এতদিন ধরে যে সংকল্প তিনি মনে মনে পোষণ করে এসেছেন ১৯০৫ সালে তিনি তাকে বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করলেন। সারা জীবন ধরে স্বদেশে ও স্বদেশের বাইরে তিনি এই সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে চলেছিলেন।

দেওবন্দ-এ মূল শিক্ষাকেন্দ্রটির বাইরে দিল্লী, দীনাপুর, আমরোট, করাঞ্জীখেদা এবং চকওয়ালে এর শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের বাইরেও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে 'ইয়াগিস্তান' নামক ছোট একটি রাজ্যেও একটি কর্মকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। রায় বেরিলির সৈয়দ আহমদের অনুবর্তীরাও এই পার্বত্য অঞ্চলে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করেছিলেন। তাদের ভস্মাবশেষ দুটি-একটি স্ফুলিঙ্গ তখন ইয়াগিস্তানে ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। মাহমুদ আল হাসান ও তাঁর অনুবর্তীরা এই ইয়াগিস্তানেই তাদের গোপন কেন্দ্র স্থাপন করলেন।

প্রথম হিজরত সংগ্রামের সময় রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদের অনুবর্তী মৌলবী বেলায়েত আলী ও শওকত আলী এই পার্বত্য অঞ্চলে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী

এই ইয়াগিস্তানে বসেই মাহমুদ আল হাসান স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার সংকল্প করলেন। এই অঞ্চলের অধিবাসী হাজী তুরঙ্গজাইকে এই বাহিনীর সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হল। আশা করা গিয়েছিল প্রধানত উপজাতীয় অঞ্চলের লোকদের নিয়ে এই সৈন্যবাহিনী গঠন করা হবে এবং ভারত থেকে মুজাহীদরা এসে এদের শক্তিবৃদ্ধি করবে। তারা এটাও আশা করেছিলেন যে এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আফগানিস্তানের আমীরও তাদের সাহায্য করবেন।

একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। কেবলমাত্র মুসলমানদের দিয়ে এই সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হবে, এই পরিকল্পনা তাদের ছিল না। ভারত হিন্দু মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসভূমি, কাজেই তারা আশা করে-ছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পাঞ্জাব থেকে ওবায়-তুল্লাহ্ সিন্ধী এবং বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন বিপ্লবী নেতাকে মিলিতভাবে পরামর্শ করার জন্য দেওবন্দে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওবায়েদুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন ধর্মান্তরিত শিখ, কাজেই শিখদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে তার সুযোগ-সুবিধা ছিল। সশস্ত্রবাহিনী গঠনের জন্য যুদ্ধ-নিপুণ শিখদের যোগদান একান্ত প্রয়োজনীয়। মাহমুদ আল হাসানের মনে প্রথম থেকেই এই চিন্তাটা ছিল। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ থেকে পরামর্শ করার জন্য যাদের আনানো হল, তাদের গোপনে অবস্থান করার জন্য দেওবন্দে একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। ওবায়েদুল্লাহ্ সিন্ধী মাহমুদ আল হাসানের প্রাক্তন ছাত্র। দেওবন্দের শিক্ষা-কেন্দ্রেই তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। গুরুর কাছ থেকে ডাক পেয়ে তিনি পাঞ্জাব থেকে চলে এলেন দেওবন্দে। ওবায়েদুল্লাহ্ সিন্ধী এখানে এসেই প্রথমে জমিয়ত-উল-আনসারী, অর্থাৎ যারা এই সংগ্রামে সহযোগিতা করবেন তাদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন। এরপর মাহমুদ আল হাসান তাকে দিল্লীতে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে 'নজরত-উল-শরীফ' নামে ধর্মীয় শিক্ষায়তন স্থাপন করলেন। হাকীম আজমল খান এবং আলীগড়ের ভিকার-উল মূলক, এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর থেকে ওবায়েদুল্লাহ্ সিন্ধীর

সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন তার গুরু মাহমুদ আল হাসানের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

১৯১১ সাল। এই সময়টি ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। এ পর্যন্ত মুসলিম লীগ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলাটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে আসছিল, বৃটিশ সরকারও এখানকার মুসল-মানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ভাব অবলম্বন করে চলেছিল। কিন্তু এবার নানাকারণে সেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেলো। ইতিপূর্বে মুসলমান-দের হতাশ করে বঙ্গভঙ্গের বিধানকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কথা রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল। সবচেয়ে বড় কথা এই সময় ইংল্যাণ্ডসহ ইউরোপের কয়েকটি খ্রীস্টান শক্তি একত্র হয়ে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বলকান যুদ্ধ শুরু করেছিল। এর ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভের ভাব মাথা জাগিয়ে উঠেছিল। তাছাড়া এর কয়েক বছর বাদেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগ দিল।

এই সমস্ত অনুকূল লক্ষণ দেখে মাহমুদ আল হাসান উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, তাঁর মনে হল এইবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করার সময় এসে গেছে। তারা এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে একটি রেশমী কাপড়ের উপরে তা লিপিবদ্ধ করলেন। যারা এই পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে এর একটি করে নকল পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে সাহায্য লাভের আশায় ওবায়েদুল্লাহ্ সিন্ধীকে আফগানিস্তানে পাঠানো হল।

ওবায়েদুল্লাহ্ অনেক আশা নিয়ে আবগানিস্তানে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থকাম হতে হল। আফগানিস্তানের আমীর হাবীব-উল্লাহ্ প্রথমে তাঁকে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরে অব-স্থাটা সুবিধার নয় বুঝে সাহায্য তো করলেনই না, বরং তাদের এই গোপন পরিকল্পনার কথা ভারত সরকারের কাছে ফাঁস করে দিলেন।

যে সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবী বিদেশে অবস্থান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিলেন তাঁদের মনেও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ বিষয়ে

আফগানিস্তান সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে। ইতিপূর্বে এই উদ্দেশ্যে জার্মানী থেকে একটি 'ইন্দো জার্মান' মিশন আফগানিস্তানে এসে গিয়েছিল। এখানকার পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করতে পেরে এই মিশনের মধ্যে যে কজন জার্মান সভ্য ছিল তারা জার্মানিতে ফিরে গিয়েছিলেন। তবে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতউল্লাহ্ মিশনের এই দুজন ভারতীয় সদস্য তখনও সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

আমীর হাবীবউল্লাহর কাছ থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের গোপন পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে বৃটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গেই কর্মতৎপর হয়ে উঠলো। ভাগ্যক্রমে মাহমুদ আল হাসান সময় থাকতে এই খবরটা পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দিল্লীর ডাঃ এম.এ. আনসারীর সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলেন। মক্কায় গিয়েই তিনি হেজাজের তুর্কী গভর্ণর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে গালিব পাশা তাঁকে সমর্থন ও সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। মাহমুদ আল হাসান গালিব পাশার কাছ থেকে এই মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি-পত্র সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। এ চিঠিটি ভারতে পাঠিয়ে দিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তা বিলির ব্যবস্থা করা হল।

এরপর যখন তুর্কীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আনোয়ার পাশা এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি জামাল পাশা সেখানে এলেন, তখন মাহমুদ আল হাসান তাঁকে ভারত সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাছাড়া তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলে যাবেন বলেও মনস্থ করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় ইংরেজদের উসকানি ও সাহায্যে মক্কার শরীফ হোসেন তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করে বসলো। এই বিদ্রোহীরা মাহমুদ আল হাসান, তার শিষ্য হুসেন আহমদ মাদানী এবং তাদের আরও দুজন সঙ্গীকে বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দিল। বৃটিশ সরকার এদের হাতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং তাদের মালটা দ্বীপে আটকে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের অবসান হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানে আটকে ছিলেন। ১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে তাদের মুক্তি দিয়ে মালটা থেকে জাহাজ করে

বোম্বাই শহরে নিয়ে আসা হল। মাহমুদ আল হাসান তখন বার্দ্ধক্যের দশায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেছে, সেই জরা-জীর্ণ। এতকাল বাদে স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করে প্রথম কাজটি কি করলেন তিনি? আর কোথাও নয়, সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন বোম্বাইয়ের খেলাফত কমিটির অফিসে। সেদিন থেকে আর সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি আপনাকে খেলাফত আন্দোলনের কাজে উৎসর্গ করলেন। এতদিন মালটায় কর্মহীন জীবন যাপনের পর একটু সময়ও বিনা কাজে বসে থাকার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাদের প্রতি এই আহ্বান জানালেন, "আপনারা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এই শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে বেড়িয়ে এসে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে যোগদান করুন।" একদিন তিনি এই 'জামিয়া মিলিয়া' প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করেছিলেন।

মাহমুদ আল হাসান ১৯২১ সালে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জমিয়াত-উল-উলেমার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই সম্মেলনে ভারতের বহু উলেমা যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে সমাপ্তি সূচক বক্তৃতায় মাহমুদ আল হাসান তাদের উদ্দেশ করে এই উদাত্ত আহ্বান জানালেন যে তারা যেন নির্ভীক চিত্তে খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করার এবং জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করে তোলার আহ্বান জানালেন। এই ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "দেশের বর্তমান অবস্থা যদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে তাহলে কোনদিনই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না এবং বৈদেশিক আমলাতান্ত্রিক সরকারের বজ্রমুষ্টি দিন দিন দৃঢ়ভাবে চেপে বসতে থাকবে। তার ফলে এখন এদেশে ইসলাম ধর্মের যেটুকু প্রভাব রয়েছে তাও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দেশের হিন্দু মুসলমান এবং সামরিক ঐতিহ্য সম্পন্ন শিখ সম্প্রদায় যদি পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও একতাবদ্ধ জীবনযাপন করে চলে। তাহলে কোন শক্তি, সে যতই শক্তিশালী থাকুক না কেন কিছুতেই চিরদিন

তাদের দমন করে রাখতে পারবে না।

সেদিন সেই সম্মেলনে উপস্থিত ৫০০ উলেমা জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করার এবং সকল রকম সরকারী সামরিক ও বেসামরিক চাকুরী ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে তিনি এক ফতোয়া জারী করলেন।

এই সম্মেলনের কিছুকাল পরে মাহমুদ আল হাসানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে নেতৃত্বের দায়িত্বভার তাঁর প্রিয়তম শিষ্য হোসেন আহমদ মাদানির উপর ন্যস্ত হয়।"

মৌলবী বরকতুল্লাহ্

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, মৌলবী বরক-তুল্লাহ্‌র নাম তারা অবশ্যই শুনেছেন। ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাবুলে স্বাধীন ভারতের যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন তার রাষ্ট্রপতি, আর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মৌলবী বরকতুল্লাহ্।

মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌র বিপ্লবী জীবনের সবটাই কেটেছে ভারতের বাইরে, প্রবাসে এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের চক্ষুশূল, তাই স্বদেশে ফিরে যাবার পথ কোনো দিন তাঁর জন্য উন্মুক্ত হয়নি। অবশেষে একদিন দেশ থেকে বহুদূরে বিদেশের মাটিতে তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিল।

তাঁর জন্মস্থান ছিল ভূপালে। ১৯০১ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য লণ্ডনে গিয়ে শ্যামলী কৃষবর্মা ও রানার সংস্পর্শে আসেন এবং স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি ১৯০৬-১৯০৮ সাল পর্যন্ত আমে-রিকায় তারকনাথ দাশ প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবী, মার্কিনী ভারত-বন্ধু, আইরন ফেল্পস, আইরিশ-আমেরিকান জাতীয়তাবাদীদের পত্রিকা গ্যালিক আমে-রিকান-এর সহ-সম্পাদক জর্জ ফ্রীম্যান প্রমুখের কর্মতৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯০৯ সালে তিনি আমেরিকা থেকে জাপানে যান এবং সেখানে তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এই সময় তিনি 'ইসলামিক ফ্র্যাটারনিটি' নামে এক পত্রিকাও প্রকাশ করে চলেছিলেন। তাঁর এই সমস্ত কার্যকলাপের উপর বৃটিশ সরকারের বিশদ দৃষ্টি পড়েছিল। কিছুদিন বাদে তাদের চাপে জাপান সরকার এই পত্রিকাটির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। তা ছাড়া

তাঁকে অধ্যাপকের পদ থেকে অপসারিত করা হল। অতঃপর ১৯১৪ সালের ২২শে মে তিনি আবার ফিরে এলেন আমেরিকায় এবং সেখানে 'গদর' পার্টির অন্যতম নেতা হিসেবে কাজ করে চললেন।

এই ১৯১৪ সালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠেছিল। এই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই ভারতীয় এবং বিশেষ করে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে চলেছিল। এই যুদ্ধের চাপে বৃটিশ সরকার বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়বে, অতএব বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার পক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ, এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য বিপ্লবীরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিদ্রোহকে সফল করে তুলতে হলে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রতিপক্ষ জার্মান সরকার ও তাদের মধ্যে পরামর্শ ও আলাপ আলোচনা চলছিল। এই আলাপ আলোচনার ফলে তাদের মধ্যে এই সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন হল যে, জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য জুগিয়ে চলবে। এই সন্ধি চুক্তিকে কার্যকর ও সু-পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তা 'বার্লিন কমিটি' নামে সুপরিচিত। মৌলবী বরকতুল্লাহ্ এই কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন।

ভারতের ভিতরে এবং বাইরে এটা অনেকেই আশা করেছিল যে একটি অভ্যুত্থান সৃষ্টির ব্যাপারে ভারতীয় বিপ্লবীরা আফগানিস্তান সরকারের কাছ থেকে অবশ্যই সাহায্য পাবে। এই উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য ১৯১৫ সালে বার্লিন কমিটির পক্ষ থেকে কাবুলে একটি ইন্দো-জার্মান মিশন পাঠানো হয়। ভারত, জার্মান ও তুরস্ক এই তিন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই যুক্ত মিশনটি গঠিত হয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও মৌলবী বরকতুল্লাহ্।

কিন্তু আর্থিক অভাব-অনটনের ফলে এই মিশনটিকে খুবই অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল। এই মিশন ব্যর্থ হয়ে বার্লিনে ফিরে যাবার পর রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ জার্মান সম্রাট কাইজারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তাতে তিনি এই অসুবিধার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে-

ছিলেন। মৌলবী বরকতুল্লাহ্ও সেদিন তাঁর এই অভিযোগ সমর্থন করেছিলেন।

কাবুলে এসে সেখানকার পরিস্থিতি দেখে মিশনের মোহভঙ্গ হয়ে গেল। আফগানিস্তানের আমির হাবিবউল্লাহ্ ইতিপূর্বে তাদের সাহায্য দেবেন বলে কিছুটা ভরসা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তখন তিনি তা থেকে বহুদূর সরে গিয়েছেন। তিনি ইংরেজদের খুশী রাখার জন্য এই পরিকল্পিত বিদ্রোহের কথা ভারত সরকারের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু এতেই নিবৃত্ত হন নি, লাহোর থেকে যে ১৫ জন ছাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হবার জন্য দেশত্যাগ করে কাবুলে চলে এসেছিলেন, তাঁর আদেশে তাদের সবাইকে জেলখানায় আটক করে রাখা হয়েছিল। আর ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী? তাঁকে আটক করে রাখা না হলেও সে সময় তাঁকে নজরবন্দী অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছিল। কিন্তু ইন্দো-জার্মান মিশন কাবুলে এসে পেঁছবার পর আমীরের মনোভাবে কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল। শুধু ভারতীয় বিপ্লবীরাই তো নয়, জার্মান ও তুরস্কের প্রতিনিধিরাও এই মিশনের সভ্য ছিলেন, তা ছাড়া এই মিশনের পিছনে ছিল জার্মান সম্রাট কাইজারের শুভেচ্ছা। এই সমস্ত চিন্তা আমীরের মনকে বিচলিত করে তুলেছিল। ফলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের অনুরোধে সেই ১৫ জন মুসলমান ছাত্রকে সঙ্গে সঙ্গেই জেলখানা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হল। ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীও পুনরায় স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন, তাঁর চলাচল বা কাজকর্ম সম্পর্কে যে সমস্ত বাঁধা ছিল তা দূর হয়ে গেল।

কিন্তু এই ইন্দো-জার্মান মিশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। অবস্থাটা বুঝতে পেরে জার্মান ও তুরস্কের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও মৌলবী বরকতুল্লাহ্কে আরও অনেকদিন কাবুলে থেকে যেতে হয়েছিল। ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাবুলে উপস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে রাষ্ট্রপতি এবং মৌলবী বরকতুল্লাহ্কে প্রধানমন্ত্রী

করে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন। ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এই মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর ১৯১৯ সালে মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌কে আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার পেট্রোগ্রাড শহরে দেখতে পাই। পেট্রোগ্রাড প্রাভদা পত্রিকায় তিনি নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন:

"আমি কমিউনিস্টও নই, সোশ্যালিস্টও নই। বর্তমানে আমার রাজনৈতিক কর্মসূচী হচ্ছে এশিয়া থেকে ইংরেজ বিতাড়নের। এশিয়ার ইউরোপীয় ধনতন্ত্র যার প্রধান প্রতিনিধি হল ইংরেজ—আমি তার ঘোরতর শত্রু। এইখানেই আমার মিল কমিউনিস্টদের সঙ্গে এবং এই দিক থেকে আমরা পরস্পরের আন্তরিক বন্ধু............।"

"১৯১৯ সালের মার্চ মাসে হাবিবউল্লাহ্‌র হত্যাকাণ্ডের পর বৃটিশ-বিরোধী আমানুল্লাহ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন নতুন আমীরের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আমাকে দূতরূপে মস্কোয় পাঠানো হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এর ফলে নতুন আমীর বৃটিশের সঙ্গে সন্ধিপত্র নাকচ করে দিলেন—যার শর্ত ছিল এই যে আফগানিস্তান ইংল্যাণ্ড ছাড়া আর কারো সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।"

মনে হয় এরই সূত্রে বরকতুল্লাহ্ সে সময় লেনিনের কাছে আফগানিস্তানকে সাহায্য দানের প্রস্তাব উত্থাপিত করেছিলেন। সেই সময়ই লেনিনের অনুরোধে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্তানে নবনিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত সুরিৎকে সোভিয়েত-আফগান মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।

পেট্রোগ্রাড প্রাভদায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে মৌলবী বরকতুল্লাহ্ আরও বলেছিলেন, "ভবিষ্যতে ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যাবে এখনই তা বলা কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি জানি সমস্ত জাতির দৃষ্টিতে সোভিয়েত রাশিয়ার পুঁজিপতি-বিরোধী (আর আমাদের কাছে 'পুঁজিপতি' কথাটি বিদেশী, আরো নিখুঁতভাবে বলতে হলে বলা যায় ইংরেজের সমার্থক) সংগ্রাম চালাবার আবেদন আমাদের উপর বিপুল প্রভাব

বিস্তার করেছে। রাশিয়া কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সমস্ত গোপন চুক্তির অস্বীকৃতি এবং যত ছোটই হোক না কেন জাতিমাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা, এই কাজের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া তার চারদিকে এশিয়ার সমস্ত শোষিত জাতি ও পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এমনকি এদের মধ্যে সেই সমস্ত পার্টিও রয়েছে যারা সমাজতন্ত্র থেকে বহুদূরে। তার এই কাজের ফলে সুনির্ধারিত ও নিকটতর হয়েছে এশিয়ার বিপ্লব।

"বলশেভিকদের চিন্তাধারা যাকে আমরা নাম দিয়েছি 'ইশ্ত্রাকিয়া' তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় জন-সাধারণের ভিতরে,····· ইতিমধ্যেই বছর-খানেক ধরে অর্থনৈতিক ধর্মঘট ও প্রকাশ্য অভ্যুত্থান চলছে ভারত-বর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। বাংলাদেশ হল বিপ্লবী চিন্তায় সবচেয়ে অগ্রণী, এক কথায় বলতে গেলে বাংলা হল বিপ্লবের মনন কেন্দ্র। আর সব-থেকে কর্ম-চঞ্চল ভারতীয় প্রদেশ হল পাঞ্জাব যার অবস্থান আফগানিস্তানের সীমানায়।"

মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌র একটি প্রবন্ধ তাসখন্দ থেকে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি তাঁর 'বলশেভিকবাদ ও ইসলামীয় রাজনীতি ক্ষেত্র' নামক পুস্তিকায় রয়েছে। প্রবন্ধটির নাম 'লেনিন ভাইয়ের ডাকে সাড়া দাও'। সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছে :

"··সারা পৃথিবীর ও এশিয়ার জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের রুশ সমাজবাদের মহৎ নীতি হৃদয়ঙ্গম করার এবং গভীরভাবে ও সোৎসাহে তা গ্রহণের আজ সময় এসেছে। এই নতুন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গুণগুলিকে অনুধাবন ও ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে এবং প্রকৃত স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে পররাজ্যগ্রাসী ও অত্যাচারী বৃটিশের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বলশেভিক বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। মুসলমান ভাইসব, বিধাতার এই আহ্বান কান পেতে শোনো, লেনিন ভাই ও রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার মুক্তি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে বাণী তোমাদের কাছে এনেছেন তাতে সাড়া দাও।"

বরকতুল্লাহ্ আফগানিস্তান থেকে বার্লিনে ফিরে গিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেস পার্টি গঠন করেন।

সোভিয়েত-রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান

কমিটি ফর রাশিয়ান ফেমিন রিলিফ' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে তাঁরই উদ্যোগে। তিনি ছিলেন ঐ সংস্থার সভাপতি আর ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার সম্পাদক। ১৯২৭ সালের ১০-১৫ই ফেব্রুয়ারী ব্রাসেলসে যে উপনিবেশিক অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বরকতুল্লাহ্ যোগ দেন সানফ্রানসিস্কোর হিন্দুস্থান গদর পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে। 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' হিন্দুস্থান সেবাদলের প্রতিনিধি স্বরূপ নেহেরুও ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত, মৌলবী বরকতুল্লাহ্ তাঁর প্রিয় দেশবাসীদের মাঝখানে আর ফিরে যাবার সুযোগ পাননি। ১৯২৭ সালে, যাদের স্বাধীনতা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের সংস্পর্শ থেকে বহুদূরে আমেরিকার সানফ্রানসিস্কো শহরে তিনি পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বিপ্লবী জীবনের চির সাথী ও পরম বন্ধু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ।

ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

দেওবন্দ-এর শিক্ষাকেন্দ্র থেকে যাঁরা স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নাম উল্লেখযোগ্য। এক বিচিত্র চরিত্র, দীর্ঘকাল ধরে উল্কার মত জ্বলতে জ্বলতে চলেছেন, কিন্তু নিজে উল্কার মত পুড়ে ছাই হয়ে যাননি। বিপ্লবী ওবায়দুল্লাহ্ দেওবন্দ থেকে যে অগ্নি-মশাল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তা নিয়ে দেশ-দেশান্তরে অক্লান্তভাবে ছুটে বেড়িয়েছেন।

জীবনের কৈশোর থেকে তার বিদ্রোহের শুরু। এ এমন এক বিদ্রোহের ডাক যার প্রেরণায় মানুষ পুরাতনকে ছেড়ে নূতন এবং নূতনকে ছেড়ে নূতনতর লক্ষ্যের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পায় না। ১৮৭১ সালে পাঞ্জাবের শৈল-কোট জেলায় এক সম্ভ্রান্ত শিখ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি ইসলামের উদার বাণীর অমোঘ আহ্বান শুনতে পেলেন।

এই ১৫ বছর বয়সের বালক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আত্মীয়-স্বজন, পরিবার পরিজনদের মায়া ত্যাগ করে পাঞ্জাব ছেড়ে সিন্ধুতে চলে গেলেন, জীবনের এই নূতন অধ্যায়ে পা দিয়ে তিনি ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী নামে পরিচিত হয়ে-ছিলেন। সিন্ধুতে যাওয়ার পর তিনি ইসলামের ধর্মশাস্ত্রে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়লেন।

সে সময় দেওবন্দ-এর শিক্ষাকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নায়ক মাহমুদ আল হাসান সিন্ধুতে শিক্ষকতা করছিলেন। ওবায়দুল্লাহ সেখানে দুই বছর তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর গুরুর সঙ্গে দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করেন। মাহমুদ আল-হাসানের কাছ থেকে তিনি তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। মাহমুদ আল-হাসানের নির্দেশে জমিয়ত আল-আনসার প্রতি-

ষ্ঠানটিকে সংগঠিত করে তুললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের বাহিনী হিসাবে তিনি এই সংগঠনটিকে গড়ে তুলেছিলেন।

তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ত। ফলে তাঁকে নিয়ে দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রকে মাঝে মাঝে একটু অসুবিধায় পড়ে যেতে হত। এই জন্যই তাঁকে দিল্লীতে নূতন প্রতিষ্ঠিত নজরাতুল শরীফ নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্যে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। এই বিদ্যালয়টি আলীগড়ের ভিকারুল মুল্‌ক এবং দেওবন্দ-এর মাহমুদ-আল-হাসানের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছিল। হাকীম আজমল খান, মোক্তার আহমদ আনসারী ও মৌলানা মহম্মদ আলীও এ বিদ্যালয় পরিচালনার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এর দুই বছর বাদে ১৯১৫ সালে মাহমুদ-আল-হাসান তাঁর জীবনের মূল ব্রত স্বাধীনতার সংগ্রামের কাজে নেমে পড়লেন। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংরাজদের বিতাড়িত করতে হবে এইটাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী কাবুলে গিয়ে আফগানিস্তানের আমীর হাবিবউল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আমীর হাবিবউল্লাহ্‌ প্রথম দিকে এ বিষয়ে তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন এবং ওবায়দুল্লাহ্‌কে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলার জন্য পরামর্শ দিলেন। ওবায়দুল্লাহ্‌ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের শাখা সমিতির প্রতিষ্ঠা করলেন। কংগ্রেসের এই কাবুল শাখার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং ওবায়দুল্লাহ, আর সম্পাদক ছিলেন তাঁর ছাত্র জাফর হাসান। দেশবন্ধুও এই অনুমোদন লাভের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। সে সময় একমাত্র কাবুল ছাড়া ভারতের বাইরে কংগ্রেসের আর কোন শাখা সমিতি ছিল না।

কিন্তু আফগানিস্তানের আমীর মুখে যাই বলুন না কেন, ইংরেজদের চটাবার মত সাহস তাঁর ছিল না, তাই যখন কাজের কথা এসে গেল তখন তিনি পিছিয়ে পড়লেন।

ইতিপূর্বে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। ভারতের ভিতরের এবং বাইরের বিপ্লবীরা এই সুযোগে ভারতে একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে তোলার সংকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছিলেন। মাহমুদ আল হাসান,

ওবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধী এবং তাদের অনুবর্তীরা ছিলেন একই পথের পথিক। ওবায়দুল্লাহর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে লাহোরের ১৫ জন মুসলমান ছাত্র এই স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য দেশত্যাগ করে কাবুলে চলে এসেছিলেন।

এই ১৫ জন ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশেরই নাম পাওয়া গেছে, তবে এই বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে ঐ ১৫ জন মুসলমান ছাত্রের মধ্যে নিম্নোক্ত ১০ জনের নাম দেওয়া হয়েছে :

খুশি মুহম্মদ, আবদুল হামিদ, জাফর হাস্‌নান, আল্লাহ্‌ নওয়াজ, আবদুল বারী, মুহম্মদ আবদুল্লাহ্‌, আবদুর রহমান, আবদুর রশীদ, রহমত আলি ও ও কোহাটের আবদুল মজীদ। জেমস ক্যাম্বেল কার, ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর Political Troubles in India : 1907-1917 গ্রন্থে, মোট ১০ জনের নাম দিয়েছেন। আর লিখেছেন যে বাকী ৫-জন আফগানিস্তানেই মারা গিয়েছিলেন। এই দুই তালিকায় সাতটি নাম এক, একজনের নাম মুজফ্‌ফর সাহেব লিখেছেন 'মুহম্মদ আবদুল্লাহ', আর কার সাহেব লিখেছেন 'শেখ আবদুল্লাহ্‌'। মুজফ্‌ফর সাহেবের তালিকার 'আবদুর রহমান' কার সাহেবের তালিকায় অনুপস্থিত। কার সাহেব নূতন নামের মধ্যে আবদুল মালিক, হাস্‌নান খাঁ, সুজাউল্লাহ্‌, আবদুল কাদির, মহম্মদ হাস্‌সান ও ফিদা হুসেনের নাম উল্লেখ করেছেন। এদের নাম, পরিচয়, কার্যকলাপ এবং ভবিষ্যতে এদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল, এসব কথা জানবার জন্য আমরা খুবই উৎসুক। কিন্তু একমাত্র রহমত আলী অর্থাৎ জাকেরীয়া ছাড়া আর কারো সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায়নি, সব কিছুই বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। রহমত আলী জাকেরিয়া তাঁর এই প্রবাস জীবনে বৈপ্লবিক কর্মী হিসাবে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছিলেন। রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

আমীর হাবিবউল্লাহ্‌র কথা এবং কাজে কোনই মিল ছিল না। অবস্থা সঙ্গীণ বুঝে নিজের গা বাঁচাবার জন্য তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা ভারত সরকারের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

তার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গ্রেফতার চলল। মাহমুদ আল হাসান সে সময় দেওবন্দে ভারতের অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন পরামর্শে রত ছিলেন। শেষ মুহূর্তে খবরটা জানতে পেয়ে তিনি সুকৌশলে এই গ্রেফতারের জালের ফাঁক দিয়ে দেশত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলেন এবং মক্কাকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আমীর হাবিবউল্লাহ্‌র আদেশে লাহোর থেকে আগত সেই ১৫ জন মুসলমান ছাত্রকে কারারুদ্ধ করে রাখা হল। ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে জেলে আটক না করলেও তাঁকে নজর-বন্দী অবস্থায় দিন-যাপন করতে হচ্ছিল।

সকলেই আশা করছিল, ভারতীয় বিপ্লবীরা বিদ্রোহ সৃষ্টি করার ব্যাপারে আফগানিস্তানের আমীর হাবিবউল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাহায্য পাবে। সেই উদ্দেশ্যে আমীর হাবিবউল্লাহর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবার জন্য জার্মানীর বার্লিন কমিটির পক্ষ থেকে একটি ইন্দো-জার্মান মিশন পাঠান হয়েছিল। এই মিশনটি জার্মানী, তুরস্ক ও ভারতের বিপ্লবীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল। ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ ও মৌলবী বরকতুল্লাহ্। এই মিশন ১৯১৫ সালের অক্টোবরে কাবুলে এসে পৌঁছেছিল। আমীর হাবিবউল্লাহ্ ইতিপূর্বে ভারতীয় বিপ্লবীদের বিরু-দ্ধাচারণ করলেও এই ইন্দো-জার্মান মিশনের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করতে সাহস পেলেন না। তার কারণ এই মিশনের সঙ্গে জার্মানী ও তুরস্কের প্রতিনিধিরাও ছিলেন, এবং এই মিশনের পিছনে ছিল জার্মানীর সম্রাট কাইজার ও তুরস্কের ধর্মীয় নেতাদের শুভেচ্ছা। ফলে লাহোরের সেই ১৫ জন মুসলমান ছাত্র কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করলেন। ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীও স্বাধীনভাবে চলাচল করা ও কাজকর্ম করার সুযোগ পেলেন। কিন্তু ইন্দো-জার্মান মিশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা ব্যর্থ হল।

এই পরিস্থিতিতে, ইন্দো-জার্মান মিশনের অন্যান্য সভ্যেরা নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও মৌলবী বরকতুল্লাহ কাবুলে থেকে গেলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লাহ্ ও ওবায়দুল্লাহ্, এই তিনজনের উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাবুলে স্বাধীন ভারতের এক অস্থায়ী সরকার

গঠিত হল। এই অস্থায়ী সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য-দানের জন্য রাশিয়া, তুরস্ক ও জাপানে তাদের প্রতিনিধি পাঠালেন। এই সরকারের অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্যও প্রস্তুতি চালানো হয়েছিল।·· স্থির করা হয়েছিল, যে সমস্ত পাঞ্জাবী যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য কাবুলে পালিয়ে এসেছে, তাদের এই সৈন্যবাহিনীর অফিসার পদে নিয়োগ করা হবে।

তা ছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাহায্য লাভের জন্য 'হিজব আল্লা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করান হয়েছিল। তার সদর দফতর ছিল মদিনায়। সে সময়ে ওবায়দুল্লাহর গুরু বিপ্লবী মাহমুদ আল হাসান গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য দেওবন্দ ছেড়ে আরব অঞ্চলে চলে এসেছেন। 'হিজব আল্লা' নামক এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। কাবুল, তেহেরান এবং কন্সট্যানটিনোপালে এই প্রতিষ্ঠানের তিনটি শাখা স্থাপন করা হয়েছিল। বিদ্রোহীরা এই পরিকল্পনা নিয়েছিল যে, তারা প্রথমে ভারত সরকারের অস্ত্রাগারগুলি লুণ্ঠন করবে, কিন্তু ফিরোজপুরে তাদের সেই প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এর পরে 'রেশমী চিঠি', নামে বর্ণিত রেশমী কাপড়ের উপর লিখিত স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের স্বাক্ষরযুক্ত কতগুলি চিঠি বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পাঠানো হয়। এই চিঠিগুলিতে তাদের বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী লিপিবদ্ধ করা ছিল।

আমীর হাবিবউল্লাহ্ খান-এর হত্যার পরে যখন আমানউল্লা আমীরের আসন গ্রহণ করলেন তখন ভারত থেকে আগত স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হোল। আমীর আমানউল্লা এ বিষয়ে একটু আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে মাহমুদ আল হাসান যে কাজ শুরু করেছেন তিনি তা সমাপ্ত করার কাজে সাহায্য করবেন।

কিন্তু আফগান যুদ্ধের পর কাবুলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হোল, তাতে ওবায়দুল্লাহ আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কাবুল ত্যাগ করার পর থেকে তিনি তারপরে মৌলবী মাহমুদ আল হাসান ও মহম্মদ মিঞা

আনসারীর সহযোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। এই সময়ে তার ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় সুপরিচিত রেশমী রুমালের মামলা।

অন্যদিকে ওবায়দুল্লাহ্ ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাবুল কমিটির সভাপতি ও সম্ভবত প্রতিষ্ঠাতাও। ভারতের বাইরে তখন আর কোথাও অমন কংগ্রেস কমিটি ছিল কিনা, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের কংগ্রেসের যোগাযোগই বা কতটা ছিল তা জানা যায় না। তবে জওহরলালের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে কাবুল কংগ্রেস কমিটির অনুমোদনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু আর জওহরলাল নিজেও এই অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন।

ওবায়দুল্লাহ্ তারপর সোভিয়েত দেশ থেকে তুরকিতে গিয়ে বেশ কয়েক-বছর কাটান। ১৯২৫ সালে সেখানে ইস্তাম্বুল থেকে তিনি স্বাধীন ভারতের একটি খসড়া গঠনতন্ত্রের ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ৫৬ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত গঠনতন্ত্রের নাম **The Constitution of the Federated Republics of India,** পুস্তিকার শেষে যথাক্রমে কাবুল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে ওবায়দুল্লাহ্ ও জাফর হাসানের স্বাক্ষর আছে। এই পুস্তিকাটির প্রকাশের তারিখ দেওয়া আছে 'হিন্দুস্তান মঞ্জিল' ইস্তাম্বুল, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সাল—বোধ হয় এটা মূল সংস্করণ প্রকাশের তারিখ।

এই পুস্তিকার মূল অংশটির নাম 'মহাভারত স্বর্গরাজ্য পার্টি ও তার কর্মসূচী'। এখানে মহাভারত শব্দে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। আর স্বর্গরাজ্য শব্দটি সচেতনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে 'স্বরাজ্য' শব্দের বদলে। ভারতবর্ষ সকল অধিবাসীদের আপন দেশ, ওবায়দুল্লাহ্ শুধু এই কথাটি বলে ক্ষান্ত হননি। তিনি তার এই গঠনতন্ত্রের কর্মনীতির একটি ধারায় লিখেছেন,—আমরা চাই ভারত-বর্ষের মাটি থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থার পত্তন করব যাতে সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির অর্থাৎ সমাজের

অধিকাংশেরই কল্যাণ সুরক্ষিত হয়, এবং সেই ব্যবস্থা সেই শ্রেণীগুলির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

"আমি কখনো কমিউনিস্ট বিপ্লবকে আমার মৌল বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করিনি। আমার মত মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না, কিন্তু এমন এক কর্মনীতি আমি তৈরী করেছি যা সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট কারো কাছেই আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হবে না।"

১৯২৪ সালে ওবায়দুল্লাহর ঐ শ্রমজীবীদের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা নিশ্চয়ই অসাধারণ ঘটনা এবং তার মধ্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাবও প্রত্যক্ষ। জওহরলালকেও একথা মানতে হয়েছিল : "তিনি এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রের বা 'ভারতবর্ষের যুক্তপ্রজাতন্ত্রের' পরিকল্পনা করেন যেটি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের বেশ একটি নিপুণ প্রয়াস।"

১৯২৬ সালে ইটালীতে ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের পর জওহরলাল ঐ কথা লিখেছিলেন।

এই গঠনতন্ত্রের ভূমিকায় নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে :

"আমরা মস্কোয় গিয়ে রুশ বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাই। বিপ্লবকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য আমাদের কমিটির সদস্যরা রুশ ভাষা আয়ত্ত করেন। আমরা বিশিষ্ট রুশ নেতাদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের কমিটির সদস্যা ইউরোপীয় দেশগুলিতে রুশ বিপ্লবের ফলাফল দেখবার জন্য সেই সমস্ত জায়গায় যায়। ভারতবর্ষ ফরাসী বিপ্লব থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারেনি। আমরা চাইনা যে আমাদের দেশ অন্ধ হয়ে থাকুক, সারা পৃথিবীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা অর্থাৎ রুশ বিপ্লব সম্পর্কে আমরা যদি উদাসীন হয়ে থাকি, তাহলে তার ফলে আমরা আমাদের নিজেদের মৃত্যু পরোয়ানাতেই স্বাক্ষর করব।"

ওবায়দুল্লাহ রুশ বিপ্লব ও তার ফলাফল দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। জাফর ইমাম লিখেছেন যে 'জিজ্ন নাৎসিওনাল নোস্তেই' নামক সোভিয়েত পত্রিকায় ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, এটা ১৯১৯ সালের ঘটনা। ঐ সাক্ষাৎকারে ওবায়দুল্লাহ তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে

মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উদার সহায়তার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তাছাড়া ভারত থেকে বৃটিশ বিতাড়নের কাজে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে সাহায্য কামনা করেছিলেন।

ওবায়দুল্লাহ ১৯২৬ সালে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে যাত্রা করে ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ড হয়ে হেজাজে গিয়ে পেঁছিলেন। তিনি তার পরবর্তী বারো বছর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে আরব অঞ্চলে কাটিয়েছেন। এই বারো বছর তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন, যথেষ্ট চিন্তা করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব এক মতধারা সৃষ্টি করে তুলেছিলেন।

১৯৩৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে এলেন। তিনি তাঁর এই বিচিত্র জীবনে নানা দেশ পরিভ্রমণ করে, দীর্ঘকাল ধরে অধ্যয়ন এবং অনেক কিছু দেখেশুনে প্রাচীন ও আধুনিক জীবনধারা সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি। জীবনের বহুমুখী বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার পারস্পরিক সংঘাত তাঁর মনের মধ্যে নানারকম ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে তুলছিল। দেশে ফিরে এসে তিনি তাঁর নূতন আদর্শবাদের প্রচার-কার্য শুরু করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এর মধ্য দিয়েই ভারতের মুসলমান তথা সমগ্র ভারতীয়রা ঐক্য, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে তাঁর এই আদর্শের প্রচার করে গিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর দেশে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ তাঁর সাম্প্রদায়িক প্রচারের দ্বারা মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের পথে পরিচালিত করে নিয়ে চলেছিল। জাতীয়তাবাদী উলেমা সম্প্রদায় তাদের প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেও সাফল্য লাভ করতে পারছিলেন না। তাঁর প্রচারিত আদর্শও সেদিন মুসলমানদের মনে তেমন কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

ওবায়দুল্লাহ গভীর ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্মই ছিল তাঁর প্রাণ। কিন্তু তাঁর এই ধর্মবিশ্বাস সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিল। তিনি একথা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শুধু ইসলামই নয়, বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ধর্ম সত্যের

দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের বিধান চিরকালীন বা অপরিবর্তনীয় নয়, কাল, পরিবেশ ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় বিধানের পরিবর্তন সাধনও প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

ওবায়দুল্লাহ তাঁর গুরু মাহমুদ আল হাসানের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গুরুর মতই তিনিও সশস্ত্র সংগ্রামকে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শকে গ্রহণ করে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। অবশ্য তিনি অহিংসার আদর্শকে নীতি হিসাবে নয়, অন্যতম কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর এই আদর্শকে অনুসরণ করে চলেছিলেন।

তিনি এ কথা বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেসই হচ্ছে সমস্ত ভারতীয়দের সত্যিকারের প্রতিনিধি এবং সেই হিসাবে এ দেশের সকলেরই কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণ করে চলা উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় অভিমত পোষণ করতেন যে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষভাবে রাজনীতিক অর্থনৈতিক ব্যাপারের মধ্যেই তার কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এবং তার কাজের মধ্যে যাতে ধর্মীয় ছাপ না পড়ে, সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা উচিত। গান্ধীজীর প্রভাবের ফলে কংগ্রেস যে ক্রমশই নানাভাবে ধর্মীয় ভাবের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এই সত্যটা তাঁর মনকে অত্যন্ত পীড়া দিত। তাঁর মনে হচ্ছিল যে এরই ফলে সাধারণ মুসলমানেরা কংগ্রেসের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মওলানা হোসেন আহম্মদ মাদানি এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারতবর্ষের এই তিনজন বিশিষ্ট মুসলমান ধর্মনেতা রাজনীতি আর ধর্মকে এক সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই প্রশ্নে তারা তিলমাত্র রফা করে চলতে রাজী ছিলেন না। তাদের এই অভিমত তারা সব-সময় স্পষ্টভাবে ও দৃঢ়ভাবেই প্রকাশ করে গেছেন। ধর্মের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন

কাজেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নিশ্চিন্তমনে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে অনুসরণ করে চলতে পারে। কিন্তু সমগ্র দেশ এক সম্প্রদায়, একভাষা, এক সংস্কৃতি এবং একই জীবনধারার অনুবর্তী হয়ে চলবে তিনি এই ধরনের চিন্তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্বাধীন ভারতের গঠন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল এই যে, এ দেশ কতগুলি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ও সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি সংযুক্ত ফেডারেশন হিসাবে গঠিত হওয়া উচিত। তিনি বলতেন, সীমা, লোকসংখ্যা, ভাষাগত বিভিন্নতা এবং নানা বর্ণের লোকের বাসস্থান হিসাবে এদেশ ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু তাই বলে ইউরোপ মহাদেশের মত ভারতকেও খণ্ড খণ্ড করে কতগুলি পৃথক বিদেশী রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হউক, এই মত তিনি কিছুতেই সমর্থন করতেন না।

দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার মতামতের মধ্যে গভীর বাস্তবতা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছেন যে, ভারতের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে এদেশকে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। প্রজাতান্ত্রিক সরকার, গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা এবং শিল্প এর সবগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি, এগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে গেলে একেবারেই নির্বোধের মত কাজ করা হবে।

ভারতের সমাজ ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক ও নিশ্চল। এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবী ওবায়দুল্লাহ তাঁর জীবন-সায়াহ্নে বিন্দুমাত্র সুখের সন্ধান পাননি। তার দেশ তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তাঁর চোখের সামনে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতার আদর্শ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। এই বেদনাভরা হতাশাময় পরিবেশে ১৯৪৪ সালে তাঁর জীবনের অবসান ঘটল।

রহমত আলী জাকারিয়া

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৪-১৫ সাল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পূর্ণ স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা শেষপর্যন্ত সার্থকতায় পরিণত না হলেও সেই বিপুল কর্মোদ্যোগ ও আত্মত্যাগের জন্য আমরা গর্ববোধ করে থাকি। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা এই তিন মহাদেশে বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবের সৈনিকরা এই অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিল। সে এক উদ্দীপনাপূর্ণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ।

এই পরিকল্পিত বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলির মধ্যে দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল অন্যতম। দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বয়ং মাহমুদ আল হাসান এই কেন্দ্রের নেতৃত্ব করছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপ্লবীরা দেওবন্দের গোপন কেন্দ্রে এসে বিপ্লবের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতেন। মাহমুদ আল হাসানের আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর উপযুক্ত শিষ্য ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী সরকারের শ্যেণ দৃষ্টি এড়িয়ে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অদ্ভুত কর্ম-তৎপরতার সঙ্গে গোপন সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়কার ঘটনাবলী ও বিপ্লবী-চরিত্রগুলি অধিকাংশই বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে গেছে। তা হলেও এই সমস্ত প্রদেশের তরুণদের মধ্যে এই উপলক্ষে যে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

লাহোরের যে ১৫ জন মুসলমান ছাত্র এই সংগ্রামে যোগ দেয়ার জন্য দেশত্যাগ করে আফগানিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, বিভিন্ন সূত্রে, বিভিন্ন উপলক্ষে, তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীই তাদের মনে এই সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই ১৫ জন ছাত্রের

মধ্যে কেবল কয়েকজনের নাম জানা গেছে।

১৯১৯ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রহমত করিম এলাহি জাকারিয়া নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাকারিয়া বা রহমত আলী নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। আবার ভারত সরকারের কাগজ-পত্রেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় জাকারিয়া বা রহমত আলী নামেই।

এই ১৫ জন ছাত্র যখন আফগানিস্তান যায় তখন সেখানকার আমীর ছিলেন হাবিবউল্লা। আমীর হাবিবউল্লা প্রথমদিকে ভারতীয় বিপ্লবী দের প্রতি সহানুভুতির ভাব দেখালেও কার্যকালে বেঁকে বসলেন। বৃটিশ সরকারকে চটাবার মত শক্তি বা সাহস কোনটাই তাঁর ছিল না। ফলে এই ১৫ জন ছাত্র কাবুলে এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জেলখানায় আটক করে রাখার ব্যবস্থা করা হল। ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী এর বেশ কিছুকাল আগেই কাবুলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁকে জেলে আটক না করা হলেও নজরবন্দী অবস্থায় তাঁর দিন-যাপন করতে হচ্ছিল। ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে বালিন থেকে ইন্দো-জার্মান মিশন কাবুলে এসে পৌঁছবার পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। এই ইন্দো-জার্মান মিশন জার্মানীর সম্রাট কাইজার এবং তুরস্কের ধর্মীয় নেতাদের শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে এসেছিল। সেই কারণেই আমির হাবিবউল্লা এই মিশনের অমর্য্যাদা করাটা যুক্তি-যুক্ত মনে করলেন না। এই মিশনের ভারতীয় সভ্য রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের অনুরোধে সেই কারারুদ্ধ ১৫ জন মুসলমান ছাত্র শুধু যে মুক্তি পেলেন তাই নয়, তাদের নাকি রাজ-অতিথির মর্য্যাদাও দেওয়া হয়েছিল। ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীও স্বাধীন-ভাবে চলা ফেরা ও কাজকর্ম করার সুযোগ লাভ করলেন।

কিন্তু এই ১৫ জন ছাত্র অতঃপর কোথায় গেলেন, কি করলেন, তাদের জীবনের কি পরিণতিই বা ঘটল একমাত্র রহমত আলী জাকারিয়া ছাড়া, আর কারো সম্পর্কে কোন কথাই জানতে পারা যায়নি।

জাকারিয়ার জন্ম ১৮৯৪ সালে, তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এটা পরিষ্কার-ভাবেই জানা গেছে যে তিনি কয়েক বছর বাদে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে কমিউনিজমের আদর্শকে গ্রহণ করেন। তিনি তার নবলব্ধ

মতাদর্শের টানে কি করে ও ঠিক কবে সোভিয়েত্ ইউনিয়নে পৌঁছেছিলেন তা জানা যায়নি এখনো। তবে এটা জানা গেছে যে, তিনি ১৯১৯ সালের ৯ই জুন তাসখন্দে তুর্কিস্থান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা করেছিলেন আর বক্তৃতার শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ তাকে অভিনন্দিত করেছিল 'ভারত দীর্ঘজীবী হোক' ধ্বনি তুলে। কিন্তু মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিত **Lenin Through the Eyes of the World** সংকলনে প্রকাশিত তাঁর একটি লেনিন বিষয়ক পাদটিকা থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৯২০ সালেই কমিউনিস্টদলে যোগ দিয়েছিলেন।

তারপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে তিনি ইরান প্রভৃতি নানা দেশে ঘুরেছেন। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যবিদ্যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন। উর্দু ভাষায় ভারতবর্ষের কৃষকদের সম্পর্কে তাঁর বহু লেখাও নাকি প্রকাশিত হয়েছিল।

লেনিন সম্পর্কে লিখিত তাঁর একটি রচনায় এই ধরনের কথা ছিল ঃ "এ কথা বলা চলে যে, লেনিনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এ সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করতেন। এইভাবেই তারা বিপ্লবের সমৃদ্ধতম ভাণ্ডার থেকে তাঁদের রসদ সংগ্রহ করতেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে লেনিনের যে ছবিটি আঁকা ছিল, তাঁরা এইভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন—'লেনিন গরীব মানুষের পক্ষে, লেনিন চান সকলেই সুখী হোক।"

১৯২৪ সালে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল মস্কোর 'লেনিন প্রসঙ্গে প্রাচ্য প্রতীচ্যের রাজনীতিবিদ ও লেখকবৃন্দ' নামক সংকলনে।

জাকারিয়া সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালের শেষদিক নাগাদ বার্লিন যান। কারণ ভারত সরকার ঐ সময় জার্মানীর যেসব ভারতীয় বিপ্লবীদের বহিষ্কারের প্রশ্ন নিয়ে জার্মান সম্রাটের সঙ্গে চিঠি-পত্র লেখালেখি করছিলেন, তাদের তালিকায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চম্পক রমন পিল্লাই, প্রতিবাদী আচার্য ও মহম্মদ আলীর নামের সঙ্গে দেখা যায় তাঁরও নাম। পরের চিঠিপত্রে তাঁর নামের আর উল্লেখ

না থাকায় অনুমান করা চলে যে, হয়ত পরে তিনি অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন বার্লিন ছেড়ে।

ভারতের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা গোপেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানা গেছে যে, বিখ্যাত ইন্টারন্যাশন্যাল গানের জাকারিয়াই নাকি উর্দু তর্জমা করেছিলেন। তার শেষ ক'লাইন হচ্ছে—

ইয়ে জঙ্গ হামারি আখরি
ইস পর হ্যায় ফয়সলা।
সারে জাঁহা কি মজলুঁমো
উঠো কি বক্ত আয়া।

মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেব তার পূর্বোল্লিখিত বইয়ে লিখেছেন জাকারিয়া নাকি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পান, মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের হিন্দু মুসলিম সমস্যা নিয়ে নিবন্ধ পেশ করে। কিন্তু জাকারিয়া এখন জীবিত আছেন কিনা জানা যায়না। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের। তখন তার খুবই দুঃস্থ অবস্থা। মুজফ্‌ফর সাহেব লিখেছেন, ফ্যাসিস্ট অধিকৃত ফরাসী দেশে ডক্টর রহমত আলী কি করছিলেন কোথায় ছিলেন তার কোন খবর আমি জানি নে। তিনি ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন কিনা তাও আমরা জানিনে। (আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি)।

ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিকের Central Asia in Modern Times গ্রন্থের পাদটিকা থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৭ সালেও জাকারিয়া জীবিত ছিলেন এবং বাস করতেন প্যারিসে।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন, তাদের প্রথম সারির মধ্যে মওলানা আবুল কালাম আজাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই নামটি সবচেয়ে সুপরিচিত। মওলানা আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে যে কথাগুলি লিখে গেছেন, তা থেকেই আমরা ভারতের এই প্রতিভাশালী, সদা-সক্রিয়, স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়চিত্ত চরিত্রটির পরিচয় পেয়েছি।

মওলানা আজাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন বাবরের ভারত-অভিযানের সময় হিরাট থেকে এদেশে এসেছিলেন। মোগল রাজত্বের যুগে এই বংশের বহু কৃতী পুরুষ ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং সরকারী প্রশাসন কার্যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এসেছেন। মওলানা আজাদের পিতামহের যখন মৃত্যু হয় মওলানা আজাদের পিতা মওলানা খাইরুদ্দিন তখন নিতান্ত শিশু। সেই সময় থেকে তিনি তাঁর মাতামহ মওলানা মুনাওয়ারুদ্দিনের গৃহে প্রতিপালিত হয়ে আসছিলেন।

মওলানা মুনাওয়ারুদ্দিন দেশত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে বসবাস করবেন বলে সংকল্প করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যখন ভুপালে গিয়ে পৌঁছেছেন, ঠিক সেই সময় ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে তখনকার মত যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। কিন্তু মক্কায় জিয়ারত করবার ও মক্কাবাসী হবার এই সংকল্প পূর্ণ করবার সুযোগ তিনি পাননি। বিদ্রোহ শুরু হবার দু'বছর বাদে তিনি বোম্বাইতে গিয়েছিলেন, সেইখানেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটল।

মওলানা আজাদের পিতা মওলানা খাইরুদ্দিনের বয়স তখন মাত্র ২৫।

সেই সময়েই তিনি তাঁর মাতামহের সংকল্পিত পন্থা অনুসরণ করে দেশ ছেড়ে মক্কায় চলে গেলেন এবং সেইখানে বাড়ীঘর তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি মদিনার বিখ্যাত আলেম শেখ মহম্মদ জাহের ওয়াত্রি-র মেয়েকে বিয়ে করেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই আরব কন্যার একমাত্র সন্তান। ভারত মওলানা আজাদের জন্মভূমি নয়। কিন্তু তাহলেও এই দেশই তাঁর স্বদেশ, এই দেশই তাঁর কর্মভূমি এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই দেশ এবং এই দেশের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন।

মওলানা আজাদের মাতামহ শেখ মহম্মদ জাহের ওয়াত্রি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য সমগ্র আরব জগতে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা মওলানা খাইরুদ্দিনও তাঁর পরবর্তী জীবনে আলেম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর আরবী ভাষায় লিখিত দশখণ্ডের গ্রন্থটি মিশরে প্রকাশিত হবার পর তাঁর খ্যাতিও সারা ইসলামী জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দুটি একটি ঘটনা কিভাবে মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, মওলানা আজাদের জীবনে আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। ঘটনাগুলি যেভাবে এগিয়ে চলেছিল, তাতে ভারত যে একদিন মওলানা আজাদের স্বদেশ ও কর্মভূমিতে পরিণত হবে এমন একটা সম্ভাবনার কথা কারও মনেই জাগতে পারত না। কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা তাঁর জীবনধারার গতি সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিল। একটি দুর্ঘটনার ফলে পা ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁর পিতা মওলানা খাইরুদ্দিন অচল হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার দিনে আরব জগতে প্রচলিত চিকিৎসার সাহায্যে একে সারিয়ে তোলার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা ছিল না। সেই সময় অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে কলিকাতার শল্য-চিকিৎসকদের খুবই নাম-ডাক। খাইরুদ্দিন চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাওয়া মনস্থ করলেন। মানুষের জীবন ও ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি। খাইরুদ্দিন সপরিবারে কলিকাতায় এলেন। এখানকার চিকিৎসার ফলে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন, কিন্তু আরব ভূমিতে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। কলিকাতার গুণমুগ্ধ ভক্তদের একান্ত অনুরোধে তাঁকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে এখানে থেকে যেতে হল।

এর ফলে মওলানা আজাদ তাঁর শৈশবকাল থেকে এখানকার জল-হাওয়ায় এবং এখানকার সামাজিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠলেন। পরবর্তীকালে সারা ভারত তাঁর কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু একথা আমরা গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করি যে, তিনি শুধু ভারতীয় নন, বাঙালীও বটে। মওলানা আজাদ ১৮৮৮ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯০ সালে তাঁদের স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসতে হল। তখন তিনি মাত্র দুই বছরের শিশু।

মওলানা খাইরুদ্দিন ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মতামতের দিক দিয়ে প্রাচীনপন্থী ছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। কাজেই মওলানা আজাদকে আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। তখনকার দিনের ভারতের মুসলমান ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্য যে রীতি প্রচলিত ছিল, মওলানা আজাদকেও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হল। মুসলমান ছেলেদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল মোটামুটি এই, প্রথমেই তাদের ফারসি এবং আরবী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। আরবী ভাষায় কিছুটা ব্যুৎপত্তি লাভ করলে পর তাদের আরবীয় মাধ্যমে প্রাচীন আরব জগতের দর্শন, জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র ও বীজগণিত সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হত। অবশ্য ধর্মীয় শিক্ষা এই পাঠ্যসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। সেটা ছিল সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

তাঁর পিতা তখনকার দিনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে কোন মাদ্রাসায় পাঠান নি। তখনকার দিনে মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলিকাতার মাদ্রাসার খ্যাতি ছিল বটে, কিন্তু এখানকার মাদ্রাসাগুলির মান সম্পর্কে তিনি ভাল ধারণা পোষণ করতেন না। সেই শিশু বয়সেই তাঁর ছেলের প্রতিভার স্ফুরণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষাদানের দায়িত্বটা তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নিয়েছিলেন। পরে তাঁকে সুশিক্ষিত করে তুলবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিদের গৃহ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

তখনকার দিনে ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা

কুড়ি থেকে পঁচিশ বৎসর বয়সে তাদের শিক্ষাসূচী সমাপ্ত করতে পারত। সেই সময়ের মধ্যেই তাদের অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হত। মওলানা আজাদ মাত্র ষোলো বছর বয়সে যোগ্যতার সঙ্গে এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গণ্ডি পার হয়ে এলেন। তাঁর যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য তাঁর পিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পনের জন তরুণ শিক্ষার্থীকে বাছাই করে দিয়েছিলেন।

এই সময় মওলানা আজাদ স্যার সৈয়দ আহমদের লেখার সংস্পর্শে আসেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সপক্ষে স্যার সৈয়দ আহমদের মতামত তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এই সত্যটা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে শিক্ষা লাভ না করলে এ যুগে সত্যিকারের শিক্ষিত মন গড়ে উঠা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই বিষয়ে তাঁর পিতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। চিন্তায় ও আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান, বিশেষ করে ওয়াহবী সম্প্রদায়ের মতামতের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র অসহিষ্ণুতা ও বিরূপ মনোভাব মওলানা আজাদের প্রথম তারুণ্যের গ্রহণশীল মনকে গভীরভাবে আঘাত করত। পিতা পুত্রের কারো পক্ষেই পরস্পরের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান কাটিয়ে উঠা কোনদিনই সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ পিতার এই গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার প্রতিক্রিয়া তাঁর তাজা ও সৃজনশীল মনকে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে ঠেলে দিয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কাজে নেমে গেলেন। সত্য কথা বলতে কি কারো সাহায্য ছাড়া একমাত্র নিজের উদ্যোগে তিনি ইংরাজী ভাষা শিখতে শুরু করলেন। মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ জাফ্রি-র সাহায্যে তিনি শুধু ইংরাজী অক্ষর জ্ঞানটুকু লাভ করে-ছিলেন। পরে ইংরাজী ভাষায় তিনি যেটুকু অধিকার লাভ করেছিলেন সেজন্য এই ষোল বছরের ছেলেটিকে একমাত্র নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। তখনকার দিনের সুপ্রচলিত প্যারীচাঁদ সরকারের 'ফার্স্ট বুক' দিয়ে তাঁর ইংরাজী শেখা শুরু হল। তারপর ইংরাজী ভাষার এই জ্ঞানটুকুকে পুঁজি করে এই দুঃসাহসী ছেলে ইংরাজী ভাষায় লিখিত বাইবেল

অধ্যয়নে মনোনিবেশ করল। এই বাইবেল অধ্যয়নের ব্যাপারে তিনি নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ফরাসী, উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত তিনটি বাইবেলকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইংরাজী বাইবেলকে আয়ত্ব করে চলেছিলেন। এছাড়া তিনি ইংরাজী অভিধানের সাহায্য নিয়ে ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করতেন। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের উদ্ভাবিত পন্থায় ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভের কাজে এগিয়ে চলছিলেন।

তাঁদের এই ধর্মান্ধ ও গোড়া পরিবারের লোকেরা ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের তিলমাত্র বিচ্যুতি সহ্য করতে পারতো না। দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অন্ধকারে ঘেরা এই অচলায়তনের মধ্যে মওলানা আজাদের তাজা আলোক-পিপাসু মন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সংস্পর্শলাভের জন্য খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত ছটফট করে মরছিল। শেষ পর্যন্ত এই পাখী বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেই খাঁচার বেড়া ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। সেই থেকে চির বিদ্রোহী এই তরুণ মন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা সামনে নিয়ে এগিয়ে চলে এসেছে।

যৌবনে পদার্পণ করার আগেই নানা রকম সন্দেহ সংশয়ের বীজ তাঁর মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল। সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি তাঁর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল তা হচ্ছে এই যে, মুসলমান সম্প্রদায়গুলির পরস্পরের মধ্যে এত মতবিরুদ্ধতা কেন? অথচ এরা সবাই বলছে যে তারা একই উৎস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। এরা একে অপরকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী বলে প্রমাণ ও প্রচার করতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। তাছাড়া শুধু মুসলমান ধর্মের কথাই নয়, বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য ও লক্ষ্য যদি এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যেই বা এত পরস্পর-বিরোধিতা কেন? পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম নিজেকে একমাত্র অভ্রান্ত ও সত্যপথের পথিক বলে প্রচার করে চলেছে। এই সমস্ত প্রশ্ন ও সংশয় সেই কিশোরের জিজ্ঞাসু মনকে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছিল যে, একটা বিশেষ সময় তাঁর মনে মূলগতভাবে ধর্মের ব্যাপারে বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছিল।

এই সন্দেহ সংশয়ের ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে ২-৩টা বছর কেটে গেল।

তাঁর এই সময়টা কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাটছিল। এবং এই বিরামহীন সংগ্রামের ফলে পরিবার, পরিবেশ, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারের যে শৃঙ্খলগুলি তাঁর জাগরণ-উন্মুখ মনকে বেঁধে রেখেছিল সেইগুলি একের পর এক খসে পড়তে লাগল। অবশেষে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে বেড়িয়ে এলেন তিনি। তিনি নিজের কাছে নিজেই ঘোষণা করলেন,—এখন থেকে আমি মুক্ত, সর্বতোভাবে মুক্ত; আমার চলার পথ আমাকে নিজেকেই পদে পদে আবিষ্কার করে চলতে হবে। এই সময় থেকে তিনি 'আজাদ' অর্থাৎ 'মুক্ত' এই ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন। সে সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই সময়টা এবং লর্ড কার্জনের ভূমিকা বিশেষ-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে ভারতের মধ্যে বাংলা-দেশ ছিল অগ্রণী। সেই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে বাংলাদেশ একটি গুরুতর সমস্যা এবং চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালে কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এর পিছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ এর ফলে নবজাগ্রত বাংলাদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেই। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্য দিয়ে এদেশে হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিরোধের মনোভাবটা চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়াবে। 'ডিভাইড এণ্ড রুল' সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত নীতি। লর্ড কার্জন সেই নীতি অনুসরণ করেই এই নুতন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক ব্যাপক গণ বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হল। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন সারা ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামের এটাই সর্বপ্রথম অধ্যায়।

এই ব্যাপক আন্দোলন কিশোর আজাদের মনে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করে তুলেছিল। এরই প্রভাবে ও প্রেরণায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক মওলানা আবুল কালাম আজাদ সর্বপ্রথম রাজনীতির জগতে প্রবেশ করেছিলেন। সে সময় বাংলাদেশে প্রকাশ্য গণ-

আন্দোলনের পাশাপাশি পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিপ্লবীদের গোপন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি চলেছিল। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এই বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যমণি। বিপ্লবীদের এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি কিশোর আজাদ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

আজাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই বিপ্লবী দলে যোগদান করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন এই সমস্ত বিপ্লবী দলে স্থান পাওয়া মুসলমান ছেলেদের পক্ষে দুঃসাধ্য বা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাদের ধারণা দেশপ্রেমিকতা ছিল হিন্দুদেরই একচেটিয়া, কোন মুসলমান ছেলে যে সত্য সত্যই বিপ্লবী বা দেশপ্রেমিক হতে পারে, একথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতো না। কাজেই বিপ্লবী দলে যোগদান করতে গিয়ে কিশোর আজাদকে প্রচণ্ড বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু যত বাঁধাই থাকনা কেন, আজাদ দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সহায়তায় তিনি তাঁর সংকল্পকে কাজে পরিণত করে ছাড়লেন। আদর্শের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ও অনমনীয় সংকল্পের বলে তিনি বিপ্লবীদলের মধ্যে তাঁর স্থান করে নিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা।

আজাদের রাজনৈতিক জীবনের এই প্রথম ও সংক্ষিপ্ত অধ্যায়েই আমরা তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাই। বিপ্লবীদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শে আকৃষ্ট হলেও বাংলাদেশের বিপ্লবীদলগুলির দুটি প্রধান দুর্বলতা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তাদের প্রথম দুর্বলতা এই যে তারা হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের বাসভূমি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তাদের এই ভ্রান্ত ও অদূরদর্শীনীতি সাম্রাজ্যবাদের হাতকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ এই প্রদেশের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের এই আদর্শ ও সংগঠনকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তারা একেবারেই উদ্যোগী ছিলেন না। কিশোর আজাদ এই দুটি দুর্বলতার দিকে

বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথম দুর্বলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তার বিপ্লবী সহকর্মীদের একথা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, দেশের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় তাদের প্রতিপক্ষ ও শত্রু, এমন একটি ধারণা কখনও সত্যি হতে পারে না। ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরার ফলে মুসলমান সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা থাকলেও বিশেষভাবে সেই কারণেই তাদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যে তাদের মধ্যে আরও বেশী করে কাজ করা প্রয়োজন। মুসলমানদের সম্পর্কে এভাবে হতাশ হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। মিশর, ইরান ও তুরস্কে এই মুসলমানরাই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্ম সংগ্রাম করে চলেছে। সঠিক পথে সঠিক ভাবে পরিচালিত হলে এদেশের মুসলমানরাও একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হবে। তার বিপ্লবী বন্ধুরা তার এই সমস্ত যুক্তিতে কর্ণপাত করতে চাইতেন না। অবশ্য পরে দু'চারজন তার এই কথার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই অবহেলাকে গ্রাহ্য না করে আজাদ ভিতরে ভিতরে শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করে চলেছিলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়াও পাচ্ছিলেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দেওয়ার প্রশ্নে তার বন্ধুরা বলতেন, এর প্রয়োজনীয়তা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু বিপ্লবীদের অত্যন্ত সতর্কভাবে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বাংলা দেশের বিপ্লবী দলের শাখা স্থাপিত হলে এই গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা দুঃসাধ্য হবে। কিন্তু আজাদের এই অভিমত কতদূর সঠিক, দু চার বছরের মধ্যেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী দলগুলির কর্মক্ষেত্র শুধু বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, তাদের কার্যকলাপ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বোম্বাই প্রদেশে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছিল।

এই সময়ে তিনি ভারতের বাইরে দেশভ্রমণের একটি সুযোগ পান। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে তিনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে মিশর, ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্ক পরিভ্রমণ করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সফর শেষ করে তিনি তুরস্ক থেকে ফরাসী দেশে গেলেন। তিনি স্থির করেছিলেন কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে তার পরে ইংলণ্ড যাবেন। এই পরিকল্পনা নিয়ে ভারত থেকে সফরে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই সংকল্প পূর্ণ করা সম্ভব হল না। ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস শহরে কিছু দিন থাকার পরে দেশ থেকে খবর এল তাঁর পিতা মৃত্যুশয্যাশায়ী এবং তাঁকে অবিলম্বে দেশে ফিরে যেতে হবে—ফলে তাঁর পরিকল্পিত সফর অসমাপ্ত রেখে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হল।

একথা আগেই বলা হয়েছে, ১৯০৮ সালে কলিকাতা ছেড়ে চলে আসার আগেই তিনি বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ইরাকে আসার পর সেখানে কয়েকজন ইরানী বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়। মিশরে তিনি তুরস্কের মুস্তাফা কামাল পাশার কয়েকজন অনুগামীর সংস্পর্শে আসেন। তিনি মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে তরুণ তুর্ক (Young Turk) কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন। এরা কায়রো থেকে একটি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। তুরস্কে যাবার পর তরুণ তুর্ক দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন। দেশে ফিরে যাবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত তিনি চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন।

ভারতের অধিকাংশ মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন অথবা বিরুদ্ধবাদী, মওলানা আজাদের মুখে এই কথাটা জানতে পেরে আরব ও তুরস্কের রাজনৈতিক কর্মীরা খুবই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা স্পষ্ট-ভাবে এই অভিমত জানিয়েছিলেন যে ভারতের মুসলমানরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে চলে, তাহলে তারা নিজেদের এবং সারাদেশের সর্বনাশ ডেকে আনবেন। মওলানা আজাদও তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের সূচনা থেকে এইভাবেই চিন্তা করে এসেছেন। তিনি সংকল্প নিলেন দেশে ফিরে গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার ও আন্দোলনের কাজে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

দেশে ফিরে গিয়েই তিনি তাঁর কাজে নেমে গেলেন। সে সময় যে কাজটাকে তিনি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন তা হচ্ছে

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করে তোলা। তখন পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ থেকে উর্দু দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হত। কিন্তু সংবাদপত্র পরিচালনা, বিশেষ করে তার আঙ্গিক ও রূপসজ্জার দিক দিয়ে এগুলি ছিল খুবই নিম্নমানের। সাংবাদিকতার কাজে হাতেখড়ি হলেও আজাদ অদ্ভুত বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একথা ভাল করে বুঝেছিলেন যে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করতে হলে প্রথমে তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে হবে। কাজেই পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে তার উন্নত ধরনের আঙ্গিকের ব্যবস্থা করতেই হবে।

কিন্তু উর্দু ভাষায় পরিচালিত পত্রিকাগুলির এখানেই ছিল প্রধান দুর্বলতা। সেই সময়কার সমস্ত উর্দু পত্রিকাগুলি লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে মুদ্রিত হত, অর্থাৎ পত্রিকার বক্তব্যগুলি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে সেটাই যথাযথভাবে মুদ্রণ করার ব্যবস্থা করা হত। বইপত্র প্রকাশের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হত। আজকের দিনে একথাটা খুব আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সে সময় এটাই ছিল প্রচলিত রেওয়াজ। ফলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপযোগী কলাকৌশল অবলম্বন করা এবং অঙ্গসৌষ্ঠবের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। কেননা অন্যান্য সমস্যা ছাড়াও এই মুদ্রণ ব্যবস্থায় হাফটোন ছবি মুদ্রণ করা সম্ভব হত না। উর্দু পত্রিকা জগতে আজাদই সর্বপ্রথম লিথোগ্রাফিক পদ্ধতির পরিবর্তে টাইপ ভিত্তিক মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। উর্দু পত্রিকার ক্ষেত্রে এটাকে নিঃসংশয়ে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা যেতে পারে। অন্য সমস্ত কিছুর কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র এই কারণে মওলানা আজাদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অদ্ভুত তৎপরতা ও দক্ষতার সঙ্গে আজাদ তাঁর এই সংকল্পকে কাজে পরিণত করলেন। দেশে ফেরার ২-৩ বছর বাদে তিনি তাঁর 'আল হেলাল' প্রেসের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই প্রেসে টাইপ ভিত্তিক মুদ্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত। এই প্রেস থেকেই ১৯১২ সালের জুন মাসে তাঁর বিখ্যাত 'আল হেলাল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই পত্রিকাটি একটি

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

'আল হেলাল' পত্রিকার প্রকাশের সাথে সাথে উর্দু পত্রিকার জগতে একটা যুগান্তর ঘটে গেল। প্রকাশের পর অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি অদ্ভুতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শুধু তার অঙ্গসৌষ্ঠব বা রূপসজ্জার জন্যই নয় এই পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠত, তা জনসাধারণের মনে গভীর আলোড়ন জাগিয়ে তুলত। এ একটা সম্পূর্ণ নূতন সুর যার সঙ্গে ইতিপূর্বে তাদের কোনোই পরিচয় ছিল না। পত্রিকা প্রকাশের মাত্র তিনমাস পরে লোকের তাগিদে পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলি পুনঃপ্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়েছিল।

সেই সময় ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের মূল কেন্দ্র ছিল আলিগড়ে। এই সমস্ত নেতারা স্যার সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক নীতি অনুসরণ করে চলতেন। এই নীতির মূল কথা ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি রাজভক্তিতে অবিচল থাকো এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বতোভাবে পরি-হার করে চলো। এর সম্পূর্ণ বিপরীত 'আল হেলালে'র প্রচারিত স্বাধীনতার অগ্নিবাণী উর্দুভাষী পাঠকদের মনকে এক নূতন চেতনা ও ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত করে তুলছিল। আলিগড়ের মুসলিম নেতারা আল হেলালের এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও প্রভাব লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভয় করছিলেন আল হেলাল তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব আল হেলাল তাদের সকলের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ালো। শুধু আল হেলালের মতামতের বিরোধিতা করা নয়, 'আল হেলাল' যদি মুখ সামলে না চলে তাহলে তার পরিচালক ও সম্পাদককে হত্যা করা হবে, তাদের পক্ষ থেকে এইভাবে ভীতি প্রদর্শন করাও হচ্ছিল। কিন্তু তাদের এই সমস্ত বাধা ও হুমকি সত্বেও আল হেলালের জনপ্রিয়তা দিনদিন বেড়েই চলল। মাত্র দুবছর বাদে তার প্রচার সংখ্যা ২৬,০০০-এ গিয়ে দাঁড়ালো। সে যুগে কোন উর্দু সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা অকল্পনীয় ব্যাপার।

আল হেলালের দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময়ী রচনা ও তার জনপ্রিয়তা দেখে সরকার খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তার ফল ফলতে বেশি দেরী হল না।

দু'বছর বাদেই সরকার প্রেস আইন অনুসারে আল হেলাল প্রেসের উপর দু'হাজার টাকা জামানতের আদেশ দিলেন। তারা আশা করেছিলেন, এর ফলে আল হেলালের সুর কিছুটা নরম হবে। কিন্তু আল হেলালকে এভাবে দমিয়ে রাখা গেলনা, সরকারের আক্রমণের শিকার হয়েও আল হেলাল যেভাবে তার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল, সেইভাবেই তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। সরকার বুঝলেন, এ বড় শক্ত জায়গা, কাজেই শক্ত করেই আঘাত হানতে হবে। কিছুদিন বাদেই সরকারের আদেশে জামানতের দু'হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল এবং আল হেলাল প্রেসের উপর নূতন করে দশ হাজার টাকার জামানত ধার্য করা হল। এত বড় আঘাতের মুখেও ছাব্বিশ বছর বয়সের তরুণ আজাদ জামানতের দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে একইভাবে তাঁর আল হেলাল পত্রিকা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকার এই সুযোগে ১৯১৫ সালে ভারত প্রতিরক্ষা আইনের সাহায্যে আল হেলাল প্রেসকে বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত করে সরকার একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এবার? এবার কি করবেন আজাদ? আল হেলালের মত এমন তীব্র সরকার বিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশ করতে অন্য কোন প্রেস রাজী হবে না। এই পত্রিকা চালাতে হলে আবার নূতন করে একটা প্রেস গড়ে তুলতে হবে। ওদিকে সরকার শিকারী বাজের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছে. কিন্তু সরকারের এই আক্রমণের মুখেও আজাদ তাঁর সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হলেন না। আল হেলাল প্রেস বাজেয়াপ্ত হওয়ার পাঁচ মাস পরে তিনি 'আল বালাগ' নামে নূতন প্রেস স্থাপন করলেন এবং সেই প্রেস থেকে 'আল বালাগ' নামে এক নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হল।

সরকার এবার বুঝলেন, শুধুমাত্র প্রেস অ্যাক্টের সাহায্য নিয়ে এই দুঃসাহসিক লোকটাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। কাজেই এবার প্রেস বা পত্রিকা নয়, প্রেস ও পত্রিকা মালিকের উপর আক্রমণ নেমে এল। তাঁর অবাধ্য হাত ও মুখটাকে অচল করে দেয়ার জন্য বাংলা সরকার তাঁকে বাংলা প্রদেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। ওদিকে পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্ত প্রদেশ

(বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) ও বোম্বাই সরকার নিজ নিজ প্রদেশে তাঁর প্রবেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়েছেন। এই অবস্থায়, কোথায় যাবেন, কি করবেন তিনি? সেই অবস্থায় বিহারই ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে তাঁর স্থান হতে পারে। তাই তিনি রাঁচিতে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। কিন্তু সরকার তাতেও নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তাই ছয় মাস বাদে তাঁকে রাঁচিতে অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা করা হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে সেখানে অন্তরীণ জীবন-যাপন করতে হয়েছিল। ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারত রক্ষা আইনে ধৃত ভারতের অন্যান্য বন্দী ও অন্তরীণ-বন্দীদের সঙ্গে তিনি মুক্তি লাভ করলেন।

এই সময়ই গান্ধীজী প্রথমবারের মত ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ করেছেন। চম্পারনের কৃষকদের আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তিনি বিহারে এসেছিলেন। সেই সময় আজাদ রাঁচিতে অন্তরীণ ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিহার সরকার অনুমতি না দেওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। অবশেষে মুক্তি লাভের পর জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। এটাই ছিল তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ।

সেই সময় ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। একটা প্রস্তাব উঠেছিল যে খেলাফত ও তুরস্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য একটি প্রতিনিধি দল বড়লাটের কাছে যাবেন। খেলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের দাবীর প্রতি গান্ধীজীর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং তিনি এই প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। গান্ধীজী ছাড়াও লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা ভারতে মুসলমানদের এই খেলাফতের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে বড়লাট প্রতিনিধিদের জানালেন, এই বিষয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতাই তাঁর নাই। এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করছে। প্রতিনিধিরা যদি এই নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য লণ্ডনে যেতে চান, তবে তিনি তার ব্যবস্থা

করে দিতে রাজি আছেন। এবার প্রশ্ন দাঁড়ালো অতঃপর কি করা? পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত? এই সমস্যার সমাধানের জন্য নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এক আলোচনা সভা হয়। এই সভায় মওলানা মহম্মদ আলী, শওকত আলী, হাকিম আজমল খান এবং মৌলবী আবদুল বারী উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় গান্ধীজী সম্পূর্ণ নূতনভাবে এক প্রস্তাব তুললেন। তিনি বললেন, ডেপুটেশন পাঠানো এবং আবেদন-নিবেদন করার দিন এখন আর নেই। আমাদের সরকারের সঙ্গে সকল রকম সহযোগিতা বর্জন করে চলতে হবে। একমাত্র তাহলেই তারা আমাদের এই দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবে। এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি নিম্নোক্ত কর্মসূচীর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। যারা সরকারী খেতাব পেয়েছেন, তাদের তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্জন করতে হবে, সরকারী চাকুরি থেকে পদত্যাগ করতে হবে এবং নবগঠিত আইনসভাগুলিতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

গান্ধীজী কর্তৃক প্রস্তাবিত এই কর্মসূচী সম্পর্কে সেদিন নানা জন নানারকম মত প্রকাশ করেছিলেন। হাকিম আজমল খান বলেছিলেন, এই কর্মসূচী সম্পর্কে মতামত দেওয়ার আগে তিনি এ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে ভেবে দেখতে চান। মৌলবী আবদুল বারী বললেন, এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি আল্লার প্রত্যাদেশের জন্য অপেক্ষা করবেন। মওলানা মহম্মদ আলী ও শওকত আলী জানালেন যে মৌলবী আবদুল বারী তাঁর সিদ্ধান্ত জানালে পর তাঁরা তাদের অভিমত প্রকাশ করবেন। মওলানা আজাদ সেদিন গান্ধীজীর এই অসহযোগের কর্মসূচীকে পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তুরস্ককে যদি সত্য সত্যই সাহায্য করতে হয় তবে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। এর কয়েক সপ্তাহ বাদে মিরাটে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে গান্ধীজী প্রথমবারের মত প্রকাশ্য সভায় তাঁর অসহযোগ কর্মসূচীর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এখানেও মওলানা আজাদ এই প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী কর্তৃক প্রস্তাবিত এই অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে বিবেচনার জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন একমাত্র এই উপায়ে ভারতের স্বরাজ লাভ ও খেলাফত সমস্যার সমাধান হতে পারে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের দু'জনের মধ্যে কেউ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানাতে গিয়ে বিপিন পাল বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে বিলেতি দ্রব্য বর্জনই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর আস্থা ছিল না। বিস্ময়ের কথা এই যে এই সমস্ত দেশবরেণ্য কংগ্রেসী নেতাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের এই সম্মেলনে গান্ধীজী কর্তৃক প্রস্তাবিত অসহ-যোগ আন্দোলনের কর্মসূচী বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়ে গিয়েছিল।

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর গান্ধীজী এই প্রস্তাবের প্রচার-কার্যের জন্য ভারতের নানা অঞ্চল সফর করেন। এই সমস্ত প্রচার সভায় মওলানা আজাদ সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর প্রস্তাবে পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। লালা লাজপত রায় প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু পাঞ্জাবের কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সকলেই এই প্রস্তাবের সমর্থক দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। এই প্রসঙ্গে একথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মিঃ জিন্না চিরদিনের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

এই প্রস্তাব গ্রহণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে খুব বেশিদিন দেরী হলনা। আসন্ন আন্দোলনকে চাপা দেওয়ার জন্য সারা দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেল। বাংলাদেশে যাদের প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মওলানা আজাদও ছিলেন। তারও

কিছুদিন বাদে সুভাষচন্দ্র বসু ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মওলানা আজাদের মামলা অনেক দিন ধরে চলে, পরে তাকেও একবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু দণ্ড ভোগের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। ১৯২৩ সালে ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, দেশবন্ধু ইতিপূর্বেই মুক্তি পেয়েছিলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি কংগ্রেসের নয়া অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে প্রবল মত-বিরোধ দেখা দিয়েছিল। দেশবন্ধু, মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল খান 'স্বরাজ পার্টি' গঠন করে আইন সভায় অংশ গ্রহণের কর্মপন্থা নিয়ে কাজে নামলেন। অপর দিকে কংগ্রেসের নৈষ্ঠিক অনুগামী যাঁরা, তাঁরা ছিলেন আইন সভায় যোগদানের ঘোর বিরোধী। ফলে কংগ্রেস 'প্রো-চেঞ্জার' (পরিবর্তনকামী) ও 'নো চেঞ্জার' (পরিবর্তন বিরোধী) এই দুইটি দলে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ল।

মওলানা আজাদ জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে এই দুইটি পরস্পর বিরোধী দলের মধ্যে একটা আপোষ ও সমঝোতা সৃষ্টির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চললেন। সেই চেষ্টার ফলও হয়েছিল। ১৯২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মীমংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। সকলের ইচ্ছা অনুসারে মওলানা আজাদকে কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির পদে বরণ করা হয়েছিল। তখন তার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ। এত অল্প বয়সে আর কেউ কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হননি।

১৯২৩ সালের পর কংগ্রেসের কার্যকলাপ পরিচালনার মূল দায়িত্ব স্বরাজ পার্টির হাতেই চলে গেল। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সমস্ত প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে দল হিসাবে সংখ্যার গরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। অপর পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা আইন সভায় অংশ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, তাঁরা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাদের পিছনে দেশের লোকদের সমর্থন ছিলনা। এবং তাদের

দৃষ্টিও তাঁরা তেমন ভাবে আকর্ষণ করতে পারেননি।

১৯২১ সালে কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির উদ্যোগে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এক অপূর্ব উদ্দীপনা ও জাগরণের সৃষ্টি করে তুলেছিল। আন্দোলনের সূচনাতে প্রধান প্রধান নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন ভেঙ্গে পড়েনি বা পিছিয়ে যায়নি। আন্দোলনের মূল নেতা মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে স্কুল কলেজ থেকে দলে দলে ছাত্র বেরিয়ে এসেছিল। অনেক উকিল আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এবং অনেকে সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিলাতী বস্ত্র দহনের ঢেউ ম্যানচেস্টার ও ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনেছিল। এই আন্দোলন সর্বত্র অহিংসভাবে পরিচালিত হলেও সরকারী আক্রমণের ফলে চোরিচৌরা অঞ্চলে তা হিংসাত্মক রূপ নিয়ে ফেটে পড়েছিলো। এই ঘটনার পর গান্ধীজী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তার ফলে সারা দেশময় হতাশা ও অবসাদের ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম। যুদ্ধোত্তর যুগে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে বিপ্লব ঘটল। খেলাফতের পীঠস্থান তুরস্কের বিপ্লবী সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করার পর খেলাফত আন্দোলনের কোনই সার্থকতা রইল না। এই অবস্থায় ভারতের খেলাফত কমিটির অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়।

কংগ্রেস ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করল। এক বছরের মধ্যে এই স্বাধীনতার দাবী পূর্ণ করা না হলে সারা দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে বলে ব্রিটিশ সরকারকে হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছিল।

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী যে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার স্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়ে আজাদ সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছিলেন। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তাঁকে অনেকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বহু বাধাবিঘ্ন, অজস্র মিথ্যা অপবাদ সত্ত্বেও তিনি তাঁর নির্ধারিত চলার পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি, দ্বিধাগ্রস্ত মনের সন্দেহ, সংশয় ও ভয়ভীতি তাঁর বলিষ্ঠ মনকে দমাতে পারেনি। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের বিষাক্ত আক্রমণের সবচেয়ে বড় শিকার। কিন্তু এই ধীর, স্থির, বিচক্ষণ মানুষটির সহিষ্ণুতার বর্মে প্রতিহত হয়ে তাদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের একজন বিখ্যাত আলেম, বহু সম্মানিত ধর্মগুরু। আলেম হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও মর্যাদা শুধু ভারত নয়, ভারতের বাইরের মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে তিনি কথায় এবং কাজে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলতেন। এই বিষয়ে তাঁর মধ্যে কোন দিন কোন বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়নি। সাম্প্র-দায়িকতার বিষ-বাষ্পে আচ্ছন্ন এই দেশে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাম্যবাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম

যে কোন মুক্তি আন্দোলন, গণ আন্দোলন বা শ্রেণী আন্দোলনের পেছনে তার অনুকূল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমি থাকলে তা উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে যে তার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে তা নয়। সময় সময় বহির্জগতের আন্দোলনের তরঙ্গও তার উপরে এসে ঘা মারে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, ইতালী ও আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি আন্দোলন এবং সর্বশেষে রুশিয়ার সর্বহারা বিপ্লব, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে সর্বভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তার প্রাথমিক প্রেরণা লাভ করেছিলো, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধতা নেই। বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী হয়ে উঠেছিলো, একথা অবশ্যই বলা চলে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ বহু কবির, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতায় নতুন ঊষালগ্নে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিলো।*

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এক নতুন ও অভিনব ভূমিকা নিয়ে দেখা দিলেন চারণ কবি মুকুন্দ দাশ। তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচারের জন্য যে মাধ্যমটির সৃষ্টি করলেন তার নাম 'মুকুন্দ দাশের যাত্রা'। প্রচলিত যাত্রাভিনয়ের মতই তা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে হাজার হাজার জনসাধারণের মনকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলো। কিন্তু প্রচলিত যাত্রাভিনয়

---

* বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম সঙ্গীত সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সেইসব সঙ্গীতের ধারা স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছিলো।

থেকে তাঁর প্রয়োগ পদ্ধতি ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার। মুকুন্দ দাশের দল যে কোন যাত্রাই অভিনয় করুন না কেন, মুকুন্দ দাশ নিজেই সেই অভিনয়ের কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী গান, মৃদু নৃত্যভঙ্গী এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ একটানা বক্তৃতা, এদের সবকিছুই শ্রোতা বা দর্শকদের আকর্ষণের মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াতো।

তৃতীয় অধ্যায়টি বিশেষভাবে কবি নজরুল ইসলামের অধ্যায়। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধূমকেতুর মতই নেমে এসেছিলেন। তাঁর এই আবির্ভাবের জন্য কেউ যেন প্রস্তুত ছিলোনা। রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর অসংখ্য গান, কবিতা ও গদ্যরচনা অজস্র ধারায় নেমে এসেছে। তাঁর নানা জাতীয় গানের মোট সংখ্যা তিন হাজার। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তিতে লিখিত রচনাগুলি এই প্রসঙ্গে আমাদের মূল আলোচ্য। তাঁর গানগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে তুলেছিলো। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা তাঁর ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ হাতিয়ার রূপে কাজ করে এসেছে। তাদের সেই ভূমিকা আজও অব্যাহত আছে।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান। মুসলমান সমাজে কাজী পরিবার অভিজাত পরিবার বলেই গণ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা সৌভাগ্যবশতঃ অভাব, অনটনক্লিষ্ট এক দরিদ্র পরিবারে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়েই তাঁকে বড় হয়ে উঠতে হয়েছিলো। তা না হলে তাঁকে বালক বয়সেই 'লেটোর' দলে গান গাইতে অথবা আসানসোলের রুটির দোকানে ছোকরা মজুরের কাজ করতে যেতে হোত না।

বাস্তব জীবনের এইরূপ কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি শোষিত মেহনতি মানুষের ব্যথা-বেদনা ও লাঞ্ছনাকে গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। আর এই অনুভূতির মধ্য দিয়েই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গানগুলি শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছিলো। এই গভীর আকর্ষণের ফলেই তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মধ্যে থেকেও মাটির মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি।

যে করেই হোক তিনি স্কুলের দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র জীবন-যাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের সীমা শিক্ষায়তনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলোনা। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ইতিহাস তিনি সমানভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ফার্সী ভাষার উপরেও তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিলো। তাঁর বহু কবিতার মধ্যে এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।

সৈনিক জীবনে কাজী নজরুল ইসলাম

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এই যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগ দেয়ার জন্য বহু তরুণ বাঙালীর মনে গভীর আগ্রহের ভাব দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনা ক্রমশই জাগ্রত হয়ে উঠেছিলো বলে বৃটিশ সরকার বাঙালীদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না। তবে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলার উপায় ছিলো না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে বাঙালীদের একটি স্বতন্ত্র রেজিমেণ্ট গড়ে তুলতে হয়েছিলো।

নজরুল সৈন্য বিভাগে ভর্তি হলেন*। সে সময় বাঙালী সৈন্যদের নিয়ে ডবল্ কোম্পানী নামে একটি কোম্পানী গঠন করা হয়েছিলো। নজরুলকে প্রথমে সামরিক শিক্ষা নেবার জন্য পেশোয়ারের নিকটবর্তী নৌশহরাতে পাঠানো হয়েছিলো। পরে এই ডবল্ কোম্পানীটিকে ৪৯ নম্বর রেজিমেণ্টে পরিণত করা হয়েছিলো। তার সদর দফতর ছিলো করাচিতে।

নজরুল ও শৈলজানন্দ বালক বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চা করে আসছিলেন। করাচি সেনানিবাসে থাকার সময় নজরুল গল্প ও কবিতা রচনা

* তাঁর আশৈশব বন্ধু সাহিত্যিক শৈলজানন্দ তাঁর সাথে একই সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিভাবকরা নানারকম কলা-কৌশলে তাঁর এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

করতেন এবং তা কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পাঠাতেন, সে সময় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। কমরেড মুজফ্ফর আহমেদের উপর এই পত্রিকাটি পরিচালনার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো। এই পত্রিকায় তাঁর 'মুক্তি' নামক কবিতাটি এবং 'ব্যথার দান' ও 'হেনা' এই দুটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিলো। সম্ভবতঃ এই তিনটিই তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা। এই তিনটি রচনা থেকেই লেখক হিসাবে তিনি যে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা বহন করছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তিনি ১৯১৮ সালে তাঁর প্রথম লেখাটি এই পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন।

যুদ্ধের পর ৪৯ নম্বর রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেবার সময় এসে গেল। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র পরিচালকরা, বিশেষ করে তার মূল প্রাণশক্তি কমরেড মুজফ্ফর আহমদ এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে নজরুল ইসলাম বাঙলার সাহিত্য গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে আবির্ভূত হবেন। সেই কারণেই তাঁরা মনে করেছিলেন যে সৈনিক জীবন অবসানের পর নজরুল ইসলামের কলকাতায় এসেই থাকা উচিত। তদনুসারে তাঁকে চিঠি লেখা হয়েছিলো যে পল্টন ভেঙ্গে দেবার পর তিনি যেন সোজা কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি অফিসে এসে ওঠেন।

তরুণ নজরুল সর্বপ্রথম কোন সময় এবং কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে করাচি সেনানিবাসে বসে তিনি 'ব্যথার দান' নামে যে গল্পটি লিখেছিলেন, তা থেকে আমরা এ কথা বুঝতে পারি যে, করাচিতে আসার পর অথবা তার আগে থেকে তিনি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন।

এ কথা সত্য, স্বাধীনতার ভাবধারা সে যুগে যে কোন রূপ নিয়েই হোক, ভারতের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তবে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে ও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পটি থেকে আমরা তা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি। সে সময় বৃটিশ সরকার এবং তার এজেন্টরা সোভিয়েত বিপ্লবের

বিরুদ্ধে নানা-রূপ কল্পিত মিথ্যা কুৎসা রচনা করে চলেছিলো। তাদের আদর্শ এবং সেখানকার প্রকৃত তথ্যগুলি যাতে এদেশে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ভারতকে ঘিরে লৌহ বেষ্টনী (Iron curtain) সৃষ্টি করে তোলা হয়েছিলো। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সেই লৌহ বেষ্টনীর রন্ধ্র-পথ দিয়ে কিছু কিছু সত্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

করাচির সেনানিবাসের বাঙালী সৈনিকরা নানারূপ পত্র-পত্রিকা রাখতেন। কিন্তু এদেশে প্রকাশিত পত্রিকায় সোভিয়েত বিপ্লব সম্পর্কে কোন সত্য সংবাদ প্রকাশের সুযোগ ছিলো না। সে জন্যই তাঁরা নানাভাবে সীমান্তের পরপারে সোভিয়েত এলাকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, সে সম্পর্কে কিছু কিছু প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতেন।

'ব্যথার দান' গল্পের উপর যে বাস্তব ঘটনাটির ছায়াপাত ঘটেছিলো, এবার সেই কাহিনীটির বর্ণনা করছি। সেই ঘটনাটি ১৯১৮ সালে ঘটেছিলো। এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ বৃটিশ ফৌজের কয়েকটি ইউনিটকে ট্রান্স-ককেসাসে পাঠিয়েছিলো। তাদের মধ্যে কয়েকটি ভারতীয় ইউনিটও ছিলো। ভারতীয় ইউনিটের সৈন্যরা সেদিন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে অস্বীকার করেছিলো। তাদের মধ্যে কিছু কিছু সৈন্য বৃটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোভিয়েতের লালফৌজে যোগ দিয়েছিলো। ভারতের রাজনৈতিক আন্দো-লনের ইতিহাসে এই ঘটনাবলী অবিস্মরণীয়।

এ সম্পর্কে কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ কর্তৃক রচিত 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' বইটিতে বর্ণিত কাহিনীটির উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে :

"তাদের মধ্যে মুরতজা আলী নামে একজন ভারতীয় সৈন্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিকোলাই গিকালোর গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এই গেরিলা বাহিনীটি দাগিস্তান ও কার্বাদা পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলো। শ্বেত-প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের বিরুদ্ধে মুরতজা আলী অনেকগুলি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। অবস্থা যখন নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যখন গেরিলা বাহিনীকে শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে এবং যখন লাল

ফৌজের নিয়মিত বাহিনী হতে গেরিলা বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তখন মুরতজা আলী অসম সাহসিকতার সঙ্গে শ্বেত-প্রতিবিপ্লবীদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ডিপো ও যুদ্ধের মাল-মসলাগুলি ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই ভারতীয় বীরের সাহসিকতার কাজগুলি সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচারিত হয়েছিলো। এই সাহসী যোদ্ধার নাম শুনেই প্রতি-বিপ্লবীরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তো। একদিন এইরকম একটি যুদ্ধের পরে মুরতজা আলী আর ফিরে এলেন না। কিন্তু তাঁর সহযোদ্ধা কমরেডরা তাঁর স্মৃতি তাঁদের মনে জিইয়ে রেখেছেন। নিকোলাই গিকালোর বোন ভেরা গিকালো ককেসাসে গেরিলা যুদ্ধের সময় মুরতজা আলীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, আজকাল সোভিয়েত ও ভারতীয় জনগণের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আমি যখন মর্মস্পর্শী অনেক কথা পড়ি তখন আমার চিন্তা জগতে জাগরূক হয়ে ওঠে সেই নম্র, সাহসী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী যোদ্ধাদের কথা। সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, কিন্তু সাহসী মুরতজা আলীর মত জনগণের মুক্তির খাতিরে তাঁরা নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা রাখতেন না।"

উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৯১৮ সালে। সেই ১৯১৮ সালেই নজরুল তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পটি লিখেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় করাচি সেনানিবাসের রাজনৈতিকভাবে সচেতন সৈনিকরা ঘটনাটি ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই সংবাদটি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। 'ব্যথার দান' গল্পটিতে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ 'লালফৌজ' কথাটিকে কেটে দিয়ে তার পরিবর্তে 'মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। কেননা সেই সময় লালফৌজ শব্দটি ব্যবহার করাটা সৈনিকের পদে নিযুক্ত নজরুলের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ছিলো।

'ব্যথার দান' একটি প্রেমের গল্প হলেও এই ঘটনাটির প্রত্যক্ষ প্রভাব তার উপর এসে পড়েছিলো। ঘটনাটির স্থান বেলুচিস্তানের গুলিস্তান, চমন ও বস্তান প্রভৃতি জায়গা। এ সব জায়গা হতে সীমান্ত অতিক্রম করে সোভিয়েত এলাকায় যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

দারা, সয়ফুল মুল্ক ও বেদৌরা, এই তিনটি মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই গল্পটি রচিত। দারা ও সয়ফুল মুল্ক দুজনেই বেদৌরাকে ভালোবাসতো।

বেদৌরা ভালোবেসেছিলো দারাকেই। কিন্তু ঘটনা বিপর্যয়ের ফলে কারো ভালোবাসাই সফল পরিণতি লাভ করতে পারেনি। দারার দীর্ঘদিনের অদর্শনের ফলে বেদৌরাকে সয়ফুল মুল্ক-এর কাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধরা দিতে হয়েছিলো। এই অবস্থায় দারার সঙ্গে তাদের পুনরায় দেখা হোল। বেদৌরা আন্তরিকভাবে সমস্ত অবস্থাটা দারার কাছে খুলে বললো। এই পরিস্থিতিতে বেদৌরার সমস্ত কথায় বিশ্বাস করা সত্ত্বেও দারা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এই বিয়োগান্তক অবস্থায় ঘটনার গতি এগিয়ে চললো। গল্পের এক স্থানে সয়ফুল মুল্কের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

"ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই লালফৌজে যোগ দিলুম। এই পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছিলো। এরা মনে করেছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করেছিলো। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে দারার সঙ্গে একদিন তার দেখা হয়ে গেল। সে কেন এখানে এসেছে সয়ফুল মুল্ক তাকে এই প্রশ্ন করায় দারা তার উত্তরে বলেছিলো, "এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলাম না, তাই এই দলে এসেছি।" লালফৌজে যোগ দিয়ে নিজেকে এতটুকু না বাঁচিয়ে দারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করতে লাগলো। সে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলো, তবুও হাসপাতালে যাচ্ছিলো না। তার কৃতিত্বের জন্য লালফৌজে বড় পদ সে পেল। শেষ পর্যন্ত লালফৌজের জয়লাভও হলো, কিন্তু দারা তখন অন্ধ ও বধির।

রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক আদর্শ তরুণ নজরুল ইসলামের মনে কি গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো 'ব্যথার দান' গল্পের এই উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যেই তা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে কাজী নজরুলের এই গল্পটির মধ্যে সর্বপ্রথম রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিলো।

আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ ও দেশপ্রেম পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন নয়। গল্পটির এক জায়গায় বলা হয়েছে, "গোলেস্তান। অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি। আ মাটি মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল। —মাতৃস্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হতে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই মার চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি।"

সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ পত্রিকা

১৯২০ সালে ৪৯ নম্বর রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলো। কাজী নজরুল ইসলাম পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী পথে আর কোথাও না গিয়ে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' অফিসে এসে উঠলেন। তিনি আসার পর সবাই কৌতূহলী হয়ে তাঁর গাঁটরি-বোঁচকাগুলির মধ্যে কি আছে তা তল্লাশি করে দেখলেন। তার মধ্যে বিছানাপত্র, সৈনিকদের পোষাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (বাইনোকুলার), কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো।

এতদিন যাঁদের সঙ্গে পত্রযোগে আলাপ পরিচয় চলছিলো, এইবারই তাঁরা প্রথম কবি নজরুলকে স্বচক্ষে দেখলেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ কি তেইশ। এ সম্পর্কে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ বলেছেন, তরুণ কবি সেদিন তাঁর 'সুগঠিত দেহ অপরিমেয় স্বাস্থ্য ও প্রাণ খোলা হাসি' দিয়ে সকলকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন।

এই অফিসের বাসায় নজরুল বেশ কিছুদিন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ভারতে কমিউনিজমের মতবাদের যাঁরা আদি প্রবর্তক, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে নজরুলের কবিমানসে সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ আরো বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছিলো।

সে সময়টা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলো বলে ভারতবাসীরা যুদ্ধ জয়ের পর

নানারূপ উল্লেখযোগ্য অধিকার লাভ করবে, এ সম্পর্কে খুবই আশাবাদী ছিলো। কিন্তু ১৯১৯ সালের 'ভারত সংস্কার আইন' তাদের সম্পূর্ণভাবে হতাশ করেছিলো এবং তার বিরুদ্ধে সারা দেশময় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিলো। অপর দিকে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তুরস্ক থেকে খিলাফতের অপসারণের ফলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে তীব্র বৃটিশ বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছিল। ফলে সে সময় সারা ভারতব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিলো।*

যারা গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলেন ভারতের রাজনীতিকে তাঁরা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে একটি আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস অনুভব করতে পারছিলেন। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে কাজী নজরুল ইসলাম, কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, মহম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব, ফজলুল হক সেলবর্ষী ও মঈনউদ্দীন হোসায়ন একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন।

কিন্তু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই টাকা যোগাবে কে? এই সংকটের সমাধানের জন্যে তাঁরা এ কে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। তিনি তখন হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত আইনজীবী এবং কংগ্রেস ও খিলাফতের বিশিষ্ট নেতাদের অন্যতম। তাঁরও অনেকদিন থেকেই মনে মনে এ রকম একটা ইচ্ছা ছিলো। কাজেই তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে পূর্ণ সম্মতি পাওয়া গেল। তিনি কাগজটি প্রকাশের সব ব্যবস্থা করে দিবেন বলে কথা দিলেন।

ফজলুল হক সাহেবের ধারণা ছিলো বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কেউ ভালো বাংলা লিখতে পারে না। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে কাগজ চলার প্রথম দিকে শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হোক। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুলেখক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আদর্শের কোনো বালাই ছিলো না। ফজলুল হক সাহেবের এই প্রস্তাবে তাঁরা রাজী হতে চাইলেন না। অবশেষে কাজী

* কংগ্রেস ও খিলাফৎ উভয়েই এই বিষয়ে মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো।

নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের যোগ্য সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো।

ফজলুল হক সাহেবের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, কাজী নজরুল তা হাতে হাতে প্রমাণ করে দিলেন। তখন অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়েছে, কাজী নজরুলের শক্তিশালী লেখনী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অগ্নি-বর্ষণ করে চলেছিলো। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই তখন এই নবাগত 'নবযুগ' পত্রিকাটির দিকে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছিলেন্। ফজলুল হক সাহেবের ছাপাখানাটি ভালোভাবে কাজ চালানোর উপযোগী ছিলো না ফলে সেখান থেকে যে সংখ্যায় পত্রিকা ছাপা হতো, তা দিয়ে পাঠক-দের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিলো না। 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা দেখে এবং তার সুখ্যাতি শুনে ফজলুল হক সাহেবের ভুলটা ভেঙ্গে গিয়েছিলো। 'নবযুগ' পত্রিকাটি আকারে খুবই ছোট ছিলো। কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল সাংবাদিক হিসাবে তাঁর বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

নজরুলের কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছিলো। তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা যখন প্রকাশিত হলো, তখন বাংলাদেশের পাঠক সমাজে তা এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করলো। ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে অভিনব এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যরসপিপাসু পাঠকরা এই সত্যটিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলার কাব্য জগতে কাজী নজরুল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। সেদিন থেকে বাংলার কাব্য ক্ষেত্রে কাজী নজরুলের স্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

কাজী নজরুলের কবিতাগুলো বাঙালী পাঠকদের কাছে সাধারণভাবে সমাদৃত হলেও তাঁর বিদ্রোহী কবিতার প্রকাশ সে সময়কার বিশেষ এক উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা। এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে সেদিন যেন এক ঝড় বয়ে চলেছিলো। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপলক্ষে এই কবিতাটি আবৃত্তি হতে লাগলো, স্বয়ং কবি এই কবিতাটিকে আবৃত্তি করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে আমন্ত্রিত হতে থাকলেন। শুধু রচনার গুণে নয়, তাঁর অপূর্ব

আবৃত্তি শক্তিও শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলতো। বাইশ বছরের তরুণ কবি নজরুল সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সকলের মনে নতুনভাবে চমক লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন ছিলো বিদ্রোহের দিন, সারা ভারতব্যাপী বৃটিশ-বিরোধী দুর্বার আন্দোলনের জোয়ার জেগে উঠেছিলো। সেই অনুকূল পরিবেশে কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' এবং এই জাতীয় কবিতাগুলো মানুষের মনে এমন অভাবনীয় সাড়া জাগাতে পেরেছিলো।

সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' তার ক্ষুরধার ভাষায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। ফলে এই পত্রিকাটির উপর যে সরকারের আক্রমণ নেমে আসবে, তা খুবই স্বাভাবিক। প্রথমে দুই একবার হুঁসিয়ারী দিয়ে সরকার পত্রিকাটির জামানত ১০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। 'নবযুগ' এতেও ভয় না পেয়ে নতুন করে ২০০০ টাকা জামানত দিয়ে পুনরায় আত্ম-প্রকাশ করলো। কিন্তু 'নবযুগ' ভয় না পেলেও ফজলুল হক সাহেব বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। এভাবে সরকারের আক্রমণের সম্মুখীন হতে তিনি ভরসা পাচ্ছিলেন না। তাই লেখার ধরন নিয়ে মতবিরোধ ঘটলো। ফলে প্রথমে কাজী নজরুল এবং পরে মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেব পত্রিকা থেকে পদত্যাগ করলেন। এই ভাবেই 'নবযুগ' পত্রিকার অকালমৃত্যু ঘটলো।

সেবক

এর পর নজরুল কিছুকালের জন্য কলকাতা থেকে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন। তিনি ১৯২১ সালের জুন কিম্বা জুলাই মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন। সম্ভ-বতঃ সেই সময়েই তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা 'সেবক'-এ যোগদান করেছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক 'সেবক' ছিলো অখণ্ড ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের পত্রিকা। খাঁ সাহেবই ছিলেন এ পত্রিকার একাধারে স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক। ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের বিশাল এবং ব্যাপক পটভূমিতে সেবকের জন্ম। যতদিন আন্দোলনের তীব্রতা ও উত্তেজনা ছিলো ততদিন এ

পত্রিকার চাহিদাও ছিলো অফুরন্ত। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি সময়, মে-জুনের দিকে, আন্দোলনের প্রবাহ একেবারে স্তিমিত হয়ে এসেছিলো।

কাজী নজরুলের যোগদানের ফলে সেবক পত্রিকায় নতুন প্রাণ সঞ্চার ঘটেছিলো। কিন্তু নজরুল কোন দিনই বাঁধা-ধরা নিয়মের ছকে আবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাইতেন না। এটাই ছিলো তাঁর নিজস্ব স্বভাব। তিনি কোন্ কোন্ দিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখবেন, সে সম্পর্কে তিনি কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলতেন না। ফলে পত্রিকার পরিচালকদের সময় সময় তাঁকে নিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হোত। তার উপর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে সেবকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

ঘটনাটা এই, ১৯২২ সালের ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। কাজী নজরুল কবি সত্যেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এবং তাঁর মৃত্যু-সংবাদ নজরুলের মনে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। এই সংবাদ পেয়েই কাজী নজরুল চলে এলেন সেবক অফিসে এবং ঘোষণা করলেন যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা সেদিন তিনি নিজেই লিখবেন। তাঁর এ কথায় সবাই খুশি হয়েছিলেন। তখনকার দিনের অনেকের মতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু সম্পর্কে এমন মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু সেদিন তিনি তাঁর লেখা শেষ করে চলে যাবার পর তা নিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য ঘটেছিলো। ফলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির স্থানে স্থানে বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিলো। এই সংশোধিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর নজরুলের মনে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিলো। এই কারণেই দৈনিক সেবকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

ধূমকেতু

১৯২২ সালেই নজরুলের নিজস্ব উদ্যোগে স্বনামখ্যাত 'ধূমকেতু' নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিলো। ধূমকেতু সপ্তাহে দুবার করে দেখা দেবে এই ঘোষণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে 'ধূমকেতু'র বয়স ছিলো

তিন মাস চার দিন। 'ধূমকেতু'র প্রকাশ অর্থাৎ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ১৯২২ খৃস্টাব্দের ১১ই আগস্ট এবং নজরুল সম্পাদিত শেষ সংখ্যা অর্থাৎ প্রথম বর্ষের একবিংশ সংখ্যার প্রকাশ ১৪ই নভেম্বর ১৯২২ খৃস্টাব্দ।

নজরুল কি আদর্শকে সামনে নিয়ে ধূমকেতু প্রকাশ করেছিলেন, ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি তার একটু রূপরেখা দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"মাভৈ বাণীর ভরসা নিয়ে জয় প্রলয়ঙ্কর বলে 'ধূমকেতুকে' রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হোল। আমার কর্ণধার আমি। আমার যাত্রার শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি আমার সত্যকে।...দেশের যাত্রা শুরু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকি তা সব দূর করতে ধূমকেতু হবে আগুনের মত সম্মার্জনী।...ধূমকেতু কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্য ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।"

ধূমকেতু প্রকাশের আগে নজরুল ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথ এবং আরো কারো কারো কাছে আশীর্বাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ডাকে তাঁরা প্রায় সবাই সাড়া দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে আশীর্বাদ ও শুভকামনাকে শিরে নিয়ে 'ধূমকেতুর' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো, তা অনেকের কাছেই পরিচিত, তা হলেও এখানে তা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক রে লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন॥

অতি অল্পদিনের পরিচয় হলেও রবীন্দ্রনাথ কবি নজরুলের কাব্য-প্রতিভাকে

যথার্থভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তার প্রয়োজনও তিনি বোধ করতে পারছিলেন। তাই 'ধূমকেতু'র যে স্বল্পস্থায়ী অথচ প্রখর ও উজ্জ্বল রূপটি সারা বাংলার বুকে নতুন হৃদস্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিলো, রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণীর মধ্যে আমরা যেন তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ গঠনমূলক আদর্শের উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও বাস্তব-বোধ থেকে এই সত্যটাকেও তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে অবস্থা বিশেষে গঠনের একান্ত প্রয়োজনেই ভাঙ্গনের কাজ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের কবিতার মধ্যেও আমরা এখানে ওখানে তার পরিচয় পাই। যথা—

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজা বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামী তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন রে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত আয় রে আমার কাচা॥

'ধূমকেতুর' জন্য কবি নজরুল যে কটি আশীর্বাণী লাভ করেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তার আর দুটির উল্লেখ করা যাচ্ছে। অরবিন্দ-বারীন্দ্রের তেজস্বিনী ভগিনী যে বাণীটি পাঠিয়েছিলেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও বিশেষভাবে স্মরণীয়ঃ

"তোমার 'ধূমকেতু' বিশ্বের সকল অমঙ্গল, সমস্ত অকল্যাণকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলুক—তোমার 'ধূমকেতু' যা কিছু অসুন্দর তা ধ্বংস করে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার সহায়ক হউক। তোমার 'ধূমকেতু' মানুষে মানুষে মিলনের সকল অন্তরায় চূর্ণ করে দিয়ে মহামানবের সৃষ্টি শক্তি ও সাম্য এনে দিক।"

'নির্বাসিতের আত্মকথা'র অবিস্মরণীয় লেখক বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নোক্ত বাণীটি প্রেরণ করেছিলেনঃ

"রুদ্ররূপ ধরে ধূমকেতুতে চড়ে তুমি দেখা দিয়েছো—ভালোই হয়েছে।

আমি প্রাণ ভরে বলছি—স্বাগত। আজ ধ্বংসের দিন, বিপ্লবের দিন, মহামারীর দিন, ছুর্ভিক্ষের দিন, সর্বনাশের দিন—তাই রুদ্রের করাল রূপ ছাড়া আর চোখে কিছু লাগেনা। সৃষ্টি যারা করবার তারা করবে, তুমি মহাকালের প্রলয়-বিষাণ এবার বাজাও, অতীতকে আজ ডোবাও, ভয়কে আজ ভাঙ্গো, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে কেঁপে উঠুক। ভয়ঙ্কর যে কত সুন্দর তা তোমার 'ধূমকেতু' দেখে যেন সবাই বুঝতে পারে।"

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে 'ধূমকেতু'র আত্মপ্রকাশ এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা। 'ধূমকেতু'র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাংলাদেশ সচকিত হয়ে উঠলো। স্বল্পায়ু 'ধূমকেতু' বাঙালী পাঠকদের মনে কি এক বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করে তুলেছিলো। 'ধূমকেতুকে' স্বাগত জানিয়ে চারদিক থেকে কত যে অভিনন্দন আসছিলো! তাদের মধ্যে এখানে মাত্র একটির উল্লেখ করা যাচ্ছে। কুমিল্লার বিপ্লবী নেতা অতীন রায় ধূমকেতুকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন :

"ভাই নজরুল, আজ তোমায় আলিঙ্গন দিচ্ছি। 'ধূমকেতুর' সারথি বেশে আজ যে 'মহাবিপ্লব হেতু' 'স্রষ্টার শনি' রূপে ভাঙ্গার অগ্নি-বিষাণ বাজিয়ে এ "শাওন-ঘন-তমসাবৃত" আকাশে দেখা দিয়েছো, সারথি, এসো বিগত বিপ্লবের ধূমকেতু, আমরা তোমায় সাদরে অভিনন্দন করছি।

"দিকে দিকে আজ যে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে এসো, উল্কা অশনি বৃষ্টি করে সর্বনাশের ঝাণ্ডা উড়িয়ে তুমিও তোমার ধূমকেতু নিয়ে এসে তাতে যোগ দাও ; তোমার তুরীয় লোকের তীর্যক গতিতে সারা ছুনিয়া কেঁপে উঠুক।"

কলকাতার পাঠক সমাজের উপর 'ধূমকেতু' কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো, প্রত্যক্ষদর্শী কবি অচিন্ত্যকুমার সেনের রোমাঞ্চকর বিবরণ থেকে আমরা তার পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :

"সপ্তাহান্তে বিকাল বেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে ধূমকেতুর বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়ো-হুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্য। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ…শুনেছি স্বদেশী যুগের 'সন্ধ্যা'তে ব্রহ্মবান্ধব

এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙ্গার গান প্রলয় বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।"

এ যুগ অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। কিন্তু আন্দোলন তখন ভাঁটার মুখে। জনসাধারণ আন্দোলনের এক উচ্চ পর্যায়ে উঠে হঠাৎ এভাবে পিছিয়ে পড়তে চাইছিলো না। তাদের মন তখন সামনে এগিয়ে চলার জন্য উন্মুখ। 'ধূমকেতু' তাদের মনের সেই ইচ্ছাটাকে জ্বালাময়ী ভাষায় রূপ দিতে পেরেছিলো। তার ফলেই 'ধূমকেতু' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এমন-ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলো।

শুধুমাত্র ২৫০ টাকা পুঁজি নিয়ে কাজী নজরুল এই অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে পরিচালনা করতে নেমেছিলেন। এ বিষয়ে যাঁদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা কখনই এ পথে পা বাড়াতে সাহস করতেন না। কিন্তু নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণভাবে বে-পরোয়া, এই দুঃসাহসই শেষ পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে বড় পুঁজি হয়ে দাঁড়ালো। তাঁর প্রবল আদর্শ নিষ্ঠা এবং ক্ষুরধার লেখনীর গুণে আকৃষ্ট হয়ে চারদিক থেকে অনেকে এসে 'ধূমকেতু' অফিসে জমায়েত হতে লাগলেন। তাঁর অর্থবল ও লোকবল কোন কিছুরই অভাব ঘটলো না। 'ধূমকেতু' ৩২, কলেজ স্ট্রীট, আফজালুল হক সাহেবের ঘর থেকে প্রকাশিত হচ্ছিলো। ছাপানোর ব্যবস্থা হয়েছিলো মেটকাফ প্রেসে।

সে সময় যাঁরা 'ধূমকেতু' পত্রিকাটিকে নানাভাবে সাহায্য করতেন, তাঁদের মধ্যে তখনকার দিনের বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা ভূপতি মজুমদারের (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সংস্পর্শে 'ধূমকেতু'র উপর বিপ্লবীদের আদর্শ ও ভাবধারার প্রভাব সংক্রামিত হয়ে পড়ছিলো।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত সমস্যা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এক ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে তুলেছিল। যুদ্ধপূর্বে সংঘটিত ঘটনাবলী দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে চলেছিল। ভারতের বিপ্লবীরা এই যুদ্ধের সংকটের সুযোগে বৃটিশের শত্রু জার্মানীর সহায়তা নিয়ে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, এ কথা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু বিপ্লবীরাই নয়, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে সারা দেশের মানুষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্রুত রূপান্তর চলেছিল। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯১৬ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। লক্ষ্ণৌর যুক্ত সম্মেলনে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে জিন্নাহ, মহম্মদ আলী আনসারী ও মাহমুদাবাদের রাজা এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল নেহরু ও তিলক আলোচনায় যোগদান করেছিলেন। হোমরুল, দায়িত্বশীল সরকার গঠন, গঠনতন্ত্রের সংশোধন ইত্যাদি তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। এই আদর্শগুলিকে সামনে রেখেই তারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এই চুক্তির মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় মতের নেতারাই ছিলেন এবং তাদের এই যুক্ত উদ্যোগ এক মিলিত আন্দোলনের সূচনা করেছিল।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সেই ঘনঘটা ও ঝটিকাপূর্ণ পরিবেশে এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করে তোলা সম্ভব হয়নি। তুরস্ক যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিল, ভারতের মুসলমানরা তখন এক উভয় সংকটের মধ্যে পড়ল।

সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান নেতারা এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করবে বলে প্রস্তাব নিয়েছিল। শুধু প্রস্তাব নেওয়া নয়, কার্যত তারা ইংরেজদের সাহায্যে অর্থবল ও ধনবল জুগিয়ে চলেছিল। কিন্তু তুরস্ক এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে গভীর দ্বিধা ও সংশয়ের ভাব দেখা দিল—মুসলমান হয়ে তারা তুরস্কের মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। বিশেষ করে তুরস্কের খলিফা সারা মুসলিম জগতের ধর্মীয় নেতা, এই প্রশ্নটা ভারতের মুসলমানদের মনে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে চলেছিল।

ভারতের মুসলমানদের মনের এই দ্বিধা ও সংশয় সম্পর্কে বৃটিশ সরকার অচেতন ছিলেন না। কাজেই তারা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিকারের চেষ্টায় এগিয়ে এলেন। মুসলমানরা যাতে রাজভক্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বিরুদ্ধে চলে না যায়, সেজন্য ভারতের বৃটিশ অফিসাররা এখানকার উলেমাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আরব ও মেসোপোটেমিয়ার মুসলমানদের যে সকল ধর্মস্থান আছে, যুদ্ধের পরিণতি যাই হোক না কেন, সেগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং তাদের উপর কোন রকম হামলা করা হবে না। মিত্র পক্ষের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিও এ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করে ঘোষণা দিল। লয়েড জর্জ তুরস্কের মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই আশ্বাস পেয়েই ভারতের মুসলমান সৈন্যেরা মেসোপোটেমিয়ায় ও অন্যান্য অঞ্চলে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।

বৃটিশ কূটনৈতিকরা আরবে তুরস্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের প্ররোচনায় মক্কার শরীফ হুসেন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুর্কীদের মেসোপোটেমিয়া থেকে বিতাড়িত করল।

এদিকে ভারতে বৃটিশ বিরোধীদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হতে লাগল। সরকারী নির্দেশে মওলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত 'আল হেলাল' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল এবং মওলানা আজাদকে করাচীতে অন্তরীণ করে রাখা হল। যতদিন যুদ্ধ চলেছিল ততদিন তাঁকে সেখানেই আটক থাকতে হয়েছিল।

মওলানা মহম্মদ আলী তুরস্কের জার্মানির পক্ষে যোগ দেওয়াকে সমর্থন করে তাঁর 'কমরেড' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই অপরাধে সরকারী আদেশে 'কমরেড' পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়ে গেল এবং তাঁকে ও তাঁর ভাই শওকত আলীকে অন্তরীণ করে রাখা হল। যারা হোমরুলের দাবী নিয়ে আন্দোলন করছিলেন, তারাও সরকারী হামলার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন না। হোমরুল আন্দোলনের নেতৃ এ্যানি বেশান্ত ও তাঁর দুজন সহকর্মীকেও এই উপলক্ষে অন্তরীণ করা হয়েছিল।

১৯১৮ সালে যুদ্ধে জার্মানী ও তুরস্কের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। ফলে বিজয়ী পক্ষের বিধান অনুযায়ী সমগ্র আরব সাম্রাজ্য তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে গেল, এমন কি সেখানকার ধর্মস্থানগুলির উপরেও তার কোন অধিকার রইল না।

এই বিষয়ে ইংল্যাণ্ড চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিল। লয়েড জর্জ তাঁর ১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারী প্রদত্ত এক বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এই যুদ্ধে তুরস্ককে তার রাজধানী অথবা তার এশিয়া মাইনরের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি ও থে্রস থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন্ অভিপ্রায় তাদের নেই। কেননা এই অঞ্চলের লোকেরা তুর্কীদের স্বজাতি। কিন্তু ইংরেজদেরই ইঙ্গিতে উৎসাহিত হয়ে গ্রীস এশিয়া মাইনরে স্মার্না অধিকার করে নিল এবং এড্রিয়ানোপোলে প্রবেশ করে এজিয়ানস্ সাগরের দ্বীপগুলিকে গ্রাস করার জন্য সমুদ্র-উপকূলে ছড়িয়ে পড়ল।

এই সমস্ত ঘটনা, বিশেষ করে তুরস্কের খিলাফতের পতনের ফলে ভারতের মুসলমানদের মনে দারুণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য ১৯১৯ সালে ভারতের বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের নিয়ে খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। বোম্বাইয়ের শেঠ সোহানী এর সভাপতি এবং অন্তরীণ-বাস থেকে সদ্যমুক্ত শওকত আলী এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালে ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে প্রথম খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের প্রথম দিনে সভাপতি ছিলেন মওলবী ফজলুল হক। দ্বিতীয় দিন গান্ধীজীকে

সভাপতির আসনে বসানো হয়েছিল। গান্ধীজী সেদিন তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন যে, এই সমস্যার প্রতিকার করতে হলে মুসলমানদের বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগের প:। অবলম্বন করতে হবে।

অতঃপর এই সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য অমৃতসরে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি একত্রে মিলিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ আলোচনা চলে। খিলাফত সম্মেলন ভারতের বড়লাট ও ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য একটি ডেপুটেশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

১৯২০ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খিলাফত কমিটির এক সভায় গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের এক কর্মসূচী প্রদান করেন। কয়েকদিন পরে মীরাটে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে এই কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মওলানা আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং খিলাফত দিবস উদ্‌যাপনের জন্য একটি দিন ধার্য করা হয়। পরবর্তী কয়েক মাসে সারা দেশে এ সম্পর্কে আরও অনেকগুলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বড়লাট ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন প্রেরণ নিষ্ফল বলে প্রতিপন্ন হল। তখন খিলাফত সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারকে জানিয়ে দেয়া হল যে, তাদের দাবী পূর্ণ করা না হলে ১লা আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।

কিন্তু এই আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে হলে খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসকে যুক্তভাবে আন্দোলনে নামা প্রয়োজন। ১৯২০ সালের ২০শে মে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হল। অতঃপর এই উদ্দেশ্যে ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। এই সম্মেলনেও সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, অবশ্য স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যেটাকে এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম চারটি ছিল তুরস্ক

ও মুসলিম জগৎ সম্পর্কিত। শেষ ও পঞ্চম বিষয়টি ছিল ভারতের স্বাধীন রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের সংকল্প।

রাউলাট এ্যাক্ট

খিলাফত সমস্যার পাশাপাশি আরো একটি সমস্যা হিন্দু মুসলমান নির্বিচারে সকল ভারতবাসীর মনে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে চলেছিল। কুখ্যাত রাউলাট এ্যাক্ট এই বিক্ষোভের মূল কারণ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারত এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। এদেশের লোক এ যুদ্ধে ধনবল ও লোকবল যুগিয়ে ইংরেজদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিল। কাজেই যুদ্ধ জয়ের পর এর বিনিময়ে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার লাভ করবে, স্বাভাবিকভাবেই এটা তারা আশা করেছিল। কিন্তু সত্যিকারের রাজনৈতিক অধিকার বলতে যা বোঝায়, তার কোন কিছুই তাদের দেয়া হয় নি। কাজেই দুদিন আগে হোক আর পরে হোক, একটা বিদ্রোহ যে আসন্ন, সে বিষয়ে সরকারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এতদিন যুদ্ধাবস্থায় রচিত ভারতরক্ষা আইনের সাহায্যে বিদ্রোহের যে কোনো চেষ্টাকে অঙ্কুরে চূর্ণ করা গিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতরক্ষার আইনকে আর বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা চলে না। সেক্ষেত্রে আগামী দিনের কঠিনতর পরিস্থিতিকে সাধারণ আইনের সাহায্যে সামলানো সম্ভব হবে না। কাজেই অবিলম্বে ভারতরক্ষা আইনের পরিবর্তে তদনুরূপ অথবা তার চেয়েও কঠোর কোনো আইন তৈরী করতে হবে। এ বিষয়ে তাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দমন করার উদ্দেশ্যে আইন তৈরী করার জন্য পাঁচজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি আইন প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হলো। ইংলণ্ডের হাইকোর্টের জজ মিঃ রাউলাট এই কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। অপর চারজনের মধ্যে দুই জন জজ এবং দু'জন বেসরকারী লোক। দু'জন জজের মধ্যে একজন ইংরেজ ও একজন দেশীয়। বেসরকারী সভ্যদের মধ্যেও একজন ইংরেজ ও একজন দেশীয় লোককে গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই কমিটি পরিকল্পিত আইনটির জন্য যে সমস্ত সুপারিশ করলো, তাতে সারা দেশের লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রথমতঃ সরকারের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক কার্যকলাপের জন্য সাধারণ আইনের ব্যবহার না ক'রে তাদের বিচার যথাসম্ভব দ্রুত শেষ ক'রতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ আদালত ক'রতে হবে। এবং সেই আদালতের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপীল করা চলবেনা। তৃতীয়ত এই সমস্ত মামলার প্রকাশ্যে বিচার কার্য চলবে না। সাক্ষ্যদান সম্পর্কে সাধারণভাবে যে বিধি প্রচলিত আছে, এই সমস্ত আসামী সে অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে খানা তল্লাশ, গ্রেফতার ও জামানত দাবী সম্পর্কে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

এদেশের লোক এটা কল্পনাও ক'রতে পারেনি। এক হাতে ১৯১৯ সালে মন্টেগো চেমসফোর্ড রিফর্ম, অপর হাতে এই স্বেচ্ছাচারমূলক রাউলাট বিল। দ্বিতীয়টির সামনে প্রথমটি একটি প্রহসনে পরিণত হয়ে গেল। দেশবাসী এটা নিঃশব্দে মেনে নিল না দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। কিন্তু সারা দেশের এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে এই বিল আইন পরিষদে গৃহীত হয়ে গেল এবং ১৯১৯ সালের মার্চ মাস থেকে তা কার্যকর হয়ে চলল।

এইভাবে বৃটিশ সরকার ঘুমন্ত বিদ্রোহকে খোঁচা মেরে জাগিয়ে তুলল। যারা সরকারের বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো কথা বলেনি, এবার তারাও চুপ করে থাকতে পারলো না। বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভ্য শঙ্করন নায়ার এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানালেন। উদারনৈতিক নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আইন পরিষদে এই বলে তার বক্তৃতা শেষ করলেন যে, আমি মনে করি, আমরা যদি এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করি, তাহলে আমাদের গুরুতর কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। মুসলিম লীগের চেয়ারম্যান মিঃ জিন্নাহ্ সেদিন আইন পরিষদের সভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, সরকারকে কোনোরকম ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়. তাহলেও আমি এ কথাটাও বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে, এই বিল যদি আইনে পরিণত হয় তাহলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এমন ব্যাপক

অসন্তোষ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হবে, ইতিপূর্বে আপনারা আর কখনো যার পরিচয় পান নি।

এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর মিঃ জিন্নাহ, মদনমোহন মালব্য, মাজহার উল হক এর প্রতিবাদে আইন পরিষদের সভ্য পদে ইস্তফা দান করেছিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশ প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠলেও পাঞ্জাবের সাথে অন্য কোনো স্থানের তুলনা হয় না। যুদ্ধের সময় বহুক্ষেত্রে জোর করে পাঞ্জাব থেকে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এখান থেকে তিন লক্ষ টাকা এবং ষাট হাজার অসামরিক লোককে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফলে এই সমস্ত পরিবারে কাজ করার কোনো লোক ছিল না। কাজ করার লোকের অভাবে অনেক জমিতে কৃষির কাজ বন্ধ ছিল। ফলে অভাব, অসন্তোষ, চুরি ডাকাতি, লুটতরাজ এবং তাদের উপর পুলিশী হামলা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদেশ থেকে বহু পাঞ্জাবী সরকার সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিল। অরডিনান্স প্রয়োগ করে তাদের উপর বেপরোয়াভাবে নির্যাতন চালান হচ্ছিল।

রাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন

রাউলাট এ্যাক্টের সম্পর্কে জিন্নাহ সাহেব যে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, তা যে কতদূর সত্য, বৃটিশ সরকারকে অল্পদিনের মধ্যেই তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়েছিল। পরাধীন ভারতে এই ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে সত্য সত্যই তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

রাউলাট বিল আইনে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই এর বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলনে গান্ধীজী নেতৃত্ব দিয়ে চলেছিলেন। এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে সারা ভারতব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হয়েছিল। অবশ্য পরে এই তারিখটা পিছিয়ে ৬ই এপ্রিল হরতালের দিন ধার্য করা হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে এখন থেকেই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের

শুরু। এই হরতালের আহ্বানে বিস্ময়কর সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। আন্দোলনের উদ্যোক্তারাও বোধ করি এই বিরাট সাফল্যের কথা কল্পনা করতে পারেন নি। এই হরতাল প্রতিপালনের ব্যাপারে ভারতের প্রতিটি নগর এবং গ্রামাঞ্চলে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসেছিল। সারা দেশের মানুষের এই মিলিত প্রচেষ্টা সমগ্র জাতির মনে এক নূতন প্রাণশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করলো।

দিল্লীতে পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী ৩০শে মার্চ তারিখে হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল। এই প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ্ ছিল না। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ এই হরতালের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা, মুসলমানেরা তাদের উপাসনার স্থান জামে মসজিদ্-এ সমবেত মুসলমানদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল। রাজপথে বিরাট শোভাযাত্রার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের যে অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্বের ভাব এবং জনতার যে উত্তেজনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল তা সরকারী কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বল প্রয়োগ ছাড়া এই পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার অন্য কোন পদ্ধতি তাদের জানা ছিল না। পুলিশ শোভাযাত্রাকে বাধা দিয়ে দাঁড়াল এবং লাঠি ও গুলি চালিয়ে শোভাযাত্রাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাইল।

হরতালের দিন স্বয়ং গান্ধীজী বোম্বাইতে উপস্থিত ছিলেন। চৌপাটির সমুদ্র উপকূল থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে সারা নগরের পথে পথে পরিভ্রমণ করল কিন্তু এখানে কেউ তাদের বাধা দেয়নি। কোন দুর্ঘটনাও ঘটে নি। গান্ধীজী ও সরোজিনী নাইডু সেদিন মসজিদ-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর লেখা যে সমস্ত বই-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল, সেই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে প্রকাশ্য রাজপথে বইগুলি বিক্রি করা হচ্ছিল।

কিন্তু আহমেদাবাদ ও গুজরাটে সেদিন খুবই গোলমাল চলেছিল। তবে সবচেয়ে শোচনীয় পরিণতি ঘটলো পাঞ্জাবে।

দিল্লীর দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে গান্ধীজী তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য

দিল্লীতে যাওয়ার উদ্যোগ করেছিলেন কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের আদেশে তার দিল্লী যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল, ফলে তাঁকে বোম্বাইতে থেকে যেতে হলো। এদিকে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই জনরবটা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই জনরব দেশের লোকের মনে বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করলো।

কিন্তু পাঞ্জাবের সঙ্গে অন্য কোন প্রদেশের কোন রকম তুলনা চলে না। গত যুদ্ধের সাহায্যের জন্য পাঞ্জাবকে সবচেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তার উপর পাঞ্জাবের লাট মাইকেল ও'ডায়ারের কুশাসন ও অত্যাচারের ফলে সেখানকার পরিস্থিতি এক মারাত্মক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রদেশের আন্দোলন অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। উত্তেজিত জনতার মারমুখী বিক্ষোভ দেখে সরকারী কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এবং এখানে ওখানে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন থেকে কৃষি-সংকট চলে আসছিল। তার ফলে সারা প্রদেশে নানা রকম হাঙ্গামা ও গোলমাল বেঁধেই থাকত। এই অবস্থায় মানুষের মন হতাশার শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছিল। ঠিক এই সময় গান্ধীজীর আন্দোলনের এই আহ্বান সারা পাঞ্জাব প্রদেশের লোকের মনে যেন বিদ্যুৎ-স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল।

রাউলাট এ্যাক্টের প্রতিবাদে পাঞ্জাবের নানা স্থানে আগে থেকেই সভা সমিতি চলছিল। ৬ই এপ্রিল তারিখে লাহোর শহরে বিরাট সাফল্যের সঙ্গে হরতাল উদযাপিত হলো। তার ফলে গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

১০ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের গুজব শোনার পর লাহোর শহরে ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা করা হয়েছিল। পুলিশ এই শোভাযাত্রার উপর গুলি চালালো। তাছাড়া নানা স্থানে সভা ও জমায়েতের উপরেও গুলি চালানো হয়েছিল। এই ঘটনার পর তিনজন নেতার উপর বহিষ্কারের আদেশ জারী হলো।

অমৃতসরের বিভিষীকাময় কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের

ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এখানে ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই রাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল। সরকারী আদেশে পাঞ্জাবে দু'জন বিখ্যাত নেতা সত্যপাল ও ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলুর প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল।

৬ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসর শহরে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়ে গেল ; কিন্তু সেদিন কোথাও কোন হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গ হয় নি। প্রদেশের নেতাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে গান্ধীজী পাঞ্জাবে আসছিলেন। কিন্তু সরকারী আদেশে তাঁকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। ১০ই এপ্রিল তারিখে সত্যপাল ও ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলুর প্রতি অমৃতসর শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হল।

নেতাদের এই বহিষ্কারের আদেশে অমৃতসর শহরের লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবী নিয়ে এক বিরাট জনতা ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। কিন্তু মিলিটারির লোকেরা তাদের বাধা দিল। উত্তেজিত জনতা এই বাধা মানতে চাইল না। তখন অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে লাগল। ফলে সেখানে বহুলোক হতাহত হল। কিন্তু ক্রুদ্ধ জনতা তাতেও ভয় না পেয়ে মিলিটারির গুলির উত্তরে বৃষ্টিধারার মত ঢিল ছুঁড়তে লাগল। এইভাবে দু'পক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে চলল, যার মধ্য দিয়ে অগ্নিদাহ, লুটপাট ও বহু হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল। ১১ই এপ্রিল তারিখে, অমৃতসর শহরের শাসন-ভার মিলিটারী কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল এবং ব্রিগেডিয়ার ডায়ার এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

সামরিক কর্তৃপক্ষ ১৩ই এপ্রিল তারিখে এই ঘোষণা প্রচার করলেন যে অমৃতসর শহরে কোন সভা বা শোভাযাত্রা করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। শহরের লোকেরা এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে ১৩ই এপ্রিল অপরাহ্নে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভা আহ্বান করল। তাদের এই দুঃসাহস দেখে ডায়ার স্থির করলেন, তিনি এর উচিত শিক্ষা দেবেন, যে শিক্ষা ভবিষ্যৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজ করবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ পার্কটি চারদিকে কয়েকটি বাড়ী দিয়ে ঘেরাও

করা। শুধু একটি মাত্র প্রবেশ পথ। কিন্তু সেই সরু পথ দিয়ে কোনও সাঁজোয়া গাড়ী প্রবেশ করতে পারে না। যথাসময়ে ডায়ার তার সৈন্যদল নিয়ে সেই প্রবেশ পথের সামনে উপস্থিত হলেন। পার্কের ভিতরে কুড়ি-পঁচিশ হাজার লোক শান্তভাবে তাদের নেতাদের বক্তৃতা শুনছিলেন। ডায়ার কোন রকম হুশিয়ারী না দিয়েই তাদের ওপর গুলি চালানোর আদেশ দিলেন। গর্জে উঠল মেশিনগান, অবিরাম গুলিবর্ষণ চলল। পার্কের ভিতর অবরুদ্ধ হাজার হাজার লোক প্রাণ বাঁচাবার জন্য দিশাহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। গুলির আঘাতে শত শত লোক প্রাণ দিল, পায়ের তলায় চাপা পড়ে বহু লোক মারা গেল। চিৎকার ও আর্তনাদে চারদিক ছেয়ে গেল, কিন্তু তখনও গুলিবৃষ্টি চলেছে। সভার স্থানে হতাহতের দেহ স্তূপিকৃত হয়ে উঠল। যতক্ষণ পর্যন্ত গোলা-বারুদ ছিল, ততক্ষণ অবিরাম গুলি চলেছিল। তারপর আহত ও মুমূর্ষুদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখে ডায়ার বিজয়ী বীরের মত সস্থানে ফিরে গেলেন। এই গুলিবর্ষণের ফলে কত লোক হতাহত হয়েছিল, তার সঠিক হিসাব কোনদিন পাওয়া যাবে না।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর অমৃতসর শহরে দু'মাসের জন্য কারফিউ জারি করা হল। তার চেয়ে মারাত্মক কথা, শহরে পানীয় জল ও বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অতি সামান্য অভিযোগেও লোকদের বেত ও চাবুক মারা হচ্ছিল। একটা গলিতে মিস্ শেরউড নাম্নী কোন একজন ইংরেজ মহিলা নাকি সাধারণের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। সেই অপরাধে সেই গলি দিয়ে যারা চলাচল করত তাদের সবাইকে সারা পথ বুকে হেঁটে চলতে হত। এই উপলক্ষে সামরিক আইনের বলে বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে মৃত্যুদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ১৫ই এপ্রিল থেকে ২৯শে মে পর্যন্ত সামরিক শাসনের আমল চলেছিল। এই সময় সারা প্রদেশ জুড়ে অত্যাচার ও লাঞ্ছনার এক বিভীষিকাময় রাজত্ব চলছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ড এবং সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশের উপর নির্মম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করে তুলল। খিলাফতের প্রশ্ন ভারতের মুসলমানদের মনে যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের আগুন জাগিয়ে তুলছিল, পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর ফলে তার উপর যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। খিলাফতের সংকট সমাধানের জন্য গান্ধীজী ভারতের মুসলমানদের সামনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুসলমানদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য এবং তার সঙ্গে শরীক হওয়ার জন্য তিনি ভারতের হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে খিলাফত কমিটি গান্ধীজীর এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। ১৯২০ সালে ৯ই জুন তারিখে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় খিলাফত কমিটি আন্দোলন পরিচালনার জন্য চার পর্যায়ের এক কর্মসূচী প্রণয়ন করল। প্রথমত, সরকারী উপাধি বর্জন ও অবৈতনিক সরকারী পদে ইস্তফা। দ্বিতীয়ত, সরকারের বেসামরিক চাকুরী থেকে পদত্যাগ। তৃতীয়ত, পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের কাজ থেকে পদত্যাগ। চতুর্থত, ট্যাক্স দান বন্ধ করে দেওয়া।

আন্দোলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তোলার জন্য গান্ধীজী, মৌলানা মহম্মদ আলী, শওকত আলী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট হিন্দু মুসলমান নেতারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে হিন্দু মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করে চলেছিলেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে খিলাফত সমস্যা ও পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন করার জন্য গান্ধীজী এক প্রস্তাব আনলেন। বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর এই প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যারা ভোট দিয়েছিল, জিন্নাহ তাদের অন্যতম। ডিসেম্বর

মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ১৫শ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গান্ধীজীর সেই প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়ে গেল। কলিকাতার অধিবেশনে যারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, এবার তারাও এর পক্ষে ভোট দিলেন, একমাত্র জিন্নাহ সাহেব সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

জামায়েত উলেমা হিন্দের নয়শ' জন বিশিষ্ট উলেমা কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে মুসলমানদের জন্য এক ফতোয়া জারি করলেন। এই ফতোয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা নির্বাচন বর্জন, সরকারী স্কুল, কলেজ ও আদালত বর্জন এবং সরকারী উপাধি বর্জনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি পাঞ্জাবের বর্বরতার প্রতিবিধান, খিলাফত সমস্যার সু-সমাধান এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, আন্দোলনের এই তিনটি প্রশ্নে এক-মত হয়েছিল। কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির এই মিলিত আহ্বান ভারতের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এক বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। অতীতে বা ভবিষ্যতে ভারতের এই দুই সম্প্রদায় মিলিত আন্দোলনের ডাকে আর কোন দিন এমনভাবে সাড়া দেয় নি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সার্থক ফলপ্রসূ বলে মনে হলেও আন্দোলনের মধ্যে রাজনীতি ও ধর্মান্ধতার এই মিশ্রণ কোন স্থায়ী সুফল সৃষ্টি করতে পারে নি, বরঞ্চ পরবর্তীকালে তার বিপরীত প্রতি-ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতি-হাসে এটাই সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন কখনই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে নি। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর তার বিপরীত প্রতি-ক্রিয়া মর্মান্তিকভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

অতঃপর স্বরাজ ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলন ১৯২১ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নামে সুপরিচিত। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এই আন্দোলনের আহ্বানে দেশের মানুষ যে এমনভাবে সাড়া দেবে, আন্দোলনের নেতারাও বোধ করি সে কথা কল্পনা করতে পারেন নি। কঠিন দুঃখ বরণ ও আত্মত্যাগের মহিমায় এই আন্দোলন মহিমান্বিত

হয়ে আছে। ইতিহাস তার স্মৃতিকে কতটুকুই বা ধরে রাখতে পেরেছে।

সারা ভারতের হিন্দু মুসলমানদের এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ছয়টি কর্মসূচী অনুসরণ করে পরিচালিত হয়েছিল —১. আইনজীবীদের আদালত বর্জন করতে হবে এবং তার পরিবর্তে শালিসির মারফত বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। ২. সরকারী অথবা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল ও কলেজ বর্জন ও জাতীয় শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা। ৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা। ৪. সরকারী খেতাব ও অন্যান্য সম্মানসূচক পুরস্কার বর্জন করা এবং কোন রকম সরকারী অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া। ৫. বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী শিল্প বিশেষ করে খদ্দর শিল্পের উন্নতি সাধন। ৬. মদ্যপান বর্জন।

এই আন্দোলনের আহ্বানে ভারতের কোটি কোটি হিন্দু মুসলমানের মনে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। মতিলাল নেহরু, সি.আর. দাশ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজাগোপালাচারির মত বিশিষ্ট আইনজীবীরা আদালত বর্জন করে রাজপথে সাধারণের মধ্যে নেমে এলেন। হাজার হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করল। সারা ভারতে সর্বত্র বহু জাতীয় বিদ্যায়তন গড়ে উঠেছিল। সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে হাজার হাজার অহিংস সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করে জেলখানা পূর্ণ করে তুলছিল, শেষকালে তাদের জেলখানায় স্থান দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

গান্ধীজী আশ্বাস দিয়েছিলেন, এই কর্মসূচীকে ষোল আনায় পূর্ণ করতে পারলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করা সম্ভব হবে। এই কর্মসূচীকে ষোল আনায় পূর্ণ করার চিন্তাটা নিতান্তই অবাস্তব কল্পনা। তাছাড়া 'স্বরাজ' বস্তুটি যে কি, তার প্রকৃত ব্যাখ্যাটাও তাঁর কাছ থেকে কখনও পাওয়া যায়নি। দেশের মানুষ কিন্তু স্বরাজ বলতে স্বাধীনতাকে বুঝে ছিল। কিন্তু আন্দোলনের ফলাফল যাই হোক না কেন, এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারত ও ইংলণ্ডে সর্বসাধারণের মনে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে তুলেছিল। ব্যাপকভাবে বিলাতী বস্ত্র বর্জনের ফলেই ইংলণ্ডের ম্যানচেসটার ও ল্যাংকাসায়ারের বস্ত্র শিল্প প্রচণ্ডভাবে ঘা খেয়েছিল। এই বর্জন আন্দোলন যে কতবড় অস্ত্র, এ কথা বুঝতে কারো বাকি ছিল না।

হিজরত আন্দোলন

এই প্রসঙ্গে এই আন্দোলনের একটি উপেক্ষিত অধ্যায় সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা দরকার। ১৯২০ সালের জুন মাসে লক্ষ্ণৌর আবদুল বারি এক ফতোয়া জারি করলেন যে, ভারত দার-উল-হরব অর্থাৎ যুদ্ধেরত দেশ। এখানকার মুসলমানদের স্বাধীনতা লাভের জন্য জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া অবশ্য কর্তব্য। যদি তারা প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ সরকারের মোকাবিলা করতে সমর্থ না হয়, তবে তারা যেন এদেশ থেকে হিজরত করে বাইরে চলে যায় এবং বাইরের মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য নিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। অন্যান্য বিশিষ্ট মওলানারাও এই ফতোয়ায় তাদের সাড়া দিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য এই ফতোয়ার পরিকল্পনার মধ্যে আবদুল বারির নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নাই। আমরা ইতিপূর্বে (স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা) অধ্যায়ে দেখেছি যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ্-র পুত্র ও শিষ্য আবদুল আজিজ ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে যে ফতোয়া জারি করেছিলেন, এটা তারই প্রতিলিপি মাত্র। আবদুল বারির এই ফতোয়া জারি করার ফলে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে এক অদ্ভুত উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ এই অকল্পনীয় উন্মাদনাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

এই ফতোয়ার নির্দেশকে মান্য করে শুধুমাত্র সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে প্রায় ১৮,০০০ মুসলমান তাদের ঘরবাড়ী, পরিবার পরিজনদের মায়া ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়ার জন্য দেশ থেকে হিজরত করে বাইরে চলে গিয়েছিল। তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণাও তাদের ছিল না। তারা আশা করেছিল, বাইরের মুসলমান রাষ্ট্রগুলো তাদের সাহায্য করতে সাগ্রহে এগিয়ে আসবে। কিন্তু ভারত ছেড়ে আফগানিস্তানে যাওয়ার পর তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে গেল। অবশেষে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগের পর তাদের ব্যর্থকাম হয়ে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ভিটে-মাটি বিক্রি করে চলে গিয়েছিল। কাজেই দেশে ফিরে এসেও তাদের

দুর্দশার সীমা ছিল না। তাদের এই হিজরতের আন্দোলন মহাজের আন্দোলন নামে পরিচিত।

সীমান্ত প্রদেশের বাদশা খান নামে সুপরিচিত আবদুল গফ্ফার খানও এই আন্দোলনে দেশ ছেড়ে কাবুলে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তরুণ গফ্ফার খান তখনও রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করেন নি, মূলতঃ ধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আত্ম-জীবনীতে তিনি সেই হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীর দুঃখ দুর্দশা ও আত্মত্যাগের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা আজ আমাদের কাছে হাস্যকর বলে মনে হতে পারে কিন্তু তাই বলে তাঁদের স্বদেশপ্রীতি, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগকে ছোট করে দেখার কোনই কারণ নেই। দুঃখের বিষয়, ভারতের কি মুসলমান কি হিন্দু খুব কম লোকই এই মহাজের আন্দো-লনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত।

মোপলা বিদ্রোহ

মোপলা বিদ্রোহ অসহযোগ আন্দোলনের এক বীরত্বপূর্ণ এবং বিয়োগাত্মক করুণ অধ্যায়। যারা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোপলা বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আখ্যা দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটা কি তাই? এই-টাই কি মোপলা বিদ্রোহের যথার্থ স্বরূপ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে মোপলাদের ইতিহাসটা ভালভাবে জানা দরকার।

প্রায় হাজার বছর আগে এই মোপলাদের পূর্বপুরুষরা আরব দেশ ত্যাগ করে ভারতের কেরালা প্রদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এ যুগের মোপলাদের অধিকাংশই দরিদ্র চাষী, অল্প সংখ্যক লোক ছোটখাট ব্যবসা করে পেট চালায়। এই দরিদ্র মোপলা চাষীদের নিজস্ব জমি বলতে কিছুই ছিল না, এরা কেরালার ভূস্বামীদের জমিতে কাজ করত। তাদের অসহায়-তার সুযোগ নিয়ে সেই ভূস্বামীরা তাদের উপর নিষ্ঠুর শোষণ চালিয়ে নিজে-দের সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলত। যুগের পর যুগ ধরে এই রীতিই চলে

আসছিল। তাদের এই শোষণ ও অত্যাচারের কথা সরকারী কর্মচারীদের অজানা ছিল না, কিন্তু বৃটিশ সরকার চিরদিন এই ভূস্বামীদের পক্ষ সমর্থন করে এসেছে। কেননা এই ভূস্বামীরাই ছিল তাদের শাসন ব্যবস্থার স্তম্ভ-স্বরূপ। কোন কোন সহৃদয় সরকারী কর্মচারী এদের এই অত্যাচারের কথা এবং এর আশঙ্কাজনক পরিণতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেন নি।

এই অসহায় মোপলা চাষীরা যুগের পর যুগ ধরে এইভাবে পড়ে পড়ে মার খেয়েছে। কিন্তু অবস্থা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত, তখন এরাও মাঝে মাঝে মরিয়া হয়ে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইত। এই বিদ্রোহ করার ন্যায্য অধিকার তাদের ছিল, কিন্তু এই বিদ্রোহকে সুসংগঠিত রূপ দেবে, এমন নেতৃত্ব তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে নি। মোপলারা ধর্মে মুসলমান। থঙ্গল নামে অভিহিত কাজি বা মৌলবীরা ছিল এদের ধর্মীয় নেতা। নেতা বলতে তারা তাদেরই জানত। এই থঙ্গলদের নেতৃত্বে তারা মাঝে মাঝে এই অত্যাচারী ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। কেরলের মালাবারে মোপলা অধ্যুষিত অঞ্চলে এমন বহু ছোট ছোট বিদ্রোহ ঘটে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের হাতে দু'চারজন ভূস্বামীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভূস্বামীরা সশস্ত্র পুলিশের সহায়তায় এই খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহগুলিকে চূর্ণ করে দিয়েছে।

থঙ্গলদের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ এক অদ্ভুত আত্মঘাতী রূপ নিয়েছিল। থঙ্গলদের ডাকে এই দরিদ্র, অজ্ঞ ও ধর্মোন্মাদ দুর্ভাগা মানুষগুলির মধ্য থেকে ২০ থেকে ৩০ জনের মত এক একটি দল ধর্মযুদ্ধের শপথ নিয়ে অত্যাচারী ভূস্বামীদের উপর আক্রমণ চালাত। লাঠি, বর্শা, তরোয়াল ইত্যাদি সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই এরা লড়াইয়ে নামত। এই অস্ত্র নিয়েই তাদের পুলিশের রাইফেলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হত। এ এক বিচিত্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরিণতি কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধারা পুলিশের গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও পৃষ্ঠভঙ্গ দিত না বা আত্মসমর্পণ করত না, আমরণ তাদের লড়াই চালিয়ে যেত।

মোপলারা মুসলমান আর ভূস্বামীরা সবাই হিন্দু। কাজেই এই সংঘর্ষ-

গুলি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হিসাবেই প্রচারিত হয়ে আসছিল। কিন্তু যে সমস্ত অভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারী এর প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন যে এগুলি শ্রেণী সংগ্রামেরই বিকৃত রূপ। প্রকৃত নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাবের ফলে এই ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহ প্রচেষ্টা আত্মঘাতী সংঘর্ষে পরিণত হয়ে চলেছিল।

দীর্ঘকাল ধরে মোপলা চাষীদের মধ্যে এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভের চাপা আগুন ধূমায়িত হয়ে চলেছিল। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে খিলাফত ও স্বরাজ লাভের আন্দোলনের প্রচার বাণী তাদের কাছেও এসে পৌঁছাল। আন্দোলনের প্রচারকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাদের মধ্যে ২ জন হিন্দু ও ২ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করা হল। এখান থেকেই মোপলা জাতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। গ্রেফতারের ফলে সাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। এর প্রতিবাদে স্থানে স্থানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। জনতার এই বিক্ষোভ শান্তি-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাতে পারে, এই আশঙ্কায় সরকার এই আন্দোলনকে কঠিন হস্তে দমন করে দিতে চাইল।

সরকারের এই আক্রমণ মোপলারা নিঃশব্দে মাথা পেতে নিল না। তারা পুলিশের বন্দুক ও রাইফেলের বিরুদ্ধে বর্শা ও বল্লম নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাল। কিন্তু এবার আর আগেকার দিনের মত খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন লড়াই নয়, সারা ভারতব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের আহ্বান তাদের মধ্যে এক নূতন উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল। তার সঙ্গে খিলাফতের ধর্মীয় প্রেরণাও কাজ করে চলেছিল। হাজার হাজার মোপলা এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রবলতর সরকারী শক্তির বিরুদ্ধে জনতার এই সংগ্রাম স্বাভাবিকভাবেই গেরিলা যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। অহিংসার আদর্শের তাৎপর্য বোঝার মত শক্তি তাদের ছিল না। তারা পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ চালাল, কিছু কিছু হিন্দুও তাদের এই আক্রমণের শিকার হয়েছিল। সরকারের কাছে এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার, সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা কিছুকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।

অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্য সরকারকে সৈন্য বাহিনী তলব করতে হল। বিদ্রোহকে নিঃশেষে দমন করে দেয়ার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সমগ্র অঞ্চলে সামরিক আইন জারী হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে সহজে দমন করা সম্ভব হয় নি। শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পুরো একটি বছর কেটে গিয়েছিল।

এই বিদ্রোহের পিছনকার মূল কারণ কি, সরকারী মহলেও সে সম্পর্কে মতবিরোধ ছিল। দরিদ্র মোপলা কৃষকদের উপর দীর্ঘকাল ধরে যে অর্থ-নৈতিক শোষণ চলে আসছিল, সেটা যে এর একটা কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। তবে সরকারের অভিমতে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের যে উত্তেজনা এর জন্য মূলত দায়ী পুলিশের অত্যাচার, নেতাদের গ্রেফতার, রাজা গোপালাচারী ও ইয়াকুব হাসানের মত নেতাদের এই অঞ্চলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়া। তদুপরি খেলাফত আন্দোলনের ধর্মীয় উন্মাদনা এই উত্তেজনাকে আরো ব্যাপক ও গভীর করে তুলেছিল।

বিক্ষুব্ধ জনতা উত্তেজনার মুহূর্তে যে হিংসাত্মক কার্য করেছিল, সুসভ্য সরকারের বর্বর অত্যাচার তার সীমাকেও ছাড়িয়ে গেল। নেপাল, গাড়োয়াল ও বার্মা থেকে সৈন্যদের আনা হয়েছিল। এই অঞ্চলের মানুষ তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কাজেই তাদের মনে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি বা মায়া-মমতার লেশমাত্র ছিল না। বিদ্রোহীদের মধ্যে ২২২৬ জন লোক প্রাণ দিয়েছিল, ১৬১৫ জন লোক আহত হয়েছিল। তাছাড়া ৫৬৮৮ জন বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ৩৮,২৫৬ জন আত্মসমর্পণ করেছিল।

কিন্তু সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনা হচ্ছে এই যে, ১৫০ জন বন্দীকে একটি মালগাড়ীর ওয়াগনে ভর্তি করে কালিকট থেকে মাদ্রাজে পাঠানো হয়েছিল। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের অগ্নিদাহে এই মালগাড়ী ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছিল, এই গাড়ী যখন মাদ্রাজে এসে পৌঁছল, তখন সেই ওয়াগনটি খুলে দেখা গেল, আটক বন্দীদের মধ্যে ৬৬ জন ইতিপূর্বেই প্রাণ হারিয়েছেন। অবশিষ্ট যারা, তাদের অবস্থাও দুর্দশার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে।

এ এক বিস্ময়কর কথা, এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী পৃথিবীর লোকের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে। পৃথিবীর কথা কেন, আমাদের দেশের ক'জন লোকই বা এর খবর রাখে! বন্দী মোপলাদের মধ্যে বহু লোককে আন্দামানে পাঠান হয়েছিল, তাদের বংশধররা আজো আন্দামানের অধিবাসী হয়ে আছে।

আন্দোলন প্রত্যাহার এবং প্রতিক্রিয়া

সরকার খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে চূর্ণ করে দেওয়ার জন্য কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে চলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্দোলন স্তিমিত হওয়া দূরে থাক, তা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ক্রমশ.প্রবলতর হয়ে উঠছিল। সরকারের নির্বিচার দমননীতির প্রতিবাদে গান্ধীজী বাদৌলীতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ঠিক এই সময় এক মহা বিপর্যয় ঘটল। জনগণের উত্তেজনা ও বিক্ষোভের উত্তাপ কোন মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছিল, এই ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটা ঘটেছিল, ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরি-চৌরা শহরে। এই শহরে একটা শোভাযাত্রার সঙ্গে একদল পুলিশের সংঘর্ষ ঘটেছিল। ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য পুলিশ শেষ পর্যন্ত থানার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। জনতা তাতেও নিবৃত্ত না হয়ে আগুন লাগিয়ে সেই থানা ভস্মসাৎ করে দিল। থানার মধ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নি।

অহিংসার নীতিতে দৃঢ় আস্থাবান গান্ধীজীর মনে এই ঘটনা এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তিনি অবিলম্বে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে নেবেন বলে স্থির করলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল, কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সকলেই যে এ বিষয়ে একমত ছিলেন তা নয়। কারাগারের ভিতর থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ক্রুদ্ধ হয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে পাঠিয়েছিলেন। আন্দোলন প্রত্যাহার

করে নেয়ার এই প্রস্তাবের পরিণতি হিসাবে পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। খিলাফত আন্দোলনের নেতারাও অনুরূপভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একদল অসহযোগ আন্দোলন এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে ফেলে সরকারের অনুগ্রহ লাভের আশায় ঝুঁকে পড়ল। অপরদল গান্ধীজীর নেতৃত্বকে মান্য করে চলল।

এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে সারা দেশের লোকের মন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। আন্দোলন থেমে গেল বটে, কিন্তু ঘটনা প্রবাহের গতি সেখানেই থেমে গেল না। এই হতাশ ও পরাজিত মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের দুর্বল স্থানগুলি নগ্নভাবে প্রকট হয়ে উঠল। খেলাফত আন্দোলন মূলত ধর্মীয় আন্দোলন। গান্ধীজীও বহু সমস্যাকে ধর্মীয় দৃষ্টি নিয়ে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতির এই জগাখিচুড়ি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চরম দুর্বলতা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে, জাতীয় আন্দোলনের এই অধ্যায়েও এই সত্যটি বড় কঠিনভাবে প্রকট হয়ে উঠল। আন্দোলন ও জাতীয় ঐক্যে আস্থা হারিয়ে ফেলার ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে। ভারতের বিখ্যাত বামপন্থী নেতা লালা লাজপৎ রায় এ সময় কংগ্রেস ছেড়ে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলু সাময়িকভাবে হলেও রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করে আজিম ও তবলিগের কাজ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাম্প্রদায়িতার বিষ-হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনকে জর্জরিত করে তুলেছিল, তারই পরিণতি হিসেবে অভুতপূর্ব মিলিত আন্দোলনের পরক্ষণেই দেশের স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাদের কুৎসিত ও ভয়াবহ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মওলানা মহম্মদ আলী

মওলানা মহম্মদ আলী স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে সু-পরিচিত। একথা সত্য যে, প্রধানতঃ ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপসংহারে তুরস্কে খিলাফত এর পতনের ফলে সারা ভারত-ব্যাপী যে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল, মওলানা মহম্মদ আলীকে তার অগ্রনায়ক বলা চলে। ১৯২১ সালে খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেস সম্মিলিতভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল। সে সময় তিনি একই সঙ্গে খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। এই আন্দোলনে ভারতের মুসলমানদের উপর তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক কারণে রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ থেকে দূরে সরে গেলেও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মওলানা মহম্মদ আলী ১৮৭৮ সালে দেশীয় রাজ্য রামপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি সারা প্রদেশে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। বি. এ. পাশ করার পর তিনি আই. সি. এস. পড়ার জন্য লণ্ডনে গিয়ে-ছিলেন, কিন্তু এই পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হতে পারেন নি। এরপর তিনি পুনরায় লণ্ডনে যান এবং অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন।

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে তিনি রামপুর স্টেটের চীফ এডুকেশন অফিসারের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে তিনি কিছুদিন বাদেই সে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তাঁর বড় ভাই শওকত আলীর কাছে চলে গেলেন। শওকত আলী সে সময় সরকারী আফিম

বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মওলানা মহম্মদ আলীর বেকার জীবনের দুটি বছর তাঁর আশ্রয়েই কাটল। শওকত আলী তার ভাইকে সকল বিষয়েই সাহায্য করে এসেছেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন তাঁর সহকর্মী।

এরপর তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদায় আবগারী বিভাগে চাকুরী নিলেন। এখানকার কাজেই তিনি সর্বপ্রথম তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু খুবই সুনামের সঙ্গে কাজ সফল করা সত্ত্বেও এক বিশেষ কারণে তিনি সেই কাজে সাত বছরের বেশী টিকে থাকতে পারেননি। এই চাকুরীতে ঢোকার কয়েক বছর পর থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে আসছিলেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ বিশেষ করে বোম্বাইয়ের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ায়' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভবিষ্যতে তিনি যে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবেন এই লেখাগুলোর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিলেন।

এই সমস্ত লেখায় তিনি নির্ভীকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। ব্যাপারটা বরোদা রাজ্যের সরকারের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বাধ্য হয়ে তাঁর প্রতি এই নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর লেখাগুলি কাগজে পাঠাবার আগে সেগুলি প্রকাশযোগ্য কিনা তা স্থির করার জন্য স্থানীয় সরকারকে দেখিয়ে নিতে হবে। তেজস্বী মহম্মদ আলী এই শর্তে রাজী হলেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন। কিন্তু বরোদা সরকার তাঁর এই পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ না করে এ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে তাঁকে দুই বছরের জন্য বিনা বেতনে ছুটি দিলেন। মওলানা মহম্মদ আলী কিন্তু তাঁর সংকল্পে দৃঢ় রইলেন। এই সময় আরও কয়েকটি দেশীয় রাজ্য তাঁর কাছে চাকুরীর প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে সাংবাদিকতাকে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ করলেন।

অনেকদিন থেকেই তিনি যে স্বপ্ন দেখে আসছিলেন, এবার তা বাস্তবে রূপ নিল। ১৯১১ সালে তিনি কলকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক কমরেড'

পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই সাপ্তাহিক কমরেড উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। এর মধ্য দিয়ে মওলানা মহম্মদ আলী সাংবাদিক হিসাবে সু-প্রতিষ্ঠিত হলেন। এর এক বছর বাদেই ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে 'সাপ্তাহিক কমরেড' 'দৈনিক কমরেড'-এর রূপ নিয়ে দিল্লী থেকে আত্মপ্রকাশ করল। কমরেড যতদিন পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল ততদিন তার কারো বিরুদ্ধে কোনও রকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা ছিল না। কিন্তু এবার বৃটিশ সরকার তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। বৃটিশ সরকার যতদিন মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে তুরস্কের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আক্রমণমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে আসছিল, দৈনিক কমরেড তার সম্পাদকীয় ও অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে লাগল।

ভারত সরকার ১৯১৫ সালে ভারতীয় প্রেস অ্যাক্ট অনুসারে এই পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। ১৯২৪ সালে এই পত্রিকাটিকে আবার প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু মওলানা মহম্মদ আলী তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য এবং নানা রূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন বলে এই পত্রিকাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিতে পারতেন না। তাঁর পরিবর্তে কাজ করার মত উপযুক্ত সহকারী সম্পাদকও ছিল না। ফলে এই নতুন পর্যায়ের দৈনিক কমরেড পত্রিকা দুই বছরের বেশী টিকে থাকতে পারে নি।

দিল্লীতে চলে আসার পর ১৯১৩ সালে তিনি দৈনিক কমরেডের পাশাপাশি 'হামদর্দ' নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজী পত্রিকাটির মত এই উর্দু পত্রিকাটিও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল এবং তার চাহিদাও ছিল প্রচুর। কিন্তু নানারূপ প্রতিবন্ধকতার দরুণ 'হামদর্দ' পত্রিকাটিকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকাটি মাঝে মাঝে অ-নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছিল।

মওলানা মহম্মদ আলী তার জ্বালাময়ী লেখনী ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকারের ভারত ও মুসলিম বিশ্ব-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে অবিরাম কষাঘাত করে চলেছিলেন। ফলে সরকারের নির্দেশে তাঁকে

গ্রেপ্তার করে দিল্লীর নিকটবর্তী মেহেরোলিতে অন্তরীণ করে রাখা হল। পরে তাঁকে সেখান থেকে মধ্য প্রদেশের ছিন্দওয়ারাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এখানে তিনি ১৯১৯ সালের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আটক ছিলেন। ছিন্দওয়ারা থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর সাংবাদিক মওলানা মহম্মদ আলী জাতীয় নেতা মওলানা মহম্মদ আলীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তারপর থেকে নানারূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে। এজন্য বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

মওলানা মহম্মদ আলী মুসলমানদের নেতা হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। বৃটিশ সরকার মুসলিম বিশ্বের প্রতি যে আক্রমণ-মূলক নীতি গ্রহণ করে চলেছিল, তার বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমানদের জনমতকে জাগ্রত করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু ছিন্দওয়ারা থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর তিনি নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন —ভারতের বৃটিশ সরকারের শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে না পারলে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পেঁছুতে পারবেন না। ফলে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং অচিরেই কংগ্রেসের অন্যতম জাতীয় নেতা হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এই উপলক্ষে তিনি মহাত্মা গান্ধীর গভীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর অনু-রোধেই গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। অপরদিকে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই ভারতের মুসলমানরা গান্ধীজীকে তাঁদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এসেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় যাতে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের সম্পর্ককে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে সেজন্য মওলানা মহম্মদ আলী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই চেষ্টা সার্থক হয়নি একথা সত্য কিন্তু একেবারে ব্যর্থও হয়নি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে একদল ছাত্র ও অধ্যাপক আলী-গড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে বেড়িয়ে এসেছিলেন। ১৯২০ সালেই এঁদের নিয়ে গঠিত হয়ে উঠল আলীগড়ের নতুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

'জামিয়া মিলিয়া ইসলামীয়া'। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। মওলানা মহম্মদ আলী এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। নানারূপ কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়ে থাকার ফলে এই দায়িত্ব বহন করে চলতে না পারলেও তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিলেন।

মওলানা মহম্মদ আলীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি যা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, সেই সমস্ত প্রশ্নে কারো সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপোষ করতে রাজী হতেন না। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও বিরোধের বিষাক্ত আবহাওয়া সারা দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। তার ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এক কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জাতীয় আন্দোলনের বীর সংগ্রামী মওলানা মহম্মদ আলী সাম্প্রদায়িকতার শিকারে পরিণত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অথচ এই কংগ্রেসকে ইতিপূর্বে তিনি তাঁর জীবনের অবিভাজ্য অংশ বলে বিবেচনা করতেন এবং একবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি অত্যন্ত করুণ। যে মওলানা মহম্মদ আলী একদিন ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিলেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত প্রান্তে এসে তিনি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। শুধু কংগ্রেস নয়, দেশের অন্যান্য মুসলিম সংগঠনগুলির মধ্যেও তিনি তাঁর প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে একেবারে নির্বাসিত হয়ে পড়েছিলেন। তার উপর কঠিন বহুমূত্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি দিনের পর দিন তাঁর জীবনীশক্তি হারিয়ে চলেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রচেষ্টা ছাড়েন নি। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই তিনি ১৯৩০ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। সে সময় তিনি গুরুতর-ভাবে অসুস্থ ছিলেন। এমনি অবস্থায় এই বিদেশ যাত্রার বিপজ্জনক পরিণতি ঘটতে পারে তা জানা সত্ত্বেও তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান

করেছিলেন। কেননা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, অন্যান্য যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন, তাঁদের মধ্যে কেউ আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে এখানকার মুসলমানদের সত্যিকারের দাবীগুলিকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করবেন না।

গোল টেবিল বৈঠকে তাঁর শেষ বক্তৃতায় তিনি এই অবিস্মরণীয় ঘোষণা-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ভারত যদি মুক্তিলাভ না করে, তাহলে তিনি আর জীবিত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে যাবেন না। তাঁর সেই কথা যে এমনভাবে সত্য হবে সেদিন কে তা' ভাবতে পেরেছিল। এই বক্তৃতার দু'একদিন বাদেই ১৯৩১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে তিনি তার এই ঘোষণা-বাণীকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর দেহ মুসলমানদের পবিত্র স্থান জেরুজালেমে সমাহিত করা হয়েছিল।

ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলু

পাঞ্জাবের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলু ১৮৮৮ সালে অমৃতসর শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কলেজ জীবন কেটেছিল আগ্রা ও আলীগড়ে, আলীগড় কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ইউরোপে যান। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি· এ· ডিগ্রী এবং জার্মানী থেকে পি· এইচ· ডি· ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া তিনি লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

১৯১৫ সালে ইউরোপ থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর তিনি অমৃতসর শহরে ব্যারিস্টার হিসাবে আইন-ব্যবসা শুরু করলেন। এই সময় তিনি শহরের বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে তিনি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন, তার ফলে তিনি অমৃতসর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তাঁর অক্লান্ত কর্মশক্তি শুধু মাত্র সমাজহিতকর কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। তারই সাথে সাথে তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপেও অংশগ্রহণ করে চলেছিলেন এবং পরে সেটাই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সু-পরিচিত হয়ে উঠলেন। পাঞ্জাব প্রদেশে যাঁরা কংগ্রেসকে সংগঠিত করে তুলেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯১৯ সালে তিনি অমৃতসর শহরে কুখ্যাত 'রাউলাট এ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি করাচীতে এক মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দেশীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি দিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি লাভের পর

তিনি নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে তিনি ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তিনি কিছুকালের জন্য দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রদেশের সভাপতি হিসাবেও কাজ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে লাহোরে ভারতীয় কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তখনকার দিনে কিচলু বক্তা হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করে তুলত। এই কারণে তাঁর সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের মনে একটা আতঙ্কের ভাব ছিল। সেজন্যই যখন তাঁর রাজনৈতিক জীবন সবেমাত্র শুরু হয়েছে, সেই সময় বাংলার সরকার তাঁর বাংলায় প্রবেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। ১৯১৯ সালে তাঁর উপর এই মর্মে এক নির্দেশ জারি হয়েছিল যে, তিনি কোনও জনসভায় বক্তৃতা দিতে পারবেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তাঁকে বহুবার জেল খাটতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের চৌদ্দটি বছর তিনি জেলখানাতেই কাটিয়েছিলেন।

গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর দেশবাসীর মন হতাশা ও অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সময় ভারতে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে নানারূপ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে এই চিন্তাটা পেয়ে বসে যে, দেশের সত্যিকারের কল্যাণ করতে হলে প্রথমে নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়াটা একান্ত প্রয়োজন। এই ধরনের চিন্তার ফলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 'হিন্দু সংগঠন'-এর কার্যে তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ রাজনীতির পথ থেকে দূরে সরে এসে শুদ্ধির কাজ নিয়ে মেতে গেলেন। ডঃ কিচলুর রাজনৈতিক জীবনেও এর অশুভ প্রভাব এসে ছায়াপাত করেছিল। তিনিও সাময়িকভাবে জাতীয় আন্দোলনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মুসলমানদের মধ্যে 'তাঞ্জিম ও তবলীগ'-এর ধর্মীয় আন্দোলনে মগ্ন হয়ে রইলেন। প্রায় দুই বছরকাল এই ধর্মীয় আন্দোলনের রাহুগ্রাস তাঁকে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

সাময়িকভাবে বিচ্যুতি ঘটলেও ডঃ কিচলু শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কক্ষপথে ফিরে এসেছিলেন। যে সময় তিনি 'তাঞ্জিম' ও 'তবলীগ'-এর ধর্মীয় আন্দোলনে মগ্ন হয়েছিলেন, তখনও তাঁর বিরুদ্ধে কেউ সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনতে পারে নি। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে কখনও তাঁর বিচ্যুতি ঘটে নি। রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন চরমপন্থী। তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তৃতাতেই তিনি স্পষ্টভাবেই এই অভিমত প্রকাশ করতেন যে, ভবিষ্যতে কৃষক ও শ্রমিকরাই হবে এদেশের প্রকৃত মালিক।

ডঃ কিচলু সব সময় এই অভিমত প্রকাশ করে এসেছেন যে, অর্থনৈতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলে এ দেশের উন্নতি কখনই হতে পারবে না। লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে ভাষণ-দান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "বৃটিশ সরকারের শাসনাধীনে কি পেয়েছি আমরা? পেয়েছি চরম দারিদ্র, বেকার জীবন, দুর্বহ ঋণের বোঝা, মহামারী, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ অনাহার আর মৃত্যুর অভিশাপ। বন্ধুগণ, আমাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি গৌণ, আমাদের মূল সমস্যা অর্থনৈতিক। কিন্তু এই অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন করতে হলে আমাদের ভাগ্যকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।"

ভারতের কোনও কোনও জাতীয়তাবাদী নেতা স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন। কিন্তু ডঃ কিচলু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল এই যে, ভারতকে একান্তভাবে তার নিজের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তিনি বলতেন, "পৃথিবীর অন্যান্য যে সমস্ত জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে, তা তাদের নিজেদের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে এবং আমরা এ পর্যন্ত রাজনৈতিক যে সমস্ত বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছি, তাও আমাদের নিজেদেরই চেষ্টার ফল। আত্ম-নির্ভরশীলতা, আত্ম-বিসর্জন এবং দুঃখ দুর্দশাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়াই স্ব-রাজ লাভের একমাত্র পথ।"

গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই একথা বলতেন, "আমরা যখন

এগিয়ে চলেছি তখন পিছনে হটে যাবার কোন কথাই উঠতে পারে না। যতদিন আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুতে না পারি, ততদিন আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে, 'এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!"

ডঃ কিচলু কোনদিনই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে পণ্ডিত জহরলাল কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করে-ছিলেন। ডঃ কিচলু এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন চরম পর্যায়ে উঠেছিল। সে সময় ডঃ কিচলু দেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে দেশবিভাগের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে প্রচারের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বারবার এই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগের দেশ বিভাগের এই দাবীকে যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতা-বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অবশ্য তাঁর এই চেষ্টার ফলে দেশ বিভাগকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর জন্মভূমি ভারতেই থেকে গিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে নানাদিক দিয়েই তাঁর মতভেদ ঘটেছিল। তাঁর জীবনের শেষ কুড়িটি বছর তিনি সাম্যবাদের দর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ফলে কংগ্রেসের নেতারা তাঁকে আর তাঁদের আপনজন বলে মনে করতেন না। অবশেষে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার ফলে তিনি শীঘ্রই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে সু-পরিচিত হয়ে উঠলেন।

ডঃ কিচলু ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সোভিয়েত সরকার তাঁর প্রশংসনীয় কাজের জন্য তাঁকে সম্মান-জনক পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছিলেন।

ডাঃ মুখতার আহ্মদ আন্সারী

ডাঃ আন্সারী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সর্বজন পরিচিত নেতা। তাঁর পুরো নাম ডাঃ মুখতার আহ্মদ আনসারী। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বাইরে থেকে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় থেকেই তাঁরা সরকারের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে বিশিষ্ট পদ অধিকার করে এসেছেন। ডাঃ আনসারী ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান বর্তমান উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার ইউসুফপুর গ্রামে। ডাঃ আনসারী তাঁদের পরিবারের অন্যান্যদের মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করার পরই তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য নিজাম সরকারের বৃত্তি পেয়ে লণ্ডনে চলে গেলেন। সেখানে তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং পর্যায়ক্রমে এল. আর. সি. পি, এম. আর. সি. এস., এম. ডি. এবং এম. এস. ডিগ্রী লাভ করেন। সর্বশেষ পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁর এই কৃতিত্বের ফলে তাঁকে লণ্ডনের লক্ হাসপাতালের রেজিষ্ট্রার-এর পদে নিয়োগ করা হয়। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনি এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

এরপর তিনি চ্যারিংক্রস হাসপাতালে ইংলণ্ডের রাজার অবৈতনিক চিকিৎসক ডাঃ বয়েড-এর পরিচালনাধীনে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। এই হাসপাতালে ডাঃ আনসারী শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সারা ইংলণ্ডে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে এই হাসপাতালে 'আনসারী ওয়ার্ড' নামে একটি ওয়ার্ড খোলা হয়েছিল।

ডাঃ আনসারী চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেও সেটাই তাঁর প্রধান পরিচয় নয়, আমাদের কাছে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে সুপরিচিত। লণ্ডনে থাকতেই ভারতের কয়েকজন রাজনৈতিক

নেতার সংস্পর্শে এসে তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। এই সময় তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খান ও তরুণ জহরলালের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

ডাঃ আনসারী ১৯১০ সালে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে এলেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ইতিমধ্যেই এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি দেশে আসার সাথে সাথে তাঁকে লাহোর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্বাধীনভাবে দিল্লীতে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করলেন। ১৯২২ সালে তিনি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আসরে নামলেন। সে সময়ে ইউরোপে বলকান যুদ্ধ চলছিল। এই বছরেই ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধরত আহত তুর্ক সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য তিনি 'আনসারী মেডিকেল মিশন' পরিচালনা করে-ছিলেন। একটা কথা উঠতে পারে, এই মিশন একমাত্র মুসলমানদের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল এবং বিদেশের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাই ছিল এই মিশনের লক্ষ্য। তাহলেও একথাটা স্মরণ রাখা দরকার এই মিশন পরিচালনার মধ্য দিয়ে ভারতের জনগণ এইবারই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল।

ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সময়। রাজনৈতিক মতামত ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ আর কোনদিন পরস্পরের এত কাছাকাছি আসেনি। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের সদস্যরা নিজ নিজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে একই রকম ভাষণ দিতেন, একই সুরে কথা বলতেন। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে একই লোক একই সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভ্য হিসাবে কাজ করে গেছেন। সে বিষয়ে তাদের কোনই বাধা পেতে হত না। এই রকম রাজনীতির পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ১৯১৬ সালের 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মধ্যে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। এই চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ডাঃ আনসারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই চুক্তি আপাত দৃষ্টিতে সদ্ভাবসম্পন্ন এবং উভয় সম্প্র-দায়ের মধ্যে সম্প্রীতিসূচক বলে মনে হলেও এর মধ্যে মারাত্মক বিপদের

বীজ নিহিত ছিল। কেননা এইবারই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সর্বপ্রথম পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে মেনে নিল, যার জন্ম ভবিষ্যতে তাকে এবং দেশবাসীকে অতি কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে।

ডাঃ আনসারী ১৯১৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর সভাপতির ভাষণে তিনি খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ভারতের স্বাধীনতার জন্ম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন দাবী জানান। ফলে তাঁর এই সভাপতির ভাষণ সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

তখনকার দিনে আরো অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মত ডাঃ আনসারীও মুসলিম লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেজন্য তাঁদের জাতীয়তাবাদের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি চিরদিন কংগ্রেসী নেতা হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছেন। ১৯২০, ১৯২২, ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩১ ও ১৯৩২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলিতে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তাছাড়া ১৯২৭ সালে তিনি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২৪ সালে গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর দেশবাসী তাদের ভবিষ্যতের চলার পথ সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। এই অবসাদময় মুহূর্তে জড়তা কাটিয়ে তোলবার জন্ম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অধিকাংশ কংগ্রেসীদের সমর্থনে কংগ্রেসের মধ্যেই স্বরাজ পার্টি গঠন করে তুললেন। এই পার্টির উদ্দেশ্য ছিল আইন সভায় প্রবেশ করে পদে পদে সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা করা। কিন্তু গান্ধীজী ও তার অনুবর্তীরা এই নীতির বিরোধী ছিলেন। তারা আপাততঃ সরকার-বিরোধিতার মঞ্চ থেকে সরে এসে দেশের লোকের মধ্যে গঠনমূলক কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। এদের বলা হত 'নো চেঞ্জার'। ডাঃ আনসারী এই নো চেঞ্জার দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে এক বিষয়ে ডাঃ আনসারীর একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। চিকিৎসক হিসাবে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় লোক হিসাবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল, তিনি নানা কাজে নানা মহলের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তার ফল দাঁড়িয়েছিল এই তিনি কথায় ও কাজে সুস্পষ্টভাবে বৃটিশ বিরোধী হলেও এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে অতি অন্তরঙ্গ মহলের একজন বিশিষ্ট লোক হলেও বৃটিশ আমলাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত লোক-জনদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও আনাগোনা ছিল। ফলে তিনি অনেক সময় তাঁদের কাছ থেকে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হতেন, যেটা নানা সময়ে আন্দোলনকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে একটা ঘটনার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মাহমুদ আল হাসান সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা সরকারের শ্যেন দৃষ্টিকে এড়িয়ে গোপনে গোপনে দেশের বাইরে ও ভিতরে এক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কাবুলের আমীর হাবিবুল্লা প্রথমে তাঁদের সাহায্য করার ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও পরে বৃটিশ সরকারের কাছে বিপ্লবীদের এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। ফলে ভারতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। ডাঃ আনসারী সরকারী মহল থেকে এই খবর জানতে পেয়ে সময় থাকতেই মাহমুদ আল-হাসানকে হুঁশিয়ারী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার ফলে এবং তাঁরই সাহায্যে মাহমুদ আল-হাসান গোয়েন্দাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে দেশত্যাগ করে মক্কা পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট সেনানী ডাঃ মুখতার আহ্‌মদ আনসারীর ব্যাপক কর্মজীবন সম্পর্কে খুব সামান্য কথা এখানে বলা হয়েছে। তিনি ১৯৩৬ সালের ১০ই মে পরলোক গমন করেন।

কংগ্রেসে মুসলিম নেতৃত্ব

হাকিম আজমল খান

সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে হাকিম আজমল খানের নাম সুপরিচিত। তাঁর পূর্বপুরুষেরা মুগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে এদেশে চলে আসেন এবং তখন থেকেই ডাঃ আনসারীর মত হাকিম আজমল খানের পূর্বসূরীরাও চিকিৎসা বিদ্যায় সমগ্র উত্তর ভারতে অসামান্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন সম্রাট আকবরের আমলে চিকিৎসাকে তার পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরই এক বংশধর ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজকীয় চিকিৎসক। তারপর থেকে তাঁদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ রাজ চিকিৎসক হিসাবে কাজ করে এসেছেন।

এই বিখ্যাত চিকিৎসক বংশের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন হাকিম আজমল খান। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালে। তাঁর পিতার নাম গোলাম মহম্মদ খান।

শিক্ষার দিক দিয়ে তিনি প্রাথমিক বাধ্যতামূলক কোরান অধ্যয়নের পর বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে প্রাচীন দিনের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করেছিলেন। নিজস্ব পেশা হিসাবে হাকিম আজমল খান প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত চিকিৎসা বিদ্যা অর্থাৎ তিব্বি ইউনানী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এজন্য তাঁকে বাইরে যেতে হয় নি, নিজেদের পরিবারের মধ্যে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনকার দিনের উচ্চ বংশের মুসলমানরা ধর্মভ্রষ্ট ও আচার ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কোন আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাঠাতেন না। সেই কারণে তরুণ হাকিম আজমল খানকে আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি আধুনিক শিক্ষার মর্ম ও সার্থকতা বুঝতে পেরে একমাত্র নিজের চেষ্টাতেই ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

চিকিৎসক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি রামপুর করদ রাজ্যের রাজকীয় চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। তরুণ হাকিম আজমল খান ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামপুরের নবাব তাঁর সঙ্গে সম্প্রীতি সূচক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে বিরত হন নি। রামপুরে থাকতেই স্যার সৈয়দ আহমেদ কর্তৃক প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা তাঁর দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং তিনি আলীগড় কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টি হিসাবে মনোনীত হন। কিন্তু বিরোধটা দেখা দিল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। আলীগড় কলেজ কর্তৃপক্ষ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। কিন্তু হাকিম আজমল খান মনে প্রাণে আন্দোলনের সপক্ষে। ফলে তিনি আলীগড় কলেজের ট্রাষ্টি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন।

যখন তাঁর বয়স ত্রিশের উপর সেই সময় থেকে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। এই কাজ শুরু হল লেখনী চালনার মধ্যে দিয়ে। তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে 'আকমল উল-আকবর' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। হাকিম আজমল খান এই পত্রিকায় নানারকম রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ ও টীকা-টিপ্পনি লিখতেন।

বিংশ শতাব্দীর পদপাতের সাথে সাথে হাকিম আজমল খানদের পরিবারে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। ইতিপূর্বে এই পরিবারের আর কেউ কোনদিন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি। হাকিম আজমল খানই সর্বপ্রথম রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করলেন এবং দেখতে দেখতে তাঁর নাম সারা ভারতের রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠল। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমভাগে তিনি একান্তভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়েই তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল বাস্তবিকপক্ষে এটা ছিল তার রাজনৈতিক শিক্ষানবিশীর কাল। কাজের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতির ফলে তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে সারা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করলেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি যখন মুসলিম রাজনীতির

গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময় ১৯০৬ সালে আগা খান-এর নেতৃত্বে কয়েকজন অভিজাত শ্রেণীর বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোক ভারতের সমগ্র মুসলান সমাজের স্ব-নির্বাচিত প্রতিনিধি স্বরূপ তাদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে দেন-দরবার করার উদ্দেশ্যে সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার আদায় করা এবং এই সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁরা বড়লাটের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলেন। হাকিম আজমল খান ছিলেন এই তথাকথিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। এই ১৯০৬ সালেই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। এই বছরই সরকারী প্রভুদের ইঙ্গিতে ভারতের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলমান ঢাকার নবাব বাড়ীতে সম্মিলিত হয়ে মুসলিম লীগ গঠন করেন। আগা খানকে তাঁরা মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। হাকিম আজমল খান এই সম্মেলনেও উদ্যোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

হাকিম আজমল খান ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সুপরিচিত হলেও তাঁর কর্মবহুল জীবনের অন্যদিকটি সম্পর্কেও অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। নানাবিধ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশীয় 'তিব্বি ইউনানী' চিকিৎসা বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও উন্নতিকল্পে যে সমস্ত কাজ করে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। আধুনিক গবেষণা কার্যের সাহায্যে এই প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকে আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য তিনি যে অসামান্য সাধনা করে গেছেন, তা সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের পরিবার কর্তৃক পরিচালিত তিব্বিয়া স্কুলকে দিল্লীতে তিব্বিয়া কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কলেজে একটি গবেষণা বিভাগ ছিল, তাছাড়া এখানে ধাত্রীবিদ্যা (midwifery) শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। তিনি তাঁর বহু বক্তৃতা ও লেখার মধ্য দিয়ে ধাত্রীবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য দেশের শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তিব্বি ইউনানী চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি কল্পে তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার জন্য ভারত সরকার ১৯০৭ সালে তাঁকে 'হাজিক-উল-মুল্ক' উপাধি দান করেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক দিয়ে হাকিম আজমল খানের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। মুসলিম লীগের সভ্য রাজভক্ত হাকিম আজমল খান সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামীতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এ এক বৈপ্লবিক রূপান্তর।

ভারত সরকার এতদিন পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ী হাকিম ও কবিরাজদের পেশাগতভাবে যে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন, ১৯১০ সালে তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রস্তাব করলেন, ভারত সরকার ভারতের দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যাকে উচ্ছেদ করার জন্য মনস্থ করেছেন, একথা বুঝতে পেরে হাকিম আজমল খান সরকারের প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য দেশের হাকিম ও কবিরাজদের সংগঠিত করে চললেন।

ঠিক এই সময় পৃথিবীর দিগন্তে এক নূতন যুদ্ধের কালোমেঘ দেখা দিল। ইতালী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম দেশ ত্রিপলী গ্রাস করে নিল। বৃটিশ সরকার উদাসীন দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাটিকে তাকিয়ে দেখল, এর বিরুদ্ধে তাদের কোনই বক্তব্য ছিল না। ত্রিপলীর মুসলিম জনসাধারণের এই অসহায় অবস্থা দেখে ইতালীর এই আক্রমণ এবং বৃটেনের অর্থপূর্ণ নীরবতার জন্য ভারতের মুসলমান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মুসলিম বিশ্বের শত্রু এই ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে প্রতিহত করবার জন্য ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এক নূতন জাগরণ দেখা দিল। সেদিন হাকিম আজমল খানও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠল। এই যুদ্ধে তুরস্ক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানরা খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। তার কারণ এই যুদ্ধে এখান থেকে যে সমস্ত মুসলমান সৈন্যদের পাঠান হতো, তাদের নিজেদের 'ধর্মীয় ভাই' তুরস্কের মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছিল। এদিকে যুদ্ধের জরুরী পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মহম্মদ আলী প্রমুখ নেতাদের আটক করা হচ্ছিল। হাকিম আজমল খান অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের মত এ পর্যন্ত ইংলণ্ডের পক্ষে

যুদ্ধ উদ্যোগের কাজে সাহায্য করে আসছিলেন, কিন্তু মুসলমান নেতাদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে তিনি বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে নিরস্ত হলেন।

১৯১৭ সালে তিনি গান্ধীজী ও অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে রাজভক্ত হাকিম আজমল খানকে বিদ্রোহী হাকিম আজমল খান-এ রূপান্তরিত হতে বেশী সময় লাগল না। এখান থেকে শুরু তাঁর জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের। ১৯২০ সালে তিনি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'হাজিক-উল-মুল্ক' উপাধি বর্জন করলেন। বিনিময়ে দেশবাসী 'মসিন-উল-মুল্ক' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে তাদের আপন মানুষ বলে গ্রহণ করে নিল। ১৯১৮ সালে হাকিম আজমল খান দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করার ফলে হাকিম আজমল খানের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে সারা দেশে স্কুল-কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি স্কুল-কলেজ বর্জন করার জন্য আহ্বান জানান হয়েছিল। আলীগড় শিক্ষা কেন্দ্র তাঁর জন্ম থেকেই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এসেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী কংগ্রেসের এই আহ্বানকে ব্যর্থ করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখানকার একদল ছাত্র এবং পরিচালকমণ্ডলীর কয়েকজন সভ্য দেশের ডাকে কর্তৃপক্ষের বাধা ও হুমকিকে অগ্রাহ্য করে তাদের শিক্ষায়তন বর্জন করে বেরিয়ে এসেছিলেন।

এই সমস্ত ছাত্রদের জাতীয় ভাবধারায় সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে আলীগড়ে 'জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া' নামে একটি জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হল। হাকিম আজমল খান ছিলেন এই শিক্ষায়তনের আচার্য (Chanceller)। এই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছিল। কিন্তু স্বনামখ্যাত আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাশাপাশি তার এই ক্ষুদে প্রতিদ্বন্দ্বীটির পক্ষে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব ছিলনা। সামনে দুটো পথ খোলা ছিল—হয় তাকে বন্ধ

করে দিতে হবে, নয়ত অন্যত্র অনুকূল পরিবেশে স্থানান্তরিত করতে হবে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকের মনেই এ বিষয়ে সন্দেহ সংশয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাকিম আজমল খানের অদম্য আগ্রহের ফলে 'জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া'-কে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল। কংগ্রেসের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার ফলে নেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। একমাত্র হাকিম আজমল খানের উদ্যোগ ও সাহায্যের ফলেই এই প্রতিষ্ঠানটি অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

কর্মবীর হাকিল আজমল খান-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ১৯০৪ সাল থেকেই তিনি হৃদ-রোগে ভুগছিলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ১৯১১ সালে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে থেকেছেন এবং এই উপলক্ষে তিনি ইংলণ্ডের রাজনীতি ও চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ বহু মনীষীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণেই তাকে ১৯২৬ সালে শেষ বারকার মত বিদেশে সফর করতে হয়। এবার তিনি যান ফরাসী দেশে। এই উপলক্ষে তিনি ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সফর করেছিলেন। এই সফরের ফলে তিনি রাজনীতি ও চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন তা সফল হয় নি। তাঁর হৃদরোগের কোন উপশম হলো না, বরঞ্চ দিনদিন অবনতির পথে চলল। অবশেষে ১৯২৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর দেশপ্রেমিক হাকিম আজমল খান স্বদেশ ও আপনজনদের থেকে বহুদূরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মুফতি কিফায়েত উল্লাহ

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুফতি কিফায়েত উল্লাহর নাম সুপরিচিত। কিফায়েত উল্লাহ ১৮৭২ সালে উত্তর প্রদেশের সাজাহানপুরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। নিতান্ত গরীবের ঘরে তার জন্ম। তার পিতা ইনায়েত

উল্লাহ্ এক বৃটিশ কর্মচারীর গৃহে বাবুর্চির কাজ করতেন। সাজাহানপুরের মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, পরে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য দেওবন্দের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র দারউল-উলুমে ভর্তি হন। এই শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বাধীনতার বীর সংগ্রামী মাহমুদ হাসানের কাছে তিনি যে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তা তার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরই আদর্শ-কে অনুসরণ করে তিনি তার ভবিষ্যত জীবন গড়ে তুলেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম উজ্জ্বল চরিত্র মওলানা আহমদ হোসেন মাদানী ছিলেন তার সহপাঠি বন্ধু। এই দুই বন্ধু পরস্পরের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছার আগে পর্যন্ত তারা সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে এসেছিলেন।

মুফতি কিফায়েত উল্লাহ ধর্মপ্রাণ স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁর কর্ম-জীবনে তিনি স্থায়ীভাবে দিল্লীতে বাস করতেন। এখানে তাঁর উদ্যোগে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জমিয়ৎ-ই-উলেমা-ই-হিন্দ-এর প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ১৯১৯—'৪২ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কিফায়েত উল্লাহ ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৯৩১ সালে দিল্লীতে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি প্রথমবার ১৯৩০ সালে লবণ আইন ভঙ্গ এবং দ্বিতীয়বার দিল্লীতে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। দেশ সেবার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে আড়াই বছর কাল কারা-জীবন যাপন করতে হয়।

কিফায়েত উল্লাহ এ কথা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মীয় স্বাধী-নতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ। মূলত এই চিন্তা থেকেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা তাঁর একান্ত কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের ধর্ম ইসলাম থেকে তিল-মাত্র বিচ্যুতি সহ্য করতে পারতেন না। এমন কি শরীয়ত বিরোধী কাজ বলে তিনি তার নিজের ফটো পর্যন্ত তুলতে দিতেন না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ সম্পর্কে কিফায়েত উল্লাহর এই অভিমত ছিল যে, দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় অহিংস সংগ্রামই এর একমাত্র বিকল্প। ১৯২৮ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত সর্বদল সম্মেলনকে তিনি একটা ধোঁকাবাজি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, দেশের সকল সম্প্রদায় যদি তাদের পরস্পরের ভেদ-বিভেদের কথা ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, তা হলে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের কোনই সম্ভাবনা নেই। দেশের সাম্প্রদায়িক সমঝোতা সম্পর্কে তিনি মনে করতেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির তুষ্টি সাধনের জন্য যথা-সম্ভব চেষ্টা করা উচিত। কেননা তা হলেই দেশে স্থায়ী রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

মুফতি কিফায়েত উল্লাহ মনে করতেন, এদেশে ইসলামিক ধরনের রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা নিতান্তই অবাস্তব, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনই এখানকার একমাত্র পথ। তিনি ১৯৪০ সালে আজাদ মুসলিম সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছিলেন, "ভারত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অবিভাজ্য। কাজেই এ দেশ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরই মাতৃভূমি, তারা সবাই এ দেশের মালিক। ··· জাতীয়তার দিক থেকে মুসলমানরা সবাই ভারতবাসী। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আর সকলের মত তাদেরও সমান অধিকার আছে।"

কিফায়েত উল্লাহ স্বাদেশিকতার প্রশ্নে কোন রকম আপস রফায় রাজী ছিলেন না। ভারত সরকার তার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি যদি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান না করেন, তাহলে সফদর জঙ্গ মাদ্রাসার মুফতি হিসাবে তাঁর কার্যকাল বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কিফায়েত উল্লাহ এই প্রস্তাবকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৯৩০ সালে জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ প্রতিষ্ঠানটিকে কঠিন অর্থ সংকটে পড়তে হয়েছিল। তাতেও বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু এজন্য অন্য কারুর উপর আমরা নির্ভর করতে চাইনা। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের ধর্মীয়

কর্তব্য। এজন্য আমাদের জমিয়তের দ্বার যদি বন্ধ করে দিতে হয়, তাহলেও আমরা এ জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থী হতে যাবো না।''

স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দানের জন্য দিল্লীর আমিনা মাদ্রাসার রেকটারের পদ গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা বা খ্যাতি লাভের জন্য তার কোন মোহ ছিল না।

১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি দিল্লীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আসফ আলী

আসফ আলী উত্তর প্রদেশের এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর জন্ম ১৮৮৮ সালে। কিন্তু তাঁর শিক্ষা জীবন কেটেছিল রাজধানী দিল্লী শহরে। প্রাথমিক ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অ্যাংলো-অ্যারাবিক স্কুলের ছাত্র। এখানে তাঁর ইসলামিক শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা উভয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটে। এখানকার পাঠ শেষ করে তিনি কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি মিশন কর্তৃক পরিচালিত দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে তিনি লণ্ডনে চলে যান এবং সেখানে ১৯১২ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৪ সালে স্বদেশে ফিরে আসার পর তিনি দিল্লীতে আইন-ব্যবসায় যোগ দিলেন। সেই সময়ই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তখন থেকেই আসফ আলী ক্রমে ক্রমে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছিলেন। ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি বহু বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলায় আসামীদের পক্ষ হয়ে লড়াই করে এসেছেন। তাদের মধ্যে ভগৎ সিংএর মামলা অন্যতম। অ্যানি বেশান্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হোম রুল লীগের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক কাজে হাতে খড়ি হয়। পরে গান্ধীজীর প্রভাবে তিনি সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করলেন। এই সময়ে ১৯১৮ সালে তাঁকে ভারত রক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলায় তিনি তাঁর নিজের পক্ষ সমর্থন করার জন্য নিজেই আদালতে

দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রখর যুক্তির বাণে সরকার পক্ষকে ধরাশায়ী করে দিয়ে তিনি এই মামলায় বেকসুর মুক্তি লাভ করলেন। এর তিন বছর পর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। এবার তিনি ১৮ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। গান্ধীবাদ ও অসহযোগের নীতি সম্পর্কে তিনি 'গঠনমূলক অসহযোগ' নামে যে বইটি লেখেন, তাকে গান্ধী-বাদী নীতির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৯২৭ সালে আসফ আলী কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। এর তিন বছর বাদে ১৯৩০ সালে তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে আবার তাঁকে কিছুকালের জন্য জেলে যেতে হয়। ১৯৩৪ ও ১৯৪৬ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনও পার্টির 'চীফ হুইপ,' কখনও সেক্রেটারী জেনারেল, আবার কখনও ডেপুটি লীডার হিসাবে কাজ করে এসেছেন। ১৯৩৫ সালে আইন পরিষদের সভ্য থাকাকালে তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং একাদিক্রমে পরবর্তী পনের বছর এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আসফ আলী সব সময়ই সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে এই উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালে ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। একজন ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা হিসাবে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দীর্ঘ পনর বছর ধরে দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার প্রার্থীদের প্রতিবারই তাঁর কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, তাতেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সে সময় তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং আইন পরিষদের কংগ্রেস পার্টির সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস বৃটিশের যুদ্ধ উদ্যোগের কাজে সহযোগিতা করবে না, এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের সূচনাতেই সারা ভারতে সমস্ত বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের মত আসফ আলীকেও কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। তাঁকে আহমদনগর ফোর্টে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আহমদনগর ফোর্টের কারাজীবনে তাঁর গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে। সেই কারণে ১৯৪৫ সালের মে মাসে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর লোকদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সরকার কর্তৃক মামলা পরিচালিত হয়। এই মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য ভুলাভাই দেশাই যে কমিটি গঠন করেছিলেন, আসফ আলী ছিলেন তার সেক্রেটারী।

আসফ আলীর স্ত্রী শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী ভারতের সর্বজন-পরিচিত নেত্রী। সোশ্যালিস্ট পার্টির সভ্য হিসাবে তিনি 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এই পার্টির সভ্য হিসাবে এখনও তিনি দিল্লীতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন।

মওলনা হিফাজুর রহমান

মওলানা হিফাজুর রহমান দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র দারুউল-উলুম এর অপর এক উজ্জল অবদান। তিনি ১৯০১ সালে উত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলার সেও হোরা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যজীবনে মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি দেওবন্দের দারউল-উলুমের শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন। মাদানী ও কিফায়েত উল্লাহর মত তিনিও এখানকার অধ্যক্ষ শেখ-উল-হিন্দ মওলানা মাহমুদ আল-হাসান এর কাছ থেকে দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে তিনি জমিয়তুল-উলেমা-ই-হিন্দ ও কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। তিনি আজীবন কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা

সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন।

সারা দেশের সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার আবহাওয়া যতই বিষাক্ত হয়ে উঠুক না কেন, মওলানা হিফাজুর রহমানকে তা বিন্দুমাত্র সংক্রামিত করতে পারে নি। জাতীয়তাবাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে মুসলিম লীগের বিভেদপন্থী নীতির বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। তার ফলে অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের মত তাঁকেও সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। একদিকে মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধ ও বিভ্রান্ত জনতা, অপরদিকে কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের মিলিত আক্রমনের ফলে তাঁকে বহু লাঞ্ছনা ও দুঃখ বরণ করতে হয়েছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষে সে ছিল এক অগ্নিপরীক্ষার দিন। মওলানা হিফাজুর রহমান এই পরীক্ষায় স-সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

সৈয়দ মাহমুদ

ডঃ সৈয়দ মাহমুদ উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ১৮৮৯ সালে। তিনি দেশে থাকতে আলীগড়ে এবং বিদেশে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ১৯১১ সালে জার্মানীর মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। পরের বছর জুন মাসে তিনি ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন।

১৯১২ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করলেন। ১৯১৭ সালে অ্যানি বেশান্ত কর্তৃক পরিচালিত হোমরুল লীগে তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষানবীশী শুরু হয়। অতঃপর ১৯১৯ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান উপলক্ষে তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করে দেশের কাজে নামলেন। তিনি কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি 'খিলাফত ও ইংলণ্ড' নামক বইটি লিখেছিলেন। এই বইটিতে তিনি খিলাফতের ইতিহাস এবং ১৯ শতকের শেষ ভাগের ইঙ্গ-তুরস্ক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ডঃ মাহমুদ বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন। দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসাবে তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৯২৩ সালে তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কংগ্রেস ১৯৩৫ সালে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলে এই সময় বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় তিনি শিক্ষা ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর এই মন্ত্রীত্বের সময় তিনিই সর্বপ্রথম বয়স্কদের শিক্ষাদান ও গণশিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেন।

ডঃ মাহমুদ 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর কথায় তিনি এই প্রস্তাব মেনে নেন। 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' আন্দোলন উপলক্ষে অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের মত তাঁকেও কারারুদ্ধ হতে হয়। কিন্তু জেলে যাওয়ার পরেও এই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মনের সংশয় কাটেনি। একদিন ধর্মগ্রন্থ কোরানের পাতা উল্টোতেই তিনি এমন একটা শুভ লক্ষণ দেখতে পেলেন, যার ফলে তাঁর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, বৃটিশ সরকার স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এই প্রত্যাদেশ লাভ করার পর তিনি বড়লাটের কাছে এক চিঠিতে লিখলেন যে তিনি 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এবং এই চিঠির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে এই অনুরোধ জানালেন যে, তিনি যেন পুনরায় গান্ধীজীর সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। এই চিঠি পাওয়ার পর সরকার ডঃ মাহমুদকে মুক্তি দিলেন। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই ডঃ মাহমুদ সম্পর্কে কংগ্রেসী মহলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। ডঃ মাহমুদের পক্ষে এটা যে একটা মস্ত বড় ভুল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরে অবশ্য ডঃ মাহমুদ নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। সুখের কথা, এই ভুল বোঝা-বুঝিটা কেটে যেতে বেশী দিন সময় লাগে নি। ডঃ মাহমুদ আগেকার মতই কংগ্রেসী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় তিনি উন্নয়ন ও যানবাহন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন।

হযরত মোহানী

তাঁর আসল নাম ছিল সৈয়দ ফজলুল হাসান। কিন্তু এই নাম বললে কেউ তাঁকে চিনবে না। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি হজরত মোহানী নামেই সু-পরিচিত। তিনি ১৮৭৮ সালে উত্তর প্রদেশের উন্নাউ জেলার 'মোহান' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কিশোর বয়স থেকে তিনি 'হজরত মোহানী' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। সেই নামে আজও তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

উন্নত মেধার ছাত্র হিসাবে তিনি তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করে আলীগড় কলেজে এসে ভর্তি হলেন। এখানে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর রচনার গুণে এবং এক-জন সংস্কৃতিসেবী হিসাবে সকলেরই মন জয় করে নিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি যে একজন উচ্চ শ্রেণীর লেখক বলে পরিচিত হবেন, এ বিষয়ে কারুর মনে কোনও সংশয় ছিল না। কিন্তু তরুণ হজরত মোহানীর মূল চিন্তাধারা কোন আদর্শকে লক্ষ্য করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তাঁর অত্যন্ত পরিচিত যারা তাঁরাও তা কল্পনা করতে পারেনি। সকলের দৃষ্টির অলক্ষ্যে মধ্যরাত্রির গোপন আশ্রয়ে তিনি শ্রীঅরবিন্দ ও বাল-গঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক সাহিত্যের চর্চায় ডুবে থাকতেন। সে সময় এটাই তাঁর প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। এত গোপনীয়তা কেন? তার কারণ আলীগড় কলেজ কর্তৃপক্ষ বৃটিশ বিরোধী রাজনীতি বা যে কোনও ধরনের প্রগতিশীল রাজনীতিকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখতেন। সেই কলেজের এমন একজন জনপ্রিয় ছাত্র যে রাজদ্রোহাত্মক সাহিত্যের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে, এমন কথা কেউ ভাবতেও পারত না।

একটি বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অতি প্রিয়পাত্র হজরত মোহানীর প্রকৃত স্বরূপটা একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়ল। কলেজের স্টুডেন্টস

ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি উর্দু কবিতার মোশায়রার আয়োজন করা হয়েছিল। হজরত মোহানী-ই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। এই মোশায়রা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কলেজের অধ্যক্ষ থিয়োডোর মরিসন এর কাছে এই খবর গিয়ে পৌঁছুল যে, যাঁরা স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নাকি শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছিলেন।

এই ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য অধ্যক্ষের কাছে মোশায়রার মুল উদ্যোক্তা হজরত মোহানীর ডাক পড়ল। এই শালীনতা ভঙ্গের প্রশ্ন নিয়ে অধ্যক্ষ ও হজরত মোহানীর মধ্যে এক তিক্ত বাদানুবাদ ঘটে গেল। এই প্রসঙ্গে হজরত মোহানী সেদিন বলেছিলেন, "স্যার, আমাদের এই কবিরা মানবতার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ। আপনাদের সমাজে এঁরা শালীনতা ভঙ্গের জন্য নিন্দিত হবেন, এটা বিচিত্র কিছু নয়।"

মুখের উপর এই জবাব পেয়ে অধ্যক্ষের ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি এই ব্যাপারে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দানের জন্য তখনই কলেজের ট্রাস্টি বোর্ডের এক সভা ডাকালেন। এই সভার সিদ্ধান্ত কি হবে তা আগে থেকেই জানা ছিল। ১৯০৩ সাল আলীগড় কলেজের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বছরই সর্বপ্রথম একজন 'বিদ্রোহী'কে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল।

এবার তাঁর জীবনে এক নূতন অধ্যায় নেমে এলো। সে যুগে বি. এ. ডিগ্রীর যথেষ্ট মূল্য ছিল, কিন্তু এই ডিগ্রী তাঁর কোন বিশেষ কাজে এলো না। সে সময় আইন ব্যবসা ছিল অর্থোপার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট পথ। কিন্তু হজরত মোহানী সেই পথে না গিয়ে সাহিত্যের পথকে বেছে নিলেন এবং কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এর ফলে সারাজীবন ধরে তাঁকে দারিদ্র্যের বোঝা টেনে চলতে হয়েছে। এ সময় তিনি একটি উর্দু পত্রিকা পরিচালনা করতেন। কংগ্রেস কর্মী হিসাবে তিনি ১৯০৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতিটি বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস সম্মেলন গোখেলের নরমপন্থী দল এবং তিলকের চরমপন্থী দলের সংঘর্ষের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তিলকের আদর্শে প্রভাবিত হজরত মোহানী চরমপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

ভারতীয় জনমতের মুখ চাপা দেবার উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালে সরকার কর্তৃক কুখ্যাত 'নিউজ পেপারস্ এ্যাক্ট' জারি করা হয়েছিল। এই আইনের বলে হজরত মোহানী কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকাটিতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এক মামলা আনা হল। এই মামলায় তিনি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এইবারই তিনি প্রথম দেশসেবার পুরস্কার পেলেন। এই একই কারণে ভবিষ্যতে তাঁকে আরও পাঁচবার কারাবরণ করতে হয়েছিল।

হজরত মোহানী চিরদিনই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। উনিশ শতকের কংগ্রেস উচ্চ মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ-শতকের প্রথম ভাগে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধনা ও আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বজায় রেখে যাঁরা কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষের মধ্যে টেনে নামিয়ে এনে-ছিলেন, হজরত মোহানী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর এই আপোসহীন আদর্শের জন্য কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও কারো কারো সঙ্গে তাঁর সংঘাত ঘটেছিল। সে সময় জিন্নাহ্ সাহেব কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রবল মতবিরোধ ঘটেছিল। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিরোধিতার অবসান হয়নি।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিষয়ে তাঁর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ সম্মেলনে তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সে যুগের পক্ষে এর একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল। গান্ধীজী এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। সে সময় কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর অখণ্ড প্রভাব। তা সত্ত্বেও তাঁর বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করতে হজরত মোহানী বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তাঁর এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু তা হলেও তাঁর এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ভবিষ্যতে দিক্ নিরূপণের ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে।

হজরত মোহানী উত্তর প্রদেশের মুসলমান সমাজে স্বদেশী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে কাজে নেমে-ছিলেন। এই অপরাধে বারবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ফলে তিনি

কোনদিনই শান্তি ও সাফল্যের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করতে পারেন নি। দেশকে ভালোবেসেছিলেন বলে তাঁকে দুঃখ ও অভাবের জীবনই বরণ করে নিতে হয়েছিল। এই কণ্টকময় পথে তাঁর স্ত্রী নিশাত ফাতেমা ছিলেন তাঁর উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিণী। কঠিন দুঃসময়ের দিনেও তিনি সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর স্বামীকে অনুগমন করে চলতেন। সেই কারণেই হজরত মোহানীর মত বেগম মোহানীও অনেকের শ্রদ্ধা এবং তার চেয়েও বেশী লোকের সমালোচনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নিশাত ফাতেমা স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পর্দার আবরণ ভেঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে বেড়িয়ে এসেছিলেন। সে যুগের সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদের পক্ষে এটা একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার। সমাজের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে তিনি সাহসের সঙ্গে এই পথে নেমে এসেছিলেন।

১৯২৮ সালে 'নেহেরু রিপোর্ট' নিয়ে আলোচনা করার জন্য কলকাতায় এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের 'চৌদ্দ পয়েন্ট' সম্বলিত দাবী মেনে না নেওয়ার ফলে এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর প্রতিবাদে কংগ্রেসী মুসলমানদের একটি অংশ কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান। হজরত মোহানীও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। এইভাবে কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ হজরত মোহানী কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এ-এক করুণ পরিণতি। তারপর দুটি দশক ধরে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার ফলে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু অঘটন ঘটে চলল। কিন্তু মুসলিম লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব অনুমোদনের চরম মুহূর্তে হজরত মোহানী তাঁর বিদ্রোহের ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সম্মেলন মঞ্চে দাঁড়িয়ে জিন্নাহ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে তিনি এই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, 'মিঃ জিন্নাহ, আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনি একদল রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছেন।'

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি ভারতের গণপরিষদের (Constituent Assembly) সভ্য হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু এ

ক্ষেত্রেও তিনি বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই গণপরিষদে ভারতীয় গঠনতন্ত্রের খসড়া রচিত হওয়ার পর তিনি তাতে স্বাক্ষর করতে রাজী হন নি। কয়েকটি কারণে তিনি এই অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান কারণ দুটি, দেশ বিভাগ ও ভারতের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তি। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনমনীয় ছিলেন।

হজরত মোহানী সারাজীবন দেশের কাজ করে এসেছেন। কিন্তু প্রখর আপোষহীনতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যাঁর ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অবদান অক্ষয় হয়ে আছে। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সৃজনশীল প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। উর্দু কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছিল। পরবর্তী যুগে তরুণ কবিরা তাঁর রচনা-শৈলীকে অনুসরণ করে তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রেখে গেছেন।

হোসেন আহমদ মাদানি

হোসেন আহমদ মাদানি তাঁর কৈশোরে দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী হিসাবে এসেছিলেন, তিনি মাহমুদ আল হাসানের এক প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এখানকার শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে তাঁর পিতা ১৮৮৯-৯০ সালে তাঁকে নিয়ে মক্কায় চলে যান। তাঁরা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তখন থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত হোসেন আহমদ প্রধানতঃ হেজাজে অবস্থান করতেন তবে মাঝে মাঝে ভারতে আসতেন। মাহমুদ আল হাসান যখন ভারত থেকে মক্কা এলেন তখন পর্যন্ত হোসেন আহমদের রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু মাহমুদ আল হাসানের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে তিনি ভারতের সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। মাহমুদ আল হাসানের প্রিয় শিষ্য এবার তাঁর সহকর্মী ও পরামর্শদাতা হয়ে দাঁড়ালেন।

মাহমুদ আল হাসান মক্কায় অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্য ও দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ মাদানি সে সময় ভারত ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সেই উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁদের কার্যকলাপের দিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দার প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগে বৃটিশের উস্কানিতে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে মকায় এক বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহীরা মাহমুদ আল হাসান, আহমদ হোসেন মাদানি এবং তাদের দু'জন সঙ্গীকে বৃটিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। বৃটিশ সরকার এদের সবাইকে মারাঠা দ্বীপে আটক করে রাখবার ব্যবস্থা করলেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সেখানেই আটক থাকতে হয়েছিল।

অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর বৃটিশ সরকার মাহমুদ আল হাসান ও আহমদ হোসেন মাদানিকে মুক্তি দিয়ে তাদের বোম্বাইতে পাঠিয়ে

দিলেন। এটা ১৯২০ সালের কথা, তখন ভারতে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। আহমদ হোসেন মদানি তার গুরুর সাথে সাথেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। এই আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মৌলানা আজাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। এখানে এসে তিনি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী আরবী মাদ্রাসার পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। তিনি কলকাতা থেকে সিলেটে চলে যান। সেখানে তিনি হাদিসের অধ্যাপনা কার্যে ৬ বৎসরকাল কাটিয়েছিলেন।

আহমদ হোসেন মাদানি ১৯২৮ সালে দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষের কার্যে নিযুক্ত হলেন। তাঁর জীবনের পরবর্তী ৩০ বৎসর তিনি সেখানে অধ্যাপনা করেছিলেন। কিন্তু সেখানে শুধু অধ্যাপনা করেই দিন কাটেনি, সেই সময় থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে যুক্ত ছিলেন, রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করা এবং আইন অমান্য করার জন্য তাঁকে বহুবার জেলে যেতে হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা হিসাবে এইভাবে বারে বারেই তাঁকে সরকারী নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের নেতারা এবং যে সমস্ত উলেমা স্বাধীনতা আন্দোলনের সংস্রব ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যত বাঁধাই আসুক না কেন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে যত কটুক্তিই বর্ষিত হোক না কেন তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামের পথ থেকে তিলমাত্র ভ্রষ্ট হন নি, মুসলিম লীগের বিদ্বেষমূলক প্রচারের ফলে সারা দেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আহমদ হোসেন মাদানি চিরদিন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের দৃঢ়মূল আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

এ কথা সত্য তাঁর গুরু মাহমুদ আল হাসানের কাছ থেকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মাহমুদ আল হাসানের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল। কেবলমাত্র ভাবাবেগ দ্বারাই তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কার্যকলাপ পরিচালিত হত না, তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যাগুলি

নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর যে সমস্ত রচনা আছে, তা থেকে এর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর ও উদার। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, এবং মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর মত একান্ত ধর্মপ্রাণ একজন মৌলভির পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সেকথা ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তবে এটা আমরা অনুমান করতে পারি, বিশ্বের মুসলমানদের মিলনস্থল মক্কায় ১০ বছর ধরে অবস্থান করার ফলে এবং মলিচায় ৫ বছর অবরুদ্ধ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন মুসলমান দেশের রাজনৈতিক মহলের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে-ছিলেন। শুধু তাই নয়, মুসলমান ছাড়াও জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইতালী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের রাজনীতিকদের সাথে তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেছিল। সম্ভবতঃ তাদের সংস্পর্শে আসার ফলেই তিনি আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে এতটা ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

মাহ্মুদ আল হাসানের চিন্তাধারার পরিচয় তাঁর গোটাকয়েক বক্তৃতা এবং অনুবর্তীদের লেখার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু হোসেন আহমদ এমন প্রচুর সংখ্যক রচনা রেখে গেছেন যার মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা-ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ধর্মীয় শাস্ত্রবেত্তা হিসেবে তিনি কোরান ও হাদিসকে মানুষের জীবনের পদপ্রদর্শক বলে মনে করতেন। কিন্তু ধর্মকে অত্যন্ত ব্যাপক ও উদার দৃষ্টি নিয়ে দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মের ক্ষেত্র কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস, আরাধনা, অনুষ্ঠান এবং নীতির প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির উপরেও তাঁর অধিকার প্রসারিত। অসীম ও সসীম বৈষয়িক জগতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি আছে বলেই একজন গভীর ধর্মপ্রাণ লোক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে কখনই বাঁধেনি।

তাঁর মতে যারা চিন্তা, বাক্য ও কার্যের মধ্য দিয়ে খোদার ইচ্ছাকে মান্য করে চলে এবং যে কোন মহল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে নির্দেশ দিলে তা পালন করে চলতে অস্বীকার করে চলে তারাই হচ্ছে সত্যিকারের মুসলমান। এই নীতি অনুসরণ করে চললে অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হয়, কোন সত্যিকারের মুসলমান তাঁর স্বাধীনতাকে কোন পার্থিব শাসকের কাছে বাঁধা রাখতে পারে না। বিশেষ করে যে মুসলমান বিদ্বেষী শাসক ইসলামের আদর্শ ও জীবন ধারাকেই ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তার আইন ও সরকারী বিধান রচনা করে থাকে কোন মুসলমানের পক্ষেই কোন অবস্থাতেই তার অধীনতা স্বীকার করে থাকা চলেনা।

কাজেই ভারতের উপর বৃটিশ কর্তৃত্বের অবসানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই হচ্ছে এখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য। তাঁর রচনাবলীর মধ্য থেকে এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যায় যেখানে তিনি মুসলমানদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য এবং ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

এই বিদ্রোহ যে সম্পূর্ণভাবে ন্যায়সঙ্গত তা তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেছেন। তার আত্মজীবনী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে ৩৩৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ২০০ পৃষ্ঠায় তিনি বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের যে ধ্বংসাত্মক ফলাফল ঘটেছে সেই চিত্রটি তুলে ধরেছেন। সেই ফলাফলগুলি হচ্ছে ১. বর্ণগত ও জাতিগত, বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে এবং দেশীয় লোকদের উচ্চ সরকারী পদলাভ থেকে বঞ্চিত করে তাদের অবমাননা ও লাঞ্ছনা। ২. ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসন ব্যবস্থা এবং দেশীয় লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক ক্ষতি সাধনের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার শোচনীয় পরিণতি। ৩. বিচার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে যে ভ্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে মামলা মোকদ্দমা ও দুর্নীতির হার বেড়ে গিয়েছে এবং মামলা পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মামলা শেষ করতেও বহু সময় লেগে যাচ্ছে। ৪. আইন প্রণয়নের কাজকে ভারতীয়দের অধিকার বহির্ভূত করে রাখা হয়েছে।

৫. বৈদেশিক শক্তির অধিক ক্ষমতা হয়ে থাকার ফলে জনসাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটেছে।

পাশ্চাত্য শক্তিগুলি কিভাবে মুসলমান রাজ্যগুলি বিশেষ করে তুর্কী সাম্রাজ্যের সঙ্গে বার বার চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডেও বেশ বড় একটা অংশ জুড়ে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পাশ্চাত্য শক্তিগুলির মধ্যে ইংরেজদের ভূমিকা জঘন্যতম। এই সমস্ত ঘটনা থেকে এই সত্যটাই বেরিয়ে এসেছে যে, ইংরেজরাই মুসলমানদের বড় শত্রু। কাজেই মুসলমানদের নিজেদের এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের আতঙ্কস্বরূপ এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হওয়া উচিত।

হোসেন আহমদ মাদানি এই অভিমত পোষণ করতেন যে, সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ উনিশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে আহ্বান দিয়েছিলেন তার পরিণতি ঘটল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে। কিন্তু বিদ্রোহ ভেঙ্গে যাবার পর সরকারের তরফ থেকে যে ব্যাপক ও নিষ্ঠুর দমন নীতি চালানো হয়েছিল তার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিবেগ অনেকটা মন্থর হয়ে এলো। তাই আবার নতুন করে এবার আন্দোলন সৃষ্টি করবার প্রয়োজন দেখা দিল। এই ব্যাপারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করল, তারা প্রথম থেকে বুঝতে পেরেছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই সংগ্রাম কিছুতেই সফল হতে পারে না। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার মত যোগ্যতা একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। সেই কারণে ১৯২১ সালের পর থেকে কংগ্রেসের সাথে কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটলেও এবং বিশেষ করে ১৯২৯ সালে কংগ্রেস যখন পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করলো তারপর থেকে সৈয়দ আহমদ মাদানির জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর দ্ব্যর্থহীন

অভিমত এবং কংগ্রেসের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থনের দরুণ তাঁকে অনেক বাদ-বিসম্বাদের জালে জড়িয়ে পরতে হয়েছে।

এই সমস্যাগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে তিনি যে একতার নীতির একান্ত সমর্থক ছিলেন সেটাই সবথেকে গুরুতর বিতর্কের সৃষ্টি করে তুলেছিল। তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এদেশের হিন্দু ও মুসলমানকে সম্মিলিত জাতি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে এবং উভয়ের পক্ষে যা কল্যাণকর এমন পন্থা অবলম্বন করে চলতে হবে। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আধুনিক জাতিসমূহ বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে নয় ভৌগোলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে কবি ইকবালের অভিমত ছিল এই যে একমাত্র ধর্মকেই জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এবং ভাষা বা ভৌগোলিক ভিত্তির উপর জাতি গঠন করা সর্বনাশের কারণ। তাঁর মতে এ সম্পর্কে ভাষা বা আঞ্চলিকতার উপর নির্ভরতা ইসলাম বিরোধী চিন্তার পরিচায়ক। তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে আরবী ভাষা, তত্ত্ব বা ইসলামী সাহিত্য কোন কিছুর মধ্যেই মাদানীর এই নীতির প্রতি সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি মাদানির পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অশিষ্ট মন্তব্য করতেও ত্রুটি করেন নি এবং তাঁর কবিতার মধ্যদিয়েও তাঁর প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন।

ইকবালের এই সমস্ত উক্তি জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে এই আশংকা করে অনেকে হোসেন আহমদ মাদানিকে এর প্রত্যুত্তর দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এর ফলে তিনি 'সম্মিলিত জাতি ও ইসলাম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে এর উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন।

তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এই প্রশ্নটিকে দু'দিক দিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ১. কওম শব্দটির অর্থ ও সংজ্ঞা কি এবং 'মিল্লাত' শব্দটির সঙ্গে তার পার্থক্যই বা কি? ২. এ সম্পর্কে কোরান, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে কি অভিমত পাওয়া যায়।

তিনি আরবের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শব্দাবলীর অভিধান থেকে 'কওম' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন যে অন্যান্য অর্থ ছাড়াও যেখানে

পুরুষ ও মেয়েরা সাধারণ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়ে থাকে তাকেও 'কওম' বলা চলে। 'কওম' বললেই যে তাকে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোরান শরীফে শব্দটি কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে? রসুলের নিজের ধর্মের লোক এবং তার ধর্মের অবিশ্বাসী লোকদের নিয়েও যে সম্মিলিত জাতি গঠন করা হয়েছিল কোরানে তাকেও 'কওম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত জাতি সম্পর্কেও 'কওম' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

হোসেন আহমদ মাদানি 'কওম' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা যে কতদূর সত্য, মহম্মদের নিজের জীবন থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মহম্মদ তাঁর পয়গম্বরত্ব প্রাপ্তির চতুর্দশ বর্ষে প্যাগান আরবদের আক্রমণ থেকে মদিনা শহরকে রক্ষা করার জন্য মদিনার মুসলমান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেদের নিয়ে মিলিত 'কওম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি সন্ধি চুক্তির ভিত্তিতে এই 'কওম' গঠিত হয়েছিল।

এই চুক্তির শর্ত ছিল এই যে মুসলমান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। কিন্তু সমস্ত রকম জাগতিক ব্যাপারে তারা একই 'কওমের' লোক বলে গণ্য হবে।

কিন্তু 'মিল্লাত' শব্দটি একমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারেই প্রযোজ্য। কাজেই এথেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম কখনও মুসলমানদের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক জাতি গঠনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। বরঞ্চ অবস্থা বিশেষে তাকে উৎসাহিতই করেছে। এছাড়া ভারতের মত দেশে এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি দিক বিবেচনা করে দেখা দরকার। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রধানতঃ একই বংশ থেকে উদ্ভূত। তারা বহু শতাব্দী ধরে একই অঞ্চলে মিলে মিশে বসবাস করে এসেছে এবং তার ফলে তারা একে অপরের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। তারা একই মাতৃভাষায় কথা বলে এবং তারা একই ঐতিহ্যসূত্রে আবদ্ধ। তারা নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখলেও মিলিত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে একই সাহিত্য, একই ললিতকলা, একই সঙ্গীতবিদ্যা অর্থাৎ একই সাধারণ

সংস্কৃতির সৃষ্টি করে করে এসেছে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্কুল ও কলেজ পরিচালনায় এবং জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও প্রাদেশিক আইন সভায় তারা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে নানা বিষয়ে পরস্পরের সাথে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ করে আসছে।

এক-জাতীয়তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: মহম্মদ যে নীতির ভিত্তিতে মদিনায় এক-জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমিও ঠিক সেই অর্থে আমাদের দেশে এক-জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। অর্থাৎ এদেশের অধিবাসীরা ধর্মের দিক দিয়ে যাই হোক না কেন একই দেশের অধিবাসী বলে তারা সবাই ভারতীয় এবং সেই হিসাবে তাদের মিলিত জাতি গঠন করে তোলা প্রয়োজন। এখানে ধর্মীয় কার্য-কলাপের ব্যাপারে এক সম্প্রদায়ের উপর অপরে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে বা বাধা দিতে পারবে না। ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় আদর্শ এবং আরাধনা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। তাদের নিজস্ব ধর্ম অনুসরণ করে চলবার এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ধর্মপ্রচার করবার অধিকার থাকবে। তাঁকে আক্রমণ করে কবি ইকবাল যে শিষ্টতা বিরোধী বিপ্লবাত্মক কবিতা রচনা করেছিলেন, মাত্র এই ক'টি পংক্তির মধ্য দিয়ে তিনি তার মুখের মত জবাব দিয়েছিলেন। উর্দু থেকে বাংলায় সেই ক'টি কথা তর্জমা করে দেওয়া হচ্ছে:

"হে আরবের মরু পথচারী তীর্থযাত্রী আমার আশঙ্কা হচ্ছে তুমি যত চেষ্টাই করনা কেন, কিছুতেই সেই পবিত্র কাবাভূমিতে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। কেননা যে পথ ধরে চলেছ তা তোমাকে একমাত্র ইংলণ্ডে পৌঁছে দিতে পারবে।"

ইকবালের ব্যাপার শেষ করে আমরা এবার আবুল আলা মওছুদীর প্রসঙ্গে আসছি। মওছুদীর বক্তব্যকে তিনি এই বলে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন যে, মওছুদীর ধর্মীয় মতামত মূল 'সুন্নী' ধর্মমত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং খারা জিরে সম্প্রদায় প্রভৃতির মতন উন্মার্গগামীদের ধর্মমতের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। মওছুদীর বক্তব্য ছিল এই যে, মুসলমানদের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন

করা উচিত। তাদের পক্ষে কোন অমুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এ সম্পর্কে মাদানি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন যে মওদুদীর এই অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং তা কোনমতেই গ্রহণ যোগ্য নয়।

স্বাধীন ও অবিভক্ত ভারতের গঠনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে হোসেন আহমদ মাদানি তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন, তার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হচ্ছে :

১. ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গঠিত হবে। এবং এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন। তিনি কার্য নির্বাহক বিভাগে সর্বাধিনায়ক বলে গণ্য হবেন।

২. কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলমান প্রতিনিধিরা অবশ্যই সংখ্যালঘু হবেন, কিন্তু গঠনতন্ত্রে তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন এবং অর্থ কেবলমাত্র এই বিভাগগুলিই কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন থাকবে। অবশিষ্ট বিভাগগুলির পরিচালনার ভার প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে। ধর্মীয় বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে।

৩. শিক্ষার বিষয়টা প্রাদেশিক বিভাগ বলে গণ্য হবে।

৪. ইসলামী শরিয়ত ও ইসলামী ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক হবে না।

৫. দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে সরকারকে সংগঠিত করে তুলতে হবে।

হোসেন আহমদ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে অংশীদার হওয়ার একটা ঐক্যের চুক্তিকে কার্যকর করার জন্য মুসলমানদেরও কতগুলি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা হচ্ছে এই—

"মুসলমানরা যে সমস্ত ব্যাপারে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সেই সমস্ত শর্তগুলি তাদের অবশ্য পালনীয়। তার ফলে এমনও

হতে পারে যে, বিশ্বের মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ চলেছে, সেই ব্যাপারে এখানকার মুসলমানদের কোন রকম সমর্থন দেওয়া বা সাহায্য করার অধিকার থাকবে না এবং এই চুক্তির মধ্যে এই মর্মে কোন শর্ত থাকলে তারা এ বিষয়ে তাদের সমস্ত রকম সাহায্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য থাকবে।"

হোসেন আহমদ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কিত তাঁর এই নীতির নিরিখে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক নীতিকে যাচাই করে এই রায় দিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগের নীতি যে শুধু সামগ্রিকভাবে ভারতের স্বার্থবিরোধী তাই নয়, এই নীতি কার্যকরী করা হলে ভারতের মুসলমান এমন কি সারা বিশ্বের মুসলমানদের স্বার্থও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

মুসলিম লীগের জন্ম ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯০৬ সালে বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সৃষ্টি করে তোলা হয়েছিল, এ ব্যাপারে আলিগড়ের মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ আর্চিবল্ড সাহেবের মারফৎ তারা এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯০৬ সালে যাঁরা সিমলায় সরকারের কাছে ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন তাঁরাই ছিলেন মুসলিম লীগ গঠনের আহ্বায়ক। মওলানা মহম্মদ আলীর ভাষায় তারা তাদের হুজুরদের আদেশ তামিল করার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করে-ছিলেন। ধনী, জমিদার, সরকারী খেতাবধারী বা চাকুরির উমেদার প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মুসলমান এই দলের মধ্যে ছিলেন, জনপ্রিয় নেতা বা জনসেবক বলা যায় এমন লোক এদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। প্রথম পাঁচ বছরে মুসলিম লীগের যে সমস্ত বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের মুল উদ্দেশ্য ছিল রাজভক্তি প্রদর্শন করা, সকল রকম রাজনৈতিক আন্দোলনের নিন্দা করা এবং সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো।

তারপরে এদের এই নীতির কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। তার কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলমান রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ বিরোধী কাজ করে চলেছিল। বলকান অঞ্চলের যুদ্ধগুলি এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমানদের অসন্তোষ ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছিলো। যার ফলে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের কিছুটা কাছে এসে

সামিল হতে হলো। ১৯১৮ সালে বহু উলেমা কংগ্রেসে যোগদান করল। কিন্তু কংগ্রেস ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করার পর মুসলিম লীগের নেতারা ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ১৯২১ সালে মুসলিম লীগ জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেল এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলো।

হোসেন আহমদ মাদানি মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ভারতকে যদি দ্বিধা-বিভক্ত করা হয় তা'হলে তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বহির্ব্যাপারে মারাত্মক কুফল দেখা দেবে—তিনি এই ভবিষ্যৎ-বাণীও করেছিলেন।

এ সম্পর্কে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, "ভারতকে যদি দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয় তা হলে তা মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে সব-চেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হবে, তার ফলে তাদের নিজেদের ভিতরের একতা ভেঙ্গে যাবে। যে সমস্ত প্রদেশে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে গণ্য হবে সেখানে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার বিলোপ ঘটবে। অধি-কাংশ প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বহির্ব্যাপারে কত-গুলি দুরূহ সমস্যার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে। সরকারকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলবার জন্য বাধ্য হয়ে বাইরের অপর কোন শক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থী হতে হবে, আর তার পরিণতি কি দাঁড়াবে? একথা বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, সেই অবস্থায় তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতাটা অন্যান্য বৈদেশিক শক্তি ও তাদের দেশের ধনিক শ্রেণীর হাতে চলে যাবে। তাছাড়া সরকার তার অর্থ সম্পদের অভাব ও ব্যয় বাহুল্যের দরুণ তার দেশরক্ষার দায়িত্ব যথোচিতভাবে প্রতিপালন করে চলতে সক্ষম হবে না। তার ফলে তাকে তার দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ইংলণ্ডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গাঁটছড়ার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। এর ফলে তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের লাগামটা ইংলণ্ডের হাতেই তুলে দিতে হবে।"

"বহির্ব্যাপারে ও স্বাধীনতা রক্ষার এই নব গঠিত ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রটিকে এর চেয়েও অধিকতর দুর্গতি ভোগ করতে হবে। ভারত ও

পাকিস্তানের ধর্মান্ধতা ও পারস্পরিক বিরোধ বৃটেনের হাতে সবচেয়ে বেশী সুবিধা লাভের সুযোগ এনে দেবে। এইভাবে ভারতের বৃটিশ শাসনের অবসান হওয়া সত্ত্বেও প্রকারান্তরে এই দেশের উপরে ইংরেজদের শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবে।"

"তাছাড়া দেশ বিভাগের ফলে দুটি রাষ্ট্রই দুর্বল হয়ে পড়বে। কাজেই বাইরের কোনো শক্তি এসে আক্রমণ করলে তাকে প্রতিরোধ করা উভয়ের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। উপরন্তু এই দুটি পৃথক রাষ্ট্রের এশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের শক্তি আরও কমে যাবে। ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তারা তাদের প্রভাব একেবারেই হারিয়ে ফেলবে।"

হোসেন আহমদের রাজনৈতিক দৃষ্টি কতদুর গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য থেকে সে কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মুসলিম লীগ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে একথা প্রচার করে আসছিল যে, মুক্ত ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। মাদানি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এই আশঙ্কা নিতান্তই কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত। তি নি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস উলেমাদের সাথে একমত হয়ে স্বাধীন ভারতের যে খসড়া-গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেছে তাতে যে কোন যুক্তি সম্পন্ন লোক এ বিষয়ে সু-নিশ্চিত হবে যে তার মধ্যে মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার সুযোগ রয়েছে। তাঁর মতে পাকিস্তান গঠনের ফলে যে সমস্ত বিপদের আশঙ্কা দেখা দেবে তার তুলনায় মুক্ত ভারত মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে অনেক বেশী অনুকূল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর এই সমস্ত যুক্তিপূর্ণ কথা তখনকার দিনের ভাবাবেগ ও ভ্রান্ত সংস্কারের বন্যাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

দেওবন্দের উলেমারা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন, তারা জমিয়তুল উলেমা প্রতিষ্ঠানটির স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল যে, ভারতের বিশিষ্ট উলেমারা যেন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের মতামত গঠন করে তুলতে পারেন। মাহমুদ আল হাসান ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রেসিডেন্ট। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জমিয়তুল উলেমা সম্মেলনে তিনি

যে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই এর কর্মসূচী ও কার্যাবলীর উদ্দেশ্য সুচিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার জন্য দেওবন্দ জমিয়তুল উলেমার উলেমারা যে আত্ম-ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। তাঁরা তাঁদের এই ব্রত পালনের জন্য যে গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আর্থিক এবং অন্যান্য ব্যাপারে এমন কোন আত্মত্যাগ নাই যা তাঁরা করেন নি অথবা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। শৈশব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের অত্যন্ত অর্থ-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হতো। ভালভাবে বেঁচে থাকবার মতো খাওয়াও জুটত না। আরাম বা বিলাসের কোন প্রশ্নতো আসেই না। তাদের স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়েই হোক বহুকাল নির্বাসন অবস্থায় তাদের দিন কাটাতে হয়েছে। অথবা ইংরেজদের জেলখানায় জীবনপাত করতে হয়েছে। জেলখানায় তাদের উপর কটূক্তি বর্ষণ করা হয়েছে, চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করা হয়েছে এবং জেলখানার কয়েদীরা যেটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

মাহমুদ আল-হাসান, হোসেন আহমদ মাদানি, ওবায়েছুল্লা সিন্ধি প্রমুখ উলেমারা এই সমস্ত দুঃখ ভোগ ও লাঞ্ছনা নিঃশব্দে সহ্য করে গেছেন। এগুলিকে তারা মানুষ ও ভগবানের সেবা কার্যের অর্থ-হিসাবে হাসিমুখে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে সারা দেশ হতাশা ও অবসাদে ছেয়ে গিয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু এই আশা ভঙ্গের বেদনা ও অবসাদ খুব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ইতিপূর্বে 'স্বাধীনতা' ছিল একটা দূর সুখ-স্বপ্ন, যাকে ঘিরে মানুষ কল্পনার জাল বুনত। কিন্তু এ যুগে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বায়ত্বশাসন, শুধু স্বায়ত্ব-শাসন নয় পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের কাছে নিকট ও অনিবার্য আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতবাসীদের এই চিন্তাধারা দ্রুত প্রবাহে এগিয়ে চলেছিল। ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মকে তারা অবজ্ঞায় আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাদের পুরনো দিনের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে বসেছিল। তারা আশা করছিল, ১৯২৮ সালে পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ সভ্যদের দ্বারা গঠিত সাইমন কমিশনের তদন্তের পর আরও কিছু ছিঁটেফোটা অধিকার দিয়ে এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মুখ কিছুকালের জন্য চাপা দেওয়া যাবে। ভারত যদি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতেও পারে, বর্তমান শতাব্দীতে তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই, এই বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল। তাদের ভরসা ছিল মুসলমান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় এবং দেশের রক্ষণশীল মতাবলম্বী নেতৃবৃন্দের উপর। তারা মনে করেছিল, সাইমন কমিশন বর্জন সম্পর্কে কংগ্রেস যতই গর্জন করুক না কেন, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে বোঝাপড়া করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সাইমন কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না।

এ সম্পর্কে তদানীন্তন ভারত-সচিব বারকেনহেড স্পষ্ট ভাষায় তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, "ভারতীয়দের মধ্যে যারা সাইমন কমিশনকে

বর্জন করার কথা বলছে, প্রকৃত বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যারা এই বর্জন আন্দোলনকে সংগঠিত করে তুলছে তাদের মনে এই ধারণা আছে যে তারা পরস্পর-বিরোধী উপাদানে গঠিত এই বিশাল দেশের যথার্থ প্রতিনিধি। তাদের এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত, এখন থেকে প্রতিটি মাসের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই সত্যটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে একমাত্র বৃটিশ সরকারই হচ্ছে দায়িত্বশীল ট্রাস্টি, তাদের উপরেই এই দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। তারা যাই মনে করুক না কেন, লক্ষ লক্ষ মুসলমান, অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু এবং ব্যবসায়ী মহল ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা এই কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য এগিয়ে আসবে এবং কমিশন যথা সময়ে পার্লামেন্টে তার রিপোর্ট পেশ করবে।" কিন্তু বারকেনহেডের নিজের এই অভিমতের উপর যতই বিশ্বাস থাক না কেন, কার্যক্ষেত্রে সেটা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা সাইমন কমিশন বর্জনের এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়েছিল এবং এই বর্জন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতে এক নূতন প্রাণ শক্তির সঞ্চার হয়ে উঠেছিল।

সারাদেশ জুড়ে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন চলেছিল। ১৯২৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এর বিরুদ্ধে এক প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সরকার তাদের এই প্রতিবাদের কোন মূল্য দেওয়া প্রয়োজনবোধ করলেন না। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধিতার মনোভাব আরও তীব্র হয়ে দেখা দিল।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে উপস্থিত ১৫০০০ লোকের সামনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হল এবং বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীতও হল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই সিদ্ধান্তটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হল এই যে এখন থেকে কংগ্রেস বৃটিশ ডোমিনিয়ন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করল। অতঃপর কংগ্রেস দেশের কেন্দ্রীয়

ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহ ও সরকার কর্তৃক গঠিত যে কোন সংস্থা বর্জন করে চলবে এবং সংগ্রামের পন্থা হিসাবে যেখানে প্রয়োজন মনে করবে সেখানেই আইন অমান্য আন্দোলন, এমনকি প্রয়োজন বোধে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনও পরিচালনা করবে।

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২টার সময় নববর্ষের প্রাক্কালে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। অতঃপর নববর্ষের প্রভাতে হাজার হাজার লোকের বিপুল ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা এই প্রথমবারের মতো উত্তোলিত হল।

এই উপলক্ষে সম্মেলন মণ্ডপে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আবদুল গফফার খান এবং কয়েকশ' পাঠান কর্মী এই সম্মেলনে দর্শক হিসাবে যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকলেও আবদুল গফফার খান এবং তার খুদাই খিদমতগার বাহিনী সংগঠন হিসাবে তখনও কংগ্রেসের বাইরে ছিল। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে আনন্দের আতিশয্যে তারা উপস্থিত সবাইকে চমৎকৃত করে দলবদ্ধভাবে তাদের উপজাতীয় নাচ নাচতে শুরু করেছিল। এই উৎসাহের জোয়ারে সম্মেলনের সভাপতি জওহরলাল নেহেরু স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। তিনিও তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের একজনের পাগড়ী মাথায় পরে সেই যৌথ নৃত্যে যোগদান করেছিলেন। সীমান্ত প্রদেশের যে পাঠানরা আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে তুলেছিল, একি তারই পূর্বাভাস?

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে, কিন্তু গত কটি বছরে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল, এক দশক আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান বৃটিশের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনের ভিতটা ছিল একেবারেই কাঁচা। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল স্বরাজলাভ, আর খিলাফত পন্থীরা চেয়েছিল এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তুরস্কের হৃত খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। এইভাবেই জোড়াতালি দিয়ে রাজনৈতিক মিলন যে সম্ভব

হয় না, গান্ধীজী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহারের পরেই তা প্রমাণিত হয়ে গেল। তাছাড়া তুরস্কের বিপ্লবীদের নেতা কামাল পাশা যখন তাঁদের এতদিনকার ধর্মীয় সংস্কারের শৃঙ্খলাকে ছিন্ন করে তুরস্কে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন এদেশে খিলাফতের সমস্যা নিয়ে যারা মাতামাতি করেছিল তাদের পায়ের তলায় আর মাটি রইল না। খিলাফত প্রতিষ্ঠার ধর্মীয় আহ্বানে যারা বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিল, তারা স্বাভাবিক কারণেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার রণক্ষেত্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সুযোগ-সন্ধানী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পক্ষে এইটাই ছিল অনুকূল সময়। আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে দেখা দিল হতাশার প্রতিক্রিয়া। তারই সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মহল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে চলেছিল, যার ফলে ১৯২৬ সালে কলকাতার বুকে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার হয়ে দেশের হিন্দু ও মুসলমান ক্রমেই দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে আসছিল। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিল মুসলিম লীগ। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চলল।

কিন্তু একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। রাজনৈতিক অধিকার লাভের সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে, দেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষই এই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিল। এই সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে হিন্দু ও মুসলমানকে অবশ্যই একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছতে হবে, একথাটা সবাই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিল। এজন্য উভয় পক্ষ থেকে চেষ্টাও করা হয়েছিল কিন্তু কার্যতঃ সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে সারা ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মুসলিম লীগ এই আন্দোলনের বিরোধী ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। মুসলিম লীগ সেই সময় এই দাবী তুলেছিল যে তারাই হচ্ছে সারা ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি-

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। কোন মুসলমান যাতে আন্দোলনে যোগ না দেয়, এইটাই ছিল তাদের প্রচার। এই প্রচার আন্দোলনের ক্ষতির কারণ হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাটাও স্বীকার করতে হবে যে তাদের এই চেষ্টা সেদিন সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নি।

মুসলিম লীগের এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা সত্ত্বেও একদল আদর্শনিষ্ঠ ও দৃঢ়চিত্ত কংগ্রেসী মুসলমান শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের বাইরেও মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের বিরোধী কয়েকটি দল গঠিত হয়েছিল। এই দলগুলি জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা-কামী মুসলমানদের নিয়ে গঠিত। কংগ্রেসের সঙ্গে সকল বিষয়ে পুরোপুরি একমত হতে না পারলেও তাদের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেসের উদ্যোগে পরিচালিত এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেছিলেন। এই দলগুলির নাম ও পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাচ্ছে।

১. ন্যাশনালিস্ট মুসলিম পার্টি—১৯২৯ সালেরজুলাই মাসে এলাহাবাদে মুসলিম লীগ বিরোধী মুসলমানদের এক সভায় ন্যাশনালিস্ট মুসলিম পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দেশপ্রেমিক মনোভাবের সঞ্চার করে তোলা এবং সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর উর্ধ্বে উঠে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তোলা যাতে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু মুসলিমদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাদের যথার্থ মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং মুসলমানরা যাতে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাধারণ শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করতে পারে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ এম এ আনসারী এবং তোসাদ্দক আহম্মদ খান সেরোয়ানী এই পার্টির যথাক্রমে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই পার্টি সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদ করে এবং এর বিরোধিতা করার জন্য সারা ভারতের মুসলমানদের প্রতি আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য আহ্বান জানায়। এই পার্টি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনসহ যুক্ত নির্বাচন প্রথাকে সমর্থন জানায়। এই পার্টি মুসলিম লীগের বিষাক্ত

আক্রমণকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তাদের আদর্শের প্রচার কার্য চালায়।

২. খুদাই খিদমতগার—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের একচ্ছত্র নেতা আবদুল গফফার খান তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করার আগে পাঠানদের মধ্যে সামাজিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে গড়ে তোলেন। পরে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। আবদুল গফফার খান ১৯২৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খুদাই খিদমতগার দলটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর এই দলের পরিচালনায় স্বভাবতঃ দুর্ধর্ষ যুদ্ধলিপ্সু পাঠানজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এ থেকে আবদুল গফফার খান ও তাঁর দলের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। খুদাই খিদমতগার বাহিনীর খ্যাতি শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দলের অনুগামীদের অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবাসীর এবং বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলমানদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে একমাত্র সীমান্ত প্রদেশ থেকেই বারো হাজার পাঠান কারাবরণ করেছিলেন।

৩. মজলিস-ই-আহরর—মুসলিম লীগ চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অবলম্বন করার ফলে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ থেকে একদল কর্মী মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ১৯২৯ সালে মওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানীর নেতৃত্বে মজলিস-ই-আহরর গঠন করেন। মজলিস-ই-আহরর ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের জন্য এবং কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানায়। তাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মুসলমান আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেছিল।

১৯৪০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মজলিস-ই-আহররের প্রাদেশিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি থেকে মজলিস-ই-আহররের আদর্শ ও লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। মজলিস-ই-আহররের এই সম্মেলন এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পুনরায় তার এই দৃঢ়

সংকল্পের কথা ঘোষণা করছে যে, ভারতের পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা লাভই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে দেশের লোক যে দুর্দশার মধ্যে আছে তার প্রতিকার হবে এবং এই স্বাধীনতা ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে সহায়ক হবে। এই সম্মেলন এই অভিমত পোষণ করে যে, ভারতকে দ্বিধা-বিভক্ত করার জন্য যে পরিকল্পনা চলছে তাকে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা যেতে পারে না। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার মনোভাব ক্রমশই বেড়ে চলবে। এই সম্মেলন মনে করে, যেহেতু এই উপমহাদেশে এই দুটি অংশের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই, সেই কারণে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ এর স্থায়ী পরিণতি হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে ভারত যে সমস্ত প্রদেশে বিভক্ত আছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও সেভাবেই প্রদেশগুলিকে গঠন করা বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভবও বটে। তবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে সকল প্রদেশের জন্যে একই রকম আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই সম্মেলন আরও মনে করে যে ভারতের সকল বয়স্ক লোকদের স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে প্রদত্ত ভোটদানের ভিত্তিতে গঠিত গণপরিষদে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র রচিত হওয়া উচিত। একমাত্র সেই গঠনতন্ত্রই সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে।

মুসলিম লীগই সমস্ত ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, মজলিস-ই-আহরর সবসময় কথা ও কাজে তাদের এই দাবীর প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত মজলিস-ই-আহরর বিরামহীনভাবে তার আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল।

৪. নিখিল ভারত শিয়া রাজনৈতিক সম্মেলন—নিখিল ভারত শিয়া সম্মেলন ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩০ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে এই পার্টির নিম্নলিখিত আদর্শ ও লক্ষ্য ধার্য করা হয়।

(ক) পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতা করা এবং মুসলমানদের জন্য

নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সুরক্ষিত করে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। মুসলমানদের নির্দিষ্ট আসনগুলির মধ্যে শিয়া মতাবলম্বীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(খ) শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে ভারতের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

লক্ষৌতে শিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনে তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে ১৯৩৫ সালে রচিত ভারত সরকারের অ্যাক্টকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়ে ভারতের ধনী, দরিদ্র ও সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতে একটি গঠনতন্ত্র রচনা করার জন্য দাবী জানানো হয়েছিল। তা ছাড়া এই সম্মেলন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। মুসলিম লীগই ভারতের সকল মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এই দাবীর বিরোধিতা করে মুসলিম লীগের আওতার বাইরে বহু মুসলমান রয়েছে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মুসলমান কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রয়েছে। কিন্তু খুদাই খিদমতগার বাহিনী তখনও সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের বাইরে ছিল। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস সম্মেলন থেকে তারা পূর্ণ স্বাধীনতার যে সংকল্প বহন করে নিয়ে এসেছিল, সারা প্রদেশব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করে তুলেছিল। পাঠানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বীরত্বপূর্ণ কাহিনী অবিস্মরণীয়।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ তারিখে গান্ধীজী লবণ-আইন ভঙ্গের ঐতিহাসিক অভিযানে ডাণ্ডিতে যাত্রা করলেন। এই উপলক্ষে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহেরুকে ১৪ই এপ্রিল তারিখে গ্রেপ্তার করা হল। সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সীমান্ত প্রদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা আদর্শে উদ্বুদ্ধ পাঠানদের দিকেও নিবদ্ধ ছিল। ২৩শে এপ্রিল তারিখে আবদুল গফফর খান উৎমনজাইতে

অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি পাঠানদের প্রতি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানালেন। পুলিশ আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল, সভা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তারা আবদুল গফফর খানকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় আটক করল। সেই থেকে শুরু করে যত দিন আইন অমান্য আন্দোলন চলেছিল, তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাননি।

ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক ও প্রবল রূপ ধারণ করে উঠল। আবদুল গফফর খান জেলখানায় বন্দী থাকা সত্ত্বেও সীমান্ত প্রদেশ এ বিষয়ে একটুও পিছিয়ে রইল না। খুদাই খিদমতগার বাহিনীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন সমগ্র প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই সময় মদের দোকানের পিকেটিংকে উপলক্ষ করে সরকারী সৈন্যবাহিনী পেশোয়ারের পাঠানদের উপর যে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছিল তা সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল পেশোয়ারের কিসসাখান বাজারে। নির্ধারিত সময়ে মদের দোকানে পিকেটিং শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার প্রতিবাদে রাজপথে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল চলেছিল। পুলিশ সেই মিছিলকারীদের উপর গুলি চালিয়ে এক নির্মম ও বিভৎস হত্যাযজ্ঞের সূচনা করল। ফলে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়েছিল। এই নগ্ন আক্রমণের মুখেও নিরস্ত্র জনতা ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এ যেন 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত-ভাবনাহীন'। এবার সৈন্যদের সাঁজোয়া গাড়ী থেকে দ্বিতীয়বারের মতো গুলিবর্ষণ চলল। এই গুলিবর্ষণের ফলে বহুলোক হতাহত হয়েছিল। হতাহতের সংখ্যা সঠিকভাবে বলা না গেলেও সেই সংখ্যা যে দুই তিন শোর কম নয় এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যারা এই হতাহতদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে পাঁচ-ছয় জন স্বেচ্ছাসেবকও গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। কাজেই সমস্ত মৃতদেহগুলিকে অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। সৈন্যরা তাদের লরীতে বোঝাই করে অন্যত্র চালান দিয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা আহত ছিল, তাদের পরিণতি কি ঘটেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। সেই বর্বর হত্যাকাণ্ডের

মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত দুর্দান্ত ও দুর্ধর্ষ পাঠানরা সেদিন সৈন্যদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে নির্ভীক-ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল। এই বীরত্বের তুলনা নাই।

এই ঘটনার পর ক'দিন ধরে পেশোয়ার শহরের নানা অঞ্চলে সৈন্যরা অবাধে অত্যাচার চালিয়ে গেল। পেশোয়ারের কিসসাখান বাজারের এই রক্ত-রাঙা কাহিনী শুধু ভারতেরই নয়, সারা পৃথিবীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বৃটিশ সরকার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই সত্যের মুখ চাপা দিয়ে রাখতে পারে নি।

কিস্‌সাখান বাজারে সংগ্রামী জনতার এই অপূর্ব আত্মোৎসর্গ এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ সারা সীমান্ত প্রদেশকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। শহর ও গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র দেখা দিল এক নূতন প্রেরণা ও উন্মাদনা। সাধারণ মানুষ মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে সংগ্রামের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সীমান্ত প্রদেশের মত ছোট্ট একটি প্রদেশ, এই আন্দোলনের ফলে সেখানে বারো হাজার লোক কারাবরণ করেছিল, সারা ভারতের সামনে এ একটি আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল। সীমান্ত প্রদেশের এই আন্দোলনের প্রভাব পাঠানদের মতই পশ্‌তুভাষী মানুষদের বাসভূমি পার্শ্ববর্তী বেলুচিস্তান প্রদেশেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বেলুচিস্তানের জনপ্রিয় নেতা আবদুস সামাদ খান আচকজাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে চিরদিনই অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। এই আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবদুল গফফার খান ও আবদুস সামাদ খান আচকজাই—সারা ভারতে 'সীমান্ত গান্ধী' ও 'বালুচ গান্ধী' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। দেশপ্রেমিক পাঠান ও বালুচদের এই সংগ্রামের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

আজ থেকে ২৮ বছর আগে এই উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু পাঠান ও বালুচদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি। প্রথম থেকেই পাঞ্জাবী শাসকচক্রের বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে তারা বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। সেই সংগ্রামেই চিরবিদ্রোহী বৃদ্ধ আবদুস সামাদ খান আচকজাই—গুপ্ত সরকারী দলের আক্রমণের ফলে শহীদ হয়েছেন। সেই সংগ্রামে সমগ্র পাঠান জাতির হৃদয় রাজ্যের রাজা বৃদ্ধ আবদুল গফফার খান আজ পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী।

আবদুল গফফার খান

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আবদুল গফফার খানের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। সেই কারণেই তিনি ভারতের সর্বত্র সীমান্ত-গান্ধী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। শুধু ভারতেই নয়, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এই বীর দেশপ্রেমিকের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঠানদের হৃদয়রাজ্যের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র রাজা। এই দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় পাঠান জাতিকে তিনি কি করে, কোন্ মন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অহিংস সংগ্রামের সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, দেশ-বিদেশের লোকের মনে তা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল।

তাঁর জন্ম ১৮৯০ সালে, পেশোয়ার জেলার চর্সদ্দার তহশীলের অন্তর্গত উৎমন্‌জাই গ্রামে। তিনি এক বিশিষ্ট ভূস্বামী খান-পরিবারের সন্তান। সীমান্ত প্রদেশের পাঠান জাতির এই সমস্ত খান বা সমাজপতিরা দীর্ঘদিন ধরে বৃটিশ অফিসারদের তাঁবেদারী করতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল। সরলমতি ও ধর্মান্ধ পাঠান জনসাধারণকে তারা নানাভাবে শাসন ও শোষণ করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করত। কিন্তু আবদুল গফফার খানের পরিবারের ঐতিহ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ বৃটিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। সমাজের লোকের কল্যাণের দিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁর পিতা বেহরাম খান অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক ছিলেন। প্রথম দিকে বৃটিশ সরকারের শুভেচ্ছা সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি তাঁর পুত্র গফফার খানকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা যুগিয়ে এসেছেন। আবদুল গফফার খান এই পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতের সীমান্ত অঞ্চল হিসাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে

বৃটিশ সরকার চিরদিনই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বোধ করে এসেছেন। তাছাড়া এই প্রদেশ ছিল তাদের সৈন্যদলের যোগানদার। সেজন্য পাঠান জাতি যাতে কোনও দিনই রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠতে না পরে, সে বিষয়ে তারা প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। এই কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও এই প্রদেশের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এখানে ওখানে দুটি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিক্ষা বিস্তারের কাজটা সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন। ফলে সমগ্র জাতি অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বোঝা বহন করে চলেছিল। ফলে তারা সামাজিক কু-সংস্কার, অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস ও নানাবিধ কুপ্রথার চিরন্তন শিকারে পরিণত হয়ে চলেছিল।

মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান পরিবারের সন্তান হিসাবে আবদুল গফফার খান আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। সারা উৎমনজাই গ্রামে তাঁর বড় ভাই ডাঃ খান সাহেবই সর্বপ্রথম উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। তিনি লাহোর মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য লণ্ডনে গিয়ে পড়েছিলেন। বয়সে তিনি তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড়। আবদুল গফফার খান বাল্যজীবনে তাঁর মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত 'এডোয়ার্ড মিশন' স্কুলে ভর্তি হলেন।

এডোয়ার্ড স্কুলের শিক্ষাজীবন তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই স্কুলে পড়ার সময় তিনি এখানকার অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড উইক-রাম ও তাঁর ভাই ডাঃ উইকরাম-এর গভীর সংস্পর্শে আসেন। তাদের পশ্চাৎপদ পাঠান সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষার বিস্তারই যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পথ এই সত্যটা তিনি তাঁদের সাহায্যে প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পরে এই আদর্শই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। যে কোন কারণেই হোক দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েই তাঁর এখানকার শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর পর শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে আলী-গড়ে পাঠান হয়। মাত্র বছর খানেক তিনি সেখানে ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য লণ্ডনে পাঠাতে চেয়েছিলেন। এজন্য

বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মার তাতে ভীষণ আপত্তি। তার ফলে মাতৃভক্ত আবছুল গফফার খান তাঁর মা'র মুখের দিকে চেয়ে শেষ মুহূর্তে বিলেত যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলেন। এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্কে তুরস্ককে বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করতে হয়। ফলে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় জগতের কেন্দ্র খিলাফতের পতন ঘটল। তার ফলে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর মধ্য দিয়েই খিলাফত আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারত থেকে হাজার হাজার মুসল-মান দেশ ত্যাগ করে আফগানিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল এই সমস্ত মুসলিম শক্তির সাহায্য নিয়ে তারা ভারতের বুক থেকে বৃটিশ শাসন উৎখাত করতে পারবে। এই আন্দোলন হিজরত আন্দোলন নামে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময় আবছুল গফফার খান রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে সচেতন ছিলেন। তাহলেও ধর্মীয় আন্দোলনের স্রোতের টানে তিনিও তাঁদের সঙ্গে দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিলেন।

এই হিজরত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর দেশে ফিরে এসে নিরক্ষর পাঠান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এই উপলক্ষে তিনি সীমান্ত প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন এবং তাঁর উদ্যোগে প্রদেশের নানা স্থানে কতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্য দিয়েই তিনি সমগ্র প্রদে-দেশের পাঠানদের মধ্যে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। অবশ্য একথা তিনি ভাবতেও পারেন নি যে এর মধ্য দিয়েই তাঁর ভবিষ্যৎ রাজ-নৈতিক জীবনের প্রস্তুতি চলেছে।

বৃটিশ সরকারের এজেন্টরা কিন্তু তাঁর এই শিক্ষা বিস্তারের অভিযানকে সুনজরে দেখতে পারেন নি। তাঁদের সন্দেহ ছিল যে এর মধ্যে তাঁর রাজ-নৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তিনি যাতে সাধারণের মধ্যে

শিক্ষা বিস্তারের পথ পরিত্যাগ করেন, সেজন্য সরকার পক্ষ থেকে কঠোরভাবে হুঁসিয়ারী দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি তাঁদের এই আপত্তিজনক প্রস্তাবে মাথা নোয়াতে রাজী হলেন না। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে এক মামলা আনা হলো। সীমান্ত প্রদেশের আইন ব্যবস্থা ছিল সারা দেশ থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বেচ্ছাচারমূলক। সেখানকার বিচিত্র বিধানে এই অভিযোগে তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এইখান থেকেই শুরু হল তাঁর জীবনের দীর্ঘ কারাবাসের পালা।

এই দীর্ঘ কারা-জীবনে তাঁকে বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হয় নি। এ এক ভীষণ পরীক্ষা। তখনকার দিনের সাধারণ কয়েদীদের মত কঠিন ক্লেশভোগের মধ্য দিয়ে তাঁকে কারাবাসের দিনগুলি যাপন করতে হয়েছিল। অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের মত তাঁর গলায় ঝুলত লোহার হাঁসলী, পায়ে বেড়ী। তাঁকে দিনরাত নির্জন সেলের মধ্যে আটক থাকতে হত। সাধারণ কয়েদীদের মত তাঁকেও দিনে ২০ সের করে গম ভাঙ্গতে হত।

এই দীর্ঘ কারাবাসের পর তাঁকে পেশোয়ার জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল।

এ পর্যন্ত পাঠানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের কাজই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। কিন্তু সে কাজ শুরু করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, বৃটিশ সরকার সেই পথের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাধাকে অপসারিত করতে না পারলে পাঠান সমাজের সত্যিকার কল্যাণ সাধন কোনমতেই সম্ভব নয়। এই কঠিন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর মনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার হয়ে উঠবে এটা খুবই স্বাভাবিক কথা।

১৯২১ সালে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে সারা ভারত টলমল করে উঠেছিল। সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরাও এই আন্দোলনের প্রভাব থেকে দূরে সরে থাকতে পারে নি। কিন্তু সংগঠনের দিক দিয়ে কি কংগ্রেস, কি খিলাফত কমিটি উভয়ই ছিল দুর্বল। এখানে প্রধানতঃ আবদুল গফফার খানকে কেন্দ্র করেই এই আন্দোলন গড়ে উঠল। আবদুল গফফার খান ৬ই এপ্রিল তারিখে তাঁর স্ব-গ্রাম উৎমনজাইতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসমাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ঠিক এই সময় বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আফগানিস্তানের যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। এই উপলক্ষে ভারত সরকার সমগ্র পেশোয়ার জেলায় সামরিক শাসনের ব্যবস্থা জারি করলেন। এই পরিস্থিতিতে আবদুল গফফার খানকে মর্দান জেলে নিয়ে আটক করে রাখা হল।

বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার শাস্তিস্বরূপ উৎমনজাই গ্রামের লোকদের উপর ত্রিশ হাজার টাকার পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হল। কিন্তু কার্যতঃ এই ত্রিশ হাজার টাকার স্থানে প্রায় এক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে তাঁর বৃদ্ধ পিতা বেহরান খানকেও তিন মাস কাল জেলে আটক থাকতে হয়েছিল। আবদুল গফফার খান এর ছয় মাস বাদে মুক্তি লাভ করলেন। এইবারই তিনি সর্বপ্রথম সচেতনভাবে রাজনীতির রণাঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে আবদুল গফফার খানের নেতৃত্বে সংগঠিত 'খুদাই খিদমতগার' বা লাল কোর্তা বাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

'খুদাই খিদমতগার' শব্দটির অর্থ 'খোদার সেবক'। আবদুল গফফার খানের মতে যাঁরা জনসাধারণের সেবক তাঁরাই হচ্ছে প্রকৃত খোদার সেবক। সেই অর্থেই তিনি খুদাই খিদমতগার শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিধানে ছিল লাল পোশাক। সেই কারণে তাঁরা রেড্-শার্ট-ভলান্টিয়ার বা লাল কোর্তা বাহিনী নামেও পরিচিত।

মূলতঃ সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ১৯২৯ সালে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। পরে ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এই লাল কোর্তা বাহিনীর নেতৃত্বে সারা সীমান্ত প্রদেশে ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলন চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, আবদুল গফফার খান তখনও কংগ্রেসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক

ভাবে সংশ্লিষ্ট হন নি, তবে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি একদল পাঠান সহকর্মীদের নিয়ে এই সম্মেলনে দর্শক হিসাবে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে আবদুল গফফার খান ও তাঁর সহকর্মীদের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। পূর্ণ স্বাধীনতার এই সংকল্পকে কার্যকর রূপ দেবার জন্য জ্বলন্ত প্রেরণা নিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন তাঁদের বাসভূমিতে।

অবশেষে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনের সূচনায় গান্ধীজী লবন আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ১২ই মার্চ তারিখে ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে তাঁর ঐতিহাসিক অভিযান শুরু করলেন। এর প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরুকে ১৪ই এপ্রিল তারিখে গ্রেফতার করা হল। ইতিমধ্যে এই আন্দোলন সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরাও খোদাই খিদমতগার বাহিনীর পরিচালনায় এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ২৩শে এপ্রিল তারিখে আবদুল গফফার খান তাঁর স্ব-গ্রাম উৎমনজাইতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলের প্রতি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। ফলে সভার পর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নকী থানায় নিয়ে আটক করে রাখল।

আবদুল গফফার খানের গ্রেফতারের ফলে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা দমে যাওয়া দূরে থাক, তাদের আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। যে সমস্ত জায়গায় খুদাই খিদমতগারের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত ছিল না, সেখানেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদাই খিদমতগার বাহিনী গড়ে উঠতে লাগল। সারা প্রদেশ লাল কোর্তায় ছেয়ে গেল। লালে লাল হয়ে উঠল সীমান্ত প্রদেশ। একটা জিনিস সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে, গভীর উত্তেজনার কারণ থাকা সত্ত্বেও এই আন্দোলনে লাল কোর্তা বাহিনী কোথাও অহিংসার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় নি, তারা পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে। পেশোয়ার শহরের মদের দোকানের পিকেটিংকে উপলক্ষ করে এক বিরাট বিক্ষোভ ঘটেছিল। সে সময় সরকারী সৈন্যবাহিনী হাজার হাজার নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ জনতার উপর অজস্র গুলিবর্ষণ করে যে পৈশাচিক

হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিল, সেই কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু তার ফলে আন্দোলনের গতি কমা দূরে থাক বরঞ্চ বেড়েই চলল।

সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দিনের পর দিন যে বর্বর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল, সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সারা সীমান্ত প্রদেশকে ঘেরাও করে তাকে সমগ্র দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। যাতে এখানকার কোন সংবাদ বাইরে গিয়ে পৌঁছতে না পারে।

আবদুল গফফার খান ও তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন সহকর্মী তখন সীমান্ত প্রদেশের বাইরে পাঞ্জাবের গুজরাট জেলে বন্দী জীবন যাপন করছিলেন। জেলে আসার পর থেকে এ সমস্ত কোন খবরই তাঁর কাছে পৌঁছায় নি। কিন্তু এই খবর বেশী দিন চাপা রইল না। জাফর শাহ ও আবদুল্লাহ শাহ নামে তাঁর দুজন সহকর্মী গোপন পথে সীমান্ত প্রদেশের লৌহ বেষ্টনী ভেদ করে বেড়িয়ে এসে গুজরাট জেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

এ পর্যন্ত খোদাই খিদমতগার বাহিনী কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কোন প্রতিষ্ঠানেই যোগদান করেনি। আবদুল গফফার খান তাঁর এই দুজন সহকর্মীকে দিল্লীতে প্রথম মুসলিম লীগ এবং পরে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠালেন। এদের মারফত তিনি তাদের কাছে এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার চলেছে, তারা যেন তার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করেন। আর সেটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এই খবরগুলি যাতে বাইরের দুনিয়ায় প্রচারিত হতে পারে তারা যেন তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করেন। মুসলিম লীগ নেতারা তাঁর এই অনুরোধ কর্ণপাত করেননি। আর কংগ্রেস নেতারা জানালেন যে খুদাই খিদমতগার বাহিনী যদি এই আন্দোলনে সহযোগিতা করে চলে, তাহলে তাদের পক্ষে যতদূর সাধ্য তা তারা করবে। এই উত্তর পাওয়ার পর আবদুল গফফার খান খুদাই খিদমতগার বাহিনীর পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান করাই সঙ্গত হবে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর-

লেন। অতঃপর এই দুজন সহকর্মীর মারফত তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিমত অনুমোদনের জন্য সীমান্ত প্রদেশের খুদাই খিদমতগার বাহিনীর প্রাদেশিক কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রাদেশিক কমিটি তাঁর এই প্রস্তাবকে অনুমোদন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা সংবাদপত্র মারফত এই সংবাদটিকে সারা দেশে প্রচারিত করল।

এই সংবাদ পাওয়ার পর বৃটিশ সরকারের টনক নড়ল। তারা বুঝতে পারল যে তারা নিজেদের বুদ্ধির দোষে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের কংগ্রেসের হাতে তুলে দিয়েছে। আর দেরী নয়, সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের তরফ থেকে জেলখানায় আবদুল গফফার খানের কাছে এক অনুরোধসূচক প্রস্তাব গেল যে তিনি যদি কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন, তাহলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত রিফর্ম দেওয়া হয়েছে সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কেও সেগুলি প্রযোজ্য হবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে সীমান্ত প্রদেশকে এর চেয়েও উচ্চতর পর্যায়ের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হবে, সরকার এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন। আবদুল গফফার খান ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন অবসানের পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে আবদুল গফফার খানও মুক্তি লাভ করলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এবারেও বৃটিশ সরকার যুদ্ধোদ্যোগের ব্যাপারে কংগ্রেসের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও আবদুল গফফার খান তাঁদের অহিংসার আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই যুদ্ধে সহযোগিতা করতে অসম্মত ছিলেন। এ বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে তাঁদের মতানৈক্য ছিল। যুদ্ধোদ্যোগের কার্যে সাহায্য করতে ওয়ার্কিং কমিটির নীতিগতভাবে কোন আপত্তি ছিল না। তবে তারা তার বিনিময়ে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আবদুল গফফার খান সে সময় ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯৪২ সালে গঠনমূলক কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে

পরিভ্রমণ করে চলেছিলেন।

এদিকে জাপান রেঙ্গুন শহর দখল করে নেওয়ার ফলে ভারতের দিক থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতি খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবাই আশংকা করছিল জাপানীরা অনিবার্যভাবে ভারতে এসে প্রবেশ করবে এবং ভারত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। এই আশংকা সীমান্ত প্রদেশে সংগঠনের কাজে রত আবদুল গফফার খানের মনেও দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজীর মত তিনিও স্থির করেছিলেন যে, তারা অহিংস অসহযোগের পন্থায় আক্রমণকারী জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের কথা বুঝতে পেরে গান্ধীজী অনেক দিন আগেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। কিন্তু জাপানীদের আক্রমণ যখন আসন্ন হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই মর্মে এক জরুরি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, বৃটিশ সরকার অবিলম্বে তার সৈন্যবাহিনী সহ এদেশ ত্যাগ করে চলে যাক্, ভারতবাসীরা নিজেরাই তাদের নিজেদের পন্থায় আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করবে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে এ কথাও ছিল যে, বৃটিশ সরকার যদি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, তাহলে সারা ভারতব্যাপী শেষ সংগ্রাম শুরু করা হবে। 'ডু অর ডাই' (Do or Die) অর্থাৎ 'করেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে' এটাই হবে এই সংগ্রামের আদর্শ। এই প্রস্তাবই 'কুইট-ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব। ঐতিহাসিক ৯ই আগস্ট তারিখে এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় অনুমোদিত ও গৃহীত হল।

এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি বিবেচনার জন্য বড়লাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা-দের গ্রেফতার করে এই প্রস্তাবের উত্তর দিলেন। দেশের মানুষ উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব বিক্ষোভ-আন্দোলন বিস্ফোরিত হয়ে পড়ল।

এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার সর্বত্র কঠিন দমননীতি প্রয়োগ করে চলেছেন। কিন্তু তার ফল হল বিপরীত। আন্দোলন এবার

তার প্রচণ্ড গতিবেগে অহিংসার আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনতা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে মেতে গেল। এরই নাম 'কুইট-ইণ্ডিয়া' আন্দোলন।

'কুইট-ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে সরকার এবার সীমান্ত প্রদেশের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। ৯ই আগস্টের পর থেকে যখন ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস নেতা ও বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতার চলল, সেসময় সারা সীমান্ত প্রদেশে একটি লোককেও গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকি আবদুল গফফার খান ও তাঁর ভাই খান সাহেব পর্যন্ত গ্রেফতার হননি। এর উদ্দেশ্য এই যে, বৃটিশ সরকার এর মধ্য দিয়েই সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে একথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীরা এই আন্দোলনে যোগদান করেন নি। পুরো এক মাস পর্যন্ত এইভাবে চলল। কিন্তু এই কৌশল কোন কাজেই এল না। সীমান্ত প্রদেশের আন্দোলন ক্রমে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, সরকার শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হল। কিন্তু যত না গ্রেফতার চলল, তার চেয়ে অনেক বেশী চলল মারপিট আর বর্বর অত্যাচার। আবদুল গফফার খানকে গ্রেফতার করার সময় তাঁর উপর এমনভাবে বেটন চালানো হয়েছিল যে, তার ফলে তাঁর কোমরের পাঁজরের একটা হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। এ অবস্থায় জেলে নিয়ে আটক করার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি।

'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন এক বিরাট গণবিদ্রোহের ইতিহাস সৃষ্টি করে অবশেষে স্তিমিত হয়ে গেল। আন্দোলন থামল বটে কিন্তু বৃটিশ সরকার এর মধ্য দিয়েই কালের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন এবার সত্য সত্যই তাদের ভারত ত্যাগ করে চলে যাবার সময় এসে গেছে।

১৯৪৬ সালে সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও তার বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মধ্য দিয়ে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতের মুসলমান-প্রধান প্রদেশ-

গুলিতে এই নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা সীমান্ত প্রদেশ। এখানকার মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে কংগ্রেসের বিরাট প্রভাব। সে কথাটা চিন্তা করে তারা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবক ও ধর্মোন্মাদ মোল্লা-মৌলবীদের সীমান্ত প্রদেশে এনে জড় করেছিলেন। তাদের নির্বাচনের প্রচারণার মূল কথা ছিল—আপনারা ইসলামকে চান না কাফেরীকে চান, মসজিদকে চান, না মন্দিরকে চান, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারই ফয়সালা হবে। বৃটিশ সরকার এই নির্বাচনে তাদের মদত জোগাচ্ছিলেন, এমনকি বৃটিশ অফিসাররা প্রকাশ্যে মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার কার্য করে চলেছিল। কিন্তু সবকিছু সত্বেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-ই নির্বাচনে জয়লাভ করল এবং ডাঃ খান সাহেবের মুখ্যমন্ত্রীত্বে এই প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হল। আবদুল গফফার খান মন্ত্রীসভার বাইরে ছিলেন।

অবশেষে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কংগ্রেসের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বিরোধী হলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় ভিত্তিতে পরিকল্পিত এই দেশ বিভাগের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। প্রথমে এটাই স্থির ছিল, মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে যে সকল প্রদেশে জয়লাভ করেছিল, তাদের নিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রদেশগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সেই হিসেবে সীমান্ত প্রদেশের ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মুসলিম লীগ ও বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এক নতুন প্রস্তাব তোলা হল যে, সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা ভারত অথবা পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগ দিতে চায়, তা নির্ধারণ করার জন্য সীমান্ত প্রদেশে গণ-ভোট গ্রহণ করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাদের এই অসংগত আবদারটি নিঃশব্দে মেনে নিলেন।

আবদুল গফফার খান কিন্তু কিছুতেই এই প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারেন নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই ব্যবহারে তাঁর মনে গভীর বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে একাধিকবার "আপনারা

আমাদের একদল নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন," "আপনারা আমাদের হাতে পায়ে বেঁধে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছেন" ইত্যাদি উক্তি করেছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতিবাদে সেদিন কোনই ফল হয় নি।

গণভোট অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর নীতিগতভাবে আপত্তি ছিল। তাছাড়া গণভোট অনুষ্ঠিত হলে সারা সীমান্ত প্রদেশেই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ধ্বংস কার্য পরিচালিত হবে সেই ভবিষ্যৎ চিত্রটা তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। মুসলিম লীগের গুণ্ডারা ইতিমধ্যে সীমান্ত প্রদেশে কর্মীদের ঘরে ঘরে আক্রমণ করে মারপিট, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। বৃটিশ অফিসাররা পিছন থেকে তাদের উৎসাহ যুগিয়ে চলেছিল। এই অবস্থার মধ্যে সত্যিকারের গণভোটের অনুষ্ঠান কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না। তাই তিনি সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন, সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস এই গণভোটে যোগদান করতে পারে না। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও শান্তিপূর্ণভাবে গণভোট অনুষ্ঠানকে বয়কট করার প্রস্তাব গ্রহণ করল। তার ফলে সীমান্ত প্রদেশে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হল, তা গণভোটের প্রহসন মাত্র। আর এই প্রহসনের মধ্যদিয়ে কংগ্রেসের এই শক্তিশালী কেন্দ্রটি সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

১৯৪৭ সালের ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হল। পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করল বটে, কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের পাঠান ও বালুচরা এই স্বাধীনতাকে যথার্থ স্বাধীনতা বলে গ্রহণ করে নিতে পারে নি। অনেকদিন আগে থেকেই তারা পশতুভাষী পাঠান ও বালুচদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্য পাখতুনিস্তান গঠনের দাবী জানিয়ে আসছিল। এবার আবদুল গফফার খান ও বালুচ নেতা আবদুস সালাম খান-এর নেতৃত্বে সেই দাবী নিয়ে বলিষ্ঠভাবে সামনে এগিয়ে এলো। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পাঞ্জাবী শাসকচক্র আগে থেকেই এই দুটি জাতীয়তাবাদী প্রদেশের উপর খড়্গ হস্ত ছিলেন। তাছাড়া বিপুল খনিজ সম্পদের সম্ভাবনাপূর্ণ বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের মত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের

নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তারা দৃঢ় সংকল্প ছিলেন।

মুসলিম লীগের কুৎসা এবং পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধতাকে অগ্রাহ্য করে আবদুল গফফার খান ও খুদাই খিদমতগার বাহিনী পাখতুনিস্তানের আদর্শকে সামনে রেখে দিনের পর দিন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এই আন্দোলন ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠতে লাগল।

একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতা লাভের সময় সীমান্ত প্রদেশে ডাঃ খান সাহেবের মুখ্যমন্ত্রীত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রশাসন কার্যে নিযুক্ত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নাহ্ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায় এই মন্ত্রীসভাকে খারিজ করে দিয়ে মুসলিম লীগের কুখ্যাত নেতা আবদুল কাইয়ুম খান-এর মুখ্যমন্ত্রীত্বে লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে মিঃ জিন্নাহ্ গভর্নর জেনারেল হিসাবে প্রথমবারের মত সীমান্ত প্রদেশে এলেন। আবদুল গফফার খান গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নাহ্কে অভ্যর্থনা দানের জন্য খুদাই খিদমতগারদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আবদুল কাইয়ুম খান প্রথম থেকেই মিঃ জিন্নাহ্র কাছে আবদুল গফফার খান ও খুদাই খিদমত-গার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছিলেন। তাঁর কু-পরামর্শে চালিত হয়ে মিঃ জিন্নাহ্ আবদুল গফফার খানের এই আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেন এবং সীমান্ত প্রদেশ ত্যাগ করে রাজধানীতে ফিরে যাবার সময় খুদাই খিদমতগার বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

আবদুল গফফার খান অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল আদর্শকে সামনে রেখে 'পিপলস্ পার্টি' নামে একটি পার্টি গঠন করেছিলেন। এই পার্টি দেখতে দেখতে জনপ্রিয় হয়ে উঠল, পাঠানরা দলে দলে এই পার্টিতে যোগ দিতে লাগল।

অবস্থা দেখে পাকিস্তান সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং তারা আব-দুল গফফার খানকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এক মামলা আনা হল। এই অভিযোগের উত্তরে, 'আমি সম্পূর্ণভাবে

নির্দোষ' এই একটিমাত্র উক্তি করা ছাড়া আবদুল গফফার খান আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আর কিছুই করেন নি। তাঁকে ফ্রন্টিয়ার ক্রাইমস্ রেগুলেশনের ৪০ ধারা অনুযায়ী ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

আবদুল গফফার খানকে জেলখানায় আটক করার পর সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল কাইয়ুম খান খুদাই খিদমতগার বাহিনীর উপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করলেন। আবদুল গফফার খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে খুদাই খিদমতগার বাহিনী নানা স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। এবার তাদের দলে দলে গ্রেপ্তার করা হতে লাগল এবং সারা সীমান্ত প্রদেশে নেমে এল নিদারুণ অত্যাচার।

এই উপলক্ষে ১৯৪৮ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে চরসদ্দার অন্তর্গত বাবরা গ্রামে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। সরকারী হিসাবে এই গুলিবর্ষণের ফলে ১৫ জন হত ও ৫০ আহত হয়েছিল। এই হিসাবটা একেবারে মিথ্যা। পরে জানা গেছে যে এই গুলিবর্ষণের ফলে শত শত লোক সেখানে প্রাণ দিয়েছিল।

তাঁর কারাবাসের ৩ বৎসর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আবদুল গফফার খানকে ১৮১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন অনুযায়ী রাজবন্দী হিসাবে আটক করা হল।

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে তাঁর এক গুরুতর ধরনের অস্ত্রোপচার হয়। তখন তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরেও বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে আবদুল গফফার খানকে রাওয়ালপিণ্ডি জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এছাড়া খুদাই খিদমতগারদের মধ্যে যাদের আটক করা হয়েছিল অথবা গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল অথবা যাদের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সরকার তাদের উপর থেকে এই আদেশ তুলে নিলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আবদুল গফফার খানকে রাওয়ালপিণ্ডির সারকিট হাউসে গৃহ-অন্তরীণ করে রাখা হল। তাঁকে চিঠিপত্র লেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বাইরের কোন লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

পারতো না। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রাওয়ালপিণ্ডির সারকিট হাউসের মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করতে হচ্ছিল। এই অবস্থায় তাঁকে ১৯৫৪ সালের ২০শে মার্চ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। এই গণপরিষদের অধিবেশনে তিনি পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার যে কুশাসন ও অনাচারের রাজত্ব চালিয়েছিলেন, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে আবদুল গফফার খানের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হল। এই বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে, তখন পর্যন্ত তাঁকে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি সরকারের কাছে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, হয় তাকে তার নিজের প্রদেশে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হউক, নয়ত তাকে জেলখানাতেই আটক করে রাখা হোক। এই প্রস্তাবের উত্তরে সরকার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আগামী ২/৩ মাসের মধ্যেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে।

ইতিপূর্বে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাকিস্তানের এই চারটি প্রদেশকে নিয়ে পাকিস্তান সরকার এক ইউনিট গঠনের পরিকল্পনা করেছিল। এটা খুবই দুঃখের কথা ডাঃ খান সাহেব্ব এই এক ইউনিট প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আবদুল গফফার খান এবং তাঁর পার্টি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক ইউনিট প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করে এসেছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করলে তার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে, এই আশঙ্কা একেবারেই সত্য নয়। বরঞ্চ জোর করে সকলের উপর এক ইউনিট চাপাতে গেলে তার বিপরীত ফলই ফলবে। তবে জনসাধারণ এ সম্পর্কে যে রায় দেবে তিনি তা মেনে নিতে রাজি আছেন।

আবদুল গফফার খান এক ইউনিটের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য সমগ্র পাকিস্তান সফরের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে সীমান্ত প্রদেশের সফর শেষ করে প্রচার কার্যের উদ্দেশ্যে বেলুচিস্তানে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে তাঁর পক্ষে

বেলুচিস্তান সফর করা সম্ভব হয় নি। অতঃপর এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য তিনি করাচি, পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলা সফর করলেন।

ডাঃ খান সাহেব ইতিপূর্বে এক ইউনিটের প্রশ্নে তাঁদের পার্টি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সরকারী দলে যোগদান করেছিলেন। আবদুল গফফার খান তার সম্পর্কে এই স্পষ্টোক্তি করতে দ্বিধা করেন নি, "ডাঃ খান সাহেব পাঞ্জাবীদের উৎকোচ নিয়ে পাঠানদের সর্বনাশ সাধন করছেন। যে লোক নিজের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে এ লোক সৎ আর ও লোক অসৎ বলে প্রচার করে বেড়ায়, তাকে আমরা কোনমতেই পাঠানদের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না।"

১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে আবদুল গফফার খানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল। ১৯৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মামলায় এই রায় দিলেন যে, তাঁকে আদালত চলাকালীন সময় পর্যন্ত আটক থাকতে হবে এবং চৌদ্দ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হবে। আবদুল গফফার খান জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানাবার ফলে সরকার তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জরিমানার টাকা আদায় করে নিলেন।

আবদুল গফফার খান ও তাঁর পার্টি এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আরও কয়েকটি ছোট ছোট পার্টি তাদের সমর্থক ছিল। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছয়টি বিরোধী দলকে নিয়ে যে ন্যাশনাল পার্টি গঠিত হয়েছিল, ১৯৫৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী আবদুল গফফার খানের পার্টিও তার সঙ্গে যোগ দিল। তারা অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দাবী জানাল। তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, যেহেতু ইতিপূর্বে এক ইউনিট পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হয়নি, সেই কারণে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই এ সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে হবে।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আবদুল গফফার খান, মৌলানা ভাসানী,

জি, এম, সৈয়দ এবং মিঞা ইফতেখার উদ্দিন ঢাকায় সম্মিলিত এক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকারের আভ্যন্তরীণ দলাদলির ফলে ঘনঘন মন্ত্রিসভার অদল বদল ঘটছিল। সেই কারণেই ডাঃ খান সাহেবকে সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হতে হয়েছিল। আবার সেই কারণেই তাকে শেষ পর্যন্ত গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হল।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে এক নূতন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হল। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল আয়ুব খান তথাকথিত এক নূতন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিলেন। ফলে ১৯৫৮ সালে ১১ই অক্টোবর তারিখে আবদুল গফফার খান এবং পূর্ববঙ্গের আট জন বিশিষ্ট নেতা 'পাবলিক সেফ্‌টি এ্যাক্ট' অনুসারে গ্রেফতার হলেন। তাছাড়া বেলুচিস্তানের জনপ্রিয় নেতা আবদুস সামাদ খানকেও গ্রেফতার করে তাঁকে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। পাকিস্তানের সর্বত্র সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল। অতঃপর ২৭শে অক্টোবর তারিখে জেনারেল আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে গদিচ্যুত করে এবং তাঁকে কোয়েটায় অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা করে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আসন গ্রহণ করে বসলেন। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হল।

১৯৫৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে সামরিক সরকার আবদুল গফফার খানের বার্দ্ধক্য ও স্বাস্থ্যহানির কারণ দেখিয়ে তাঁর মুক্তিদানের নির্দেশ দিলেন।

মুক্তি লাভের পর আবদুল গফফার খান সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে চললেন এবং আয়ুব খানের সামরিক সরকারের স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে ১৯৬১ সালের ১১ এপ্রিল আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তারের পর ছ'মাস বাদে বাদে তাঁর আটকের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

সামরিক শাসন চালু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। সামরিক সরকারের এই অনাচারের

বিরুদ্ধে কেউ সামান্যতম প্রতিবাদ করলেও তাকে দমন নীতির শিকারে পরিণত হতে হত। বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান আয়ুব খানের জঙ্গী সরকারের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সংগ্রামী জনতা তাঁদের বিশিষ্ট নেতারা জেলখানায় অবরুদ্ধ থাকলেও এই স্বৈরাচারী বিধি-নিষেধকে নিঃশব্দে মেনে নেয় নি। সারা পাকিস্তানে এই প্রতিবাদ-আন্দোলনে তারাই সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ফলে এই দুটি প্রদেশের উপর মাসের পর মাস ধরে জঙ্গী সরকারের হিংস্র আক্রমণ চলেছিল। এই আক্রমণে বহু লোককে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে এবং নানাভাবে জীবন দিতে হয়েছে। এমনকি এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বেলুচি-স্তানের নিরস্ত্র জনতার উপর বোমাবর্ষণ পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত নিষ্ঠুর ও বিভৎস ঘটনা যখন ঘটে চলছিল তখন এই দুটি প্রদেশের খবর বাইরের কেউ ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারে নি। বেশ কিছুকাল বাদে এ সমস্ত খবর জানা গিয়েছিল। ১৯৬৩ সালে একমাত্র সীমান্ত প্রদেশেই সর্বসমেত ৩০০০ কর্মী জেলখানায় পচে মরছিল এবং তাদের প্রায় ৪২ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

দীর্ঘ কারাবাস ও জেল কর্তৃপক্ষের অমানুষিক আচরণের ফলে আবদুল গফফার খান অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অবস্থা এতই আশংকাজনক হয়ে পড়েছিল যে, ১৯৬৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে সরকার তার মুক্তির নির্দেশ দিলেন। জেলখানায় তার মৃত্যু ঘটলে ব্যাপারটা বড়ই দৃষ্টিকটু হবে এই আশংকায় সেদিন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

যখন তিনি মুক্তি পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর শয্যাশায়ী অবস্থা। তাঁর সহকর্মী ও আপনজনদের মনে তাঁর জন্য গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ ছিল না যে, এই সামরিক সরকার তাঁকে কোনও রকম কাজ করার সুযোগ দেবে না, ফলে দুদিন বাদে আবার তাকে জেলে যেতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কারাগৃহের অন্তরালে পৃথিবীর বুক থেকে চির বিদায় নিতে হবে। তাই তাঁর কাছে সকলের অনুরোধ, তিনি যেন দেশত্যাগ করে আফগানিস্তানে চলে যান। আবদুল গফফার খান

সেদিন এক কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছিলেন। এই দুঃসময়ে তাঁর বিপন্ন দেশবাসীদের এই অবস্থার মধ্যে ফেলে তিনি কি করে বাইরে চলে যাবেন! কিন্তু সমস্ত দিক বিবেচনা করার পর এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি আপাততঃ আফগানিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আফগানিস্তান সরকার সেদিন সমগ্র পাঠান জাতির গৌরব সর্বজনশ্রদ্ধেয় বাদশা খানকে রাজ-অতিথির মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করে নিলেন। তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর মুখের কথা শোনবার জন্য সারা আফগানিস্তানের মানুষ দলে দলে কাবুলের পথে যাত্রা করল। তিনি যে ক'টি বছর আফগানিস্তানে কাটিয়েছেন, ততদিন তাদের কাছ থেকে শুধু শ্রদ্ধাই নয়, আপনজনের মতন ভালোবাসাও পেয়ে এসেছেন। কিন্তু তাই নিয়ে তাঁর মনে শান্তি বা তৃপ্তি ছিল না; এই দুদিনে যাঁদের ছেড়ে চলে এসেছেন তাঁদের কাছে ফিরে যাবার জন্য তাঁর প্রাণ ছটফট করে মরত। কাবুলে বসেও তিনি সীমান্ত প্রদেশের সহকর্মীদের কাছে আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে নির্দেশ পাঠাতেন।

১৯৬৯ সালে তিনি কয়েক মাসের জন্য কাবুল থেকে ভারত এসেছিলেন। স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পর এইবারই তিনি প্রথম এলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন যে, তিনি ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসেন নি। তিনি দেখতে এসেছিলেন সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের এই দুঃসময়ে ভারত সরকার ও ভারতের কংগ্রেস তাদের সাহায্য করার জন্য কিরকম উদ্যোগ ও প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে। দেশ বিভাগের সময় কংগ্রেস নেতারা বারবার তাঁকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সীমান্ত-প্রদেশের পাঠানরা যদি কখনও অত্যাচারের মুখে পড়ে, তাহলে ভারত অবশ্যই তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাবে। কিন্তু ভারতে এসে কি দেখলেন তিনি? দেখলেন সীমান্ত প্রদেশের এই দুর্দিনে ভারত নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ভারত সফরের এই ক'টি মাসে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর মনের বেদনা, অভিমান ও বিক্ষোভ সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক

গণ-অভ্যুত্থান-এর ফলে আয়ুব খানের পতন ঘটল বটে, কিন্তু তার ফলে গণতন্ত্র ফিরে এল না, আন্দোলন বিপথগামী হয়ে যাওয়ার ফলে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন তার স্থান দখল করে নিল। অবশেষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জয়লাভের ফলে ১৯৭২ সালে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনেরও অবসান ঘটল।

এই অবস্থায় আবদুল গফফার খান আর কাবুলে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ফলে তাঁর কাজের সুযোগ আবার ফিরে এসেছে, এই আশা নিয়ে তিনি অবিলম্বে ফিরে এলেন স্বদেশে, তাঁর আপনজনদের মাঝখানে। কিন্তু পাকিস্তানের ভুট্টো সরকারের প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত হতে বেশীদিন সময় লাগল না। নামে গণতান্ত্রিক সরকার হলেও কার্যতঃ স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার দিক দিয়ে সামরিক সরকারগুলির সঙ্গে তার কোনও প্রভেদ ছিল না। ফলে সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সংগ্রামী জনতাকে আবার এক নূতন সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল। এবারকার সংগ্রাম-এর রূপ আগেকার সংগ্রামের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র ও ভয়াবহ। মার্কিন অস্ত্র সাহায্যে পরিপুষ্ট ভুট্টো সরকার পশতুভাষী পাঠান ও বেলুচদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করে দেবার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু তাদের সংগ্রাম আজও অব্যাহতভাবে চলেছে।

কিন্তু আজ দেশ-বিদেশের সকলের মুখেই এই প্রশ্ন, আবদুল গফফার খান আজ কোথায়? শোনা গেছে তাঁকে পাকিস্তান জেলে আটক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে এ সম্পর্কে কোনও উত্তরই পাওয়া যায় নি। সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রগতিশীল মানুষ আজ চির-সংগ্রামী আবদুল গফফার খানের নিরাপত্তা ও মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

মওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানী

মওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানী ছিলেন পাঞ্জাবের লুধিয়ানার অধিবাসী। তাঁদের বংশে একটি দেশপ্রেমিক ঐতিহ্য ছিল, যেটা নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখানে সেই পুরানো দিনের কাহিনীটির উল্লেখ করছি।

এই ঐতিহ্যের উৎস সন্ধানে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের যুগে। লুধিয়ানার ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট পরিবারটি এই মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। পরিবারের প্রধান ছিলেন আবদুল কাদের। দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ্ স্বাধীনতার ঘোষণার পর আবদুল কাদেরকে দিল্লীতে চলে আসার জন্য নির্দেশ পাঠালেন। সেই নির্দেশ পেয়ে আবদুল কাদের এবং তাঁর বীর ছেলেরা দিল্লীর পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু সে পথ বড় বিপজ্জনক, পথে পথে বৃটিশ সৈন্যদের ঘাঁটি। আবদুল কাদেরের সশস্ত্র দল সেই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে রাজধানী দিল্লী শহরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

আজাদ দিল্লীর পতনের পর আবদুল কাদের ও তাঁর পরিবার কোন মতে প্রাণ বাঁচিয়ে পাতিয়ালার অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বৃটিশ সরকার বহু চেষ্টা করেও তাঁদের গ্রেফতার করতে পারলো না। পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন 'এমনেসৃটি' বা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন, আবদুল কাদেরের পরিবার তখন লুধিয়ানায় ফিরে এলো। কিন্তু আবদুল কাদের তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে আসার সুযোগ পান নি। পথেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

আবদুল কাদেরের ছেলেরা দেশে ফিরে এসে তাঁদের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি ধর্মীয় শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৮৫ সালে যখন ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম হল, আবদুল কাদেরের ছেলেরা তাকে স্বাগত জানালেন। ঠিক সেই সময় বৃটিশ সরকারের প্ররোচনায় তাদের একান্ত

বশংবদ আলীগড় কলেজের কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। আবদুল কাদেরের ছেলে শাহ মহম্মদ স্যার সৈয়দ আহমদের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু মুসলমানের মিলনের আহ্বান জানিয়ে এক ফতোয়া জারি করলেন। এই ফতোয়ার নীচে এক হাজার উলেমার স্বাক্ষর ছিল। এই ফতোয়ার শিরোনামা ছিল "নসরত আল আব্বার" অর্থাৎ কল্যাণের বিজয়। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে হাজার হাজার ফতোয়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর থেকেই লুধিয়ানা উদারপন্থী জাতীয়তাবাদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আদর্শ প্রচারের জন্য প্রথমে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং পরে 'অবজারভার' নামে একটি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাঁদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁরা প্রথম থেকেই সরকারী কর্তৃ-পক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও 'অবজারভার' পত্রিকাটি ১৯১৯ সাল পর্যন্ত কোনমতে টিকে ছিল।

এই শাহ মহম্মদের পুত্র মওলানা মহম্মদ জাকেরিয়া এবং তাঁরই পুত্র মও-লানা হাবিবুর রহমান। তিনি ১৮৯২ সালে লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর খিলাফত সমস্যা নিয়ে সারা ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রবল বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। লুধিয়ানার আলেমরাও এই ব্যাপারে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু সমর্থনই নয়, এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তখন মওলানা হাবিবুর রহমান কংগ্রেসে যোগদান করেন।

হাবিবুর রহমান বাল্যকালে তাঁদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'মাদ্রাসায়' পড়েছিলেন। পরে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জালান্দরে, অমৃতসরে এবং সর্বশেষে ১৯১৪ সালে দেওবন্দে যান।

তিনি ১৯২৯ সালে 'মজলিস্-ই-আহরর' পার্টি গঠন করেন। 'আহরর' শব্দের অর্থ 'মুক্ত মানুষ' তাহলে 'মজলিস-ই-আহররের' অর্থ হলো 'মুক্ত মানুষের সংস্থা।' তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও

বাংলায় মজলিস-ই-আহরর পার্টিকে সংগঠিত করেন এবং তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

'মজলিস-ই-আহররের' ইতিহাস ও চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আরও কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। মুসলিম লীগ চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অবলম্বন করার ফলে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ থেকে একদল কর্মী মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ১৯২৯ সালে মওলানা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মজলিস-ই-আহরর গঠন করেন। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার যে প্রসার ঘটে তা' এই প্রতিষ্ঠানটির উপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। মজলিস-ই-আহররের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত নেতাদের ভাষণ থেকে আমরা তার পরিচয় পাই। সম্মেলনের সভাপতি চৌধুরী আবদুল হক তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন, "আমরা আমাদের দেশবাসীর জন্য এমন স্বাধীনতা চাই, যাতে সাধারণ গরীব লোকেরা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন।" মওলানা হাবিবুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "বর্তমান ধনতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে আমাদের গরীবের সরকার গঠন করে তুলতে হবে।" সাহেবজাদা ফজলুল হোসেন আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন, "পুঁজিপতিরা সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করে নিয়েছে, মজুররা তাদের হাতের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, এই অবস্থাকে আর কোনমতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না।"

'মজলিস-ই-আহরর' ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের জন্য এবং কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানায়। তাঁদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মুসলমান আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেছিল।

১৯৪০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'মজলিস-ই-আহররের' প্রাদেশিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি থেকে 'মজলিস-ই-আহররের' আদর্শ ও লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। মজলিস-ই-অহররের এই সম্মেলন এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পুনরায় তার এই দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করছে যে, ভারতের পুর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা লাভই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে দেশের লোক

যে দুর্দশার মধ্যে আছে তার প্রতিকার হবে এবং এই স্বাধীনতা ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সহায়ক হবে। এই সম্মেলন এই অভিমত পোষণ করে যে, ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করার যে পরিকল্পনা চলছে, তাকে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী করা যেতে পারে না। তার ফলে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার মনোভাব ক্রমশঃই বেড়ে চলবে। এই সম্মেলন মনে করে যে, যেহেতু এই উপ-মহাদেশে এই দুটি অংশের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই, সেই কারণে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ স্থায়ী পরিণতি হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে ভারত যে সমস্ত প্রদেশে বিভক্ত আছে, স্বাধীনতা লাভের পরেও সেই-ভাবেই প্রদেশগুলি গঠন করা বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভবও বটে। তবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে হিন্দুদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে সকল প্রদেশের জন্য একই রকম আইন প্রণয়ন করতে হবে।

এই সম্মেলন আরও মনে করে যে ভারতের সকল বয়স্ক লোকদের স্বেচ্ছা ও স্বাধীনভাবে প্রদত্ত ভোটদানের ভিত্তিতে গঠিত গণ-পরিষদে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র রচিত হওয়া উচিত। একমাত্র সেই গঠনতন্ত্রই সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে।

মুসলিম লীগই সমস্ত ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, 'মজলিস-ই-আহরার' সব সময় কথায় ও কাজে তাদের এই দাবীর প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত 'মজলিস-ই-আহরার' বিরামহীনভাবে তার আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে মওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানীর আরও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। তার উদ্যোগেই কাশ্মীর, কপূর্রথলা, বাহওয়ালপুর, কাদিয়ান প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।

মওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানী আদর্শ ও দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অনুসরণ করে এসেছিলেন। জহরলালের সঙ্গেও

তাঁর গভীর অনুরাগের সম্পর্ক ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের মুখের দিকে চেয়ে তিনি কখনও তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে যেখানেই তাঁর মতভেদ ঘটেছে, তিনি সুস্পষ্টভাবে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই স্পষ্টোক্তি সত্ত্বেও তিনি সকলের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন।

মওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানী ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে পরলোক গমন করেন। এই দেশপ্রেমিকের কর্মবহুল জীবন সমগ্র জাতির এক পরম সম্পদ।

শহীদ আব্দুস সামাদ খান আচকজাই

বালুচ জাতির বাসভূমি বেলুচিস্তান। এই বালুচরা উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের পাখতুন বা পাঠানদের মত এই ইতিহাসের অজানা কোন এক অধ্যায়ে সীমান্তের ওপার থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সে কতকাল আগের কথা, কেনই বা তাদের নিজেদের দেশ ছেড়ে এই দুর্গম অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে নানারকম মতভেদ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে তারা মোটামুটিভাবে একমত যে এই বালুচরা যে কোন কারণেই হোক একদিন কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলের আদিভূমি ত্যাগ করে এখানে চলে এসেছিল।

কিন্তু আজকের দিনের বালুচরা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বংশপরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত অতীত যুগের সেই স্মৃতি তাদের মন থেকে একেবারেই মুছে গেছে। এই বেলুচিস্তানকেই তারা তাদের নিজস্ব বাসভূমি এবং অবিভক্ত ভারতকেই তারা তাদের স্বদেশ বলে জেনে আসছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে বেলুচিস্তানের বালুচরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পাখতুন বা পাঠানদের মতই এক উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এরা সকলেই ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমান, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা এদের রাজনৈতিক জীবনে কোনরূপ ছায়াপাত করতে পারে নি। সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনদের মত এরাও ভারতের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করে এসেছে। সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের জননেতা আবদুল গফফার খানের মত যিনি বালুচদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শোষণনীতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, সেই আবদুস সামাদ খান বা 'বালুচ গান্ধী'র নাম সারা উপমহাদেশে সুপরিচিত।

সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের মত বালুচদের মাতৃভাষা পশতু। এই

পশতু ইন্দো-ইরানীয় আর্য ভাষার একটি শাখা। ব্যক্তিচরিত্র, জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক দিক দিয়ে এই দুটি জাতির মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম এবং অপরিসীম দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগের মধ্য দিয়ে এই দু'টি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে চলেছে। যে দুজন জনপ্রিয় জননেতা একই সময়ে এই দুটি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন, তাদের দুজনের রাজনৈতিক জীবনেও আশ্চর্য মিল দেখা যায়। সমাজের কল্যাণ ও জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুজন নেতা বিদেশী ও দেশীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। এরা দুজনই শান্তিপ্রিয় স্বভাবের মানুষ, কিন্তু শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের অভিলাষে এরা কোনদিনই জাতির দুশমনদের সঙ্গে অবাঞ্ছনীয় আপোস বা তাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পা বাড়ান নি।

এটা খুবই বিস্ময়ের কথা যে প্রায় একই সময় অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই দুটি জাতির মধ্যে প্রায় একই সময় এই দুজন জন-নায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল। আবদুল গফফার খান ১৮৯১ সালে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। খুব সঠিকভাবে বলা না গেলেও একথা বলা চলে ১৮৯৫ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে আবদুস সামাদ খানের জন্ম হয়েছিল। এদের দুজনের সংগ্রামী জীবন ও অদম্য আদর্শনিষ্ঠা বহু বিভক্ত সারা ভারতের অধিবাসীদের এক বিরাট সম্পদ, এক বিরাট ঐতিহ্য।

আবদুস সামাদ খান কোয়েটার নিকটবর্তী গুলিস্তান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান। তাঁর পিতা খান নূর মহা-মেদ খান ছিলেন একজন ধনী জমিদার ও আচকজাই কওমের (tribe) সরদার। আবদুস সামাদ খানের অপর দুই ভাই এর নাম আবদুস সালাম খান ও মহম্মদ আয়ুব খান।

বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারের উপর একান্তভাবে নির্ভর-শীল হয়ে পড়ার ফলে পাঠান ও বালুচদের এই সমস্ত সরদার অর্থাৎ সমাজ-পতিরা তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ ও চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা

প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষদের নানাভাবে শোষণ করে চলত। সীমান্ত প্রদেশের মত বেলুচিস্তানেও তারা বৃটিশ অফিসারদের এজেন্ট বা দালাল হিসাবে কাজ করে আসছিল। এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও আবদুস সামাদ খান তাঁর স্বাভাবিক গণমুখী চরিত্র থেকে কোনদিনই ভ্রষ্ট হন নি। তাই তাঁর মহিমাময় জীবন দুঃখ দুর্দশা ও অত্যাচারে লাঞ্ছিত সমগ্র বালুচ জাতির সামনে এক অনির্বাণ আদর্শরূপে বিরাজ করছে।

তখনকার দিনের বেলুচিস্তানে আধুনিক শিক্ষালাভের যেটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল, তা শুধু অবস্থাপন্ন ঘরের লোকদের ভাগ্যেই ঘটত। আবদুস সামাদ খান সমাজের রীতি অনুযায়ী শৈশবে মক্তবে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর নিজ গ্রাম গুলিস্তানে আধুনিক স্কুলেও পড়েছেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব হয় নি। তা হলেও ইতিমধ্যে তিনি উর্দু, ফারসী ও পশতু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবন স্থগিত থাকলেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সব সময়ই আগ্রহশীল ছিলেন। বহুকাল বাদে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আয়ুব খানের সামরিক শাসনের আমলে তাঁর ১৯৫৮-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত জেল জীবন যাপনের সময় তিনি পর্যায়ক্রমে ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট এবং পরিশেষে সসম্মানে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁর বয়স ৭০ এর কাছাকাছি।

আবদুস সামাদ খান এই সত্যটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজের আমূল সংস্কার ছাড়া শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বালুচ জাতির সত্যিকারের উন্নতি কখনও সম্ভব হতে পারে না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি আর তাঁর কয়েকজন সহকর্মী আঞ্জুমান-ই-বতন নামক একটি সমাজ সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। আঞ্জুমান মানে সমিতি আর বতন (ওয়তন) হচ্ছে স্বদেশ। এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তারা অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুবই আশ্চর্যের কথা, সীমান্ত প্রদেশের নেতা আবদুল গফফার খানের কর্মজীবনও ঠিক এইভাবে শুরু হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট রূপান্তর ঘটে চলেছিল। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান সারা ভারতের জনগণের মনে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে তুলেছিল। আবছুস সামাদ খান এই বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এবার তিনি নিজ প্রদেশ বেলুচিস্তানের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজে নামলেন। সেদিন প্রতিবেশী পাঠান জাতির মতো বালুচরাও এই আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবছুস সামাদ খান কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করেছিলেন এবং তাঁর আঞ্জুমান-ই-বতন প্রতিষ্ঠানটি সাংগঠনিকভাবে ভারতীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করেছিল। এই ক'টি বছরের মধ্যেই তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৮-২৯, এই বছরটি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল। কেননা এই সময় তিনি উত্তর ভারতে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান নওজোয়ান ভারত সভার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তার ফলে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে নূতন চরিত্র সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল।

তিনি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আরও কয়েকটি রাজনৈতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। লাহোরের এক সভায় তিনি বেলুচিস্তানে বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির প্রতিবাদ করে এক অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। লাহোর থেকে বেলুচিস্তানে ফিরে আসার সময় তিনি বহু রাজনৈতিক পুস্তক পুস্তিকা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

১৯৩০ সালে আবছুস সামাদ খান ও তাঁর তুই ভাইকে গ্রেফতার করে কোয়েটায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখানকার জির্গার বিচারে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁরা তুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আবছুস সামাদ খান সরকার কর্তৃক আরোপিত কঠিন বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়েও তাঁর রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বেলুচিস্তানের বাইরে সিন্ধু প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণ বালুচ জাতির লোকের বসতি আছে। হায়দ্রাবাদে (সিন্ধু) বালুচদের এক সম্মেলনে আবদুস সামাদ খান বেলুচিস্তানের অধিবাসীদের নিদারুণ দুরবস্থার কথা বর্ণনা করে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীদের তিনি এই আবেদন জানান যে তারা যেন সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাহায্যে হায়দ্রাবাদের লোকদের এই দুরবস্থার অবসান ঘটান, যাতে তারা আর সকলের মতই সমান সুযোগ সুবিধা, সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে। বেলুচিস্তান যাতে একটি প্রদেশের মতই পূর্ণ মর্যাদা পেতে পারে, এই দাবী জানিয়ে এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে 'বেলুচিস্তান রিফর্ম কমিটি'র উদ্যোগে আহুত করাচীর এক সভায়ও তিনি যোগদান করেছিলেন। এই সভায় তিনি বেলুচিস্তানের অধিবাসিরা যেন রাজনৈতিক অধিকার লাভ করতে পারে বৃটিশ সরকারের কাছে এই দাবী জানিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া ঘটতে বেশী দেরী হল না। বেলুচিস্তানে ফিরে আসার পরেই তাঁকে গ্রেফতার হতে হল এবং জির্গার বিচারে তিনি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

আবদুস সামাদ খানের মুক্তির দাবীতে বেলুচিস্তানের যুব সংগঠনগুলি এবং করাচীর বেলুচিস্তান রিফর্ম কমিটি এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে তুলেছিল। বালুচদের মধ্যে আবদুস সামাদ খানের এই বিপুল জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বৃটিশ সরকার সেদিন যথেষ্ট চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আবদুস সামাদ খান বেলুচিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চললেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য তিনি ১৯৪০ সালে ওয়ারদায় গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন শুরু করবার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু আন্দোলন শুরু করার আগেই ভারতের অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মত তাঁকেও গ্রেফতার হতে হল। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই আবদুস সামাদ খান আবার তাঁর কার্যক্ষেত্রে নেমে পড়লেন।

এ সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। আবদুস সামাদ খান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করে গেছেন। তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন। তিনি রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে সফর করতে গিয়েছিলেন। সেই সমস্ত প্রচার সভায় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলবার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালে এ কথাটা পরিষ্কার ভাবেই বোঝা গেল যে বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী পূরণ করবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন। এই অবস্থায় আবদুল গফফার খান ও আবদুস সামাদ খান পাঠান ও বালুচদের স্বাধীনতার জন্য পাখতুনিস্তান-এর দাবী উত্থাপন করলেন। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের নেতারা যখন দেশ বিভাগের প্রস্তাবকে মেনে নিলেন। তখন সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে আবদুস সামাদ খানের রাজনৈতিক জীবনে গভীর হতাশার কালো ছায়া নেমে এল।

কিন্তু সাময়িকভাবে হতাশ হয়ে পড়লেও আবদুস সামাদ খান ভেঙ্গে পড়ার পাত্র নন। সেই কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি দৃঢ়ভাবে তার আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আবদুস সামাদ খান দাবী তুললেন এই নবগঠিত রাষ্ট্রে তাদের স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ফলে মিঃ জিন্নাহর নির্দেশে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হল। এই দাবী তোলার অপরাধে তাঁকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কারাগারে জীবন-পাত করতে হয়েছে।

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৫৭ সালে তিনি পাকিস্তানের অন্যান্য প্রগতিশীল নেতাদের সঙ্গে মিলিতভাবে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু সে সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে এক দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। মহম্মদ আয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করলেন। পাকিস্তানের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হল। অবশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের অধিবাসীরা কোন

দিনই গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বাদ পায় নি। স্বাধীনতার যুদ্ধের এই অদম্য সৈনিকেরা তখনও বিরামহীনভাবে তাদের মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। সেদিন আয়ুব খানের সামরিক সরকার পাঠান ও বালুচদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে চূর্ণ করে দেবার জন্য যে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে তুলেছিল, তার তুলনা হয় না। বিচারের প্রহসন ছাড়াই বহু আন্দোলনকারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বেলুচিস্তানের ঈদের জমায়েতের উপর বোমা বর্ষণ করতেও এরা দ্বিধা করেন নি। সংবাদ-পত্রগুলির মুখ ছিল বন্ধ, সে সময় এ সমস্ত খবর বাইরের কোন লোক জানতে পারে নি।

১৯৫৮ সালে আবদুস সামাদ খান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এদিকে সারা পাকিস্তান জুড়ে আয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। পূর্ববঙ্গের ছাত্র সমাজ ও ব্যাপক জনসাধারণ এই আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে ১৯৬৯ সালে আয়ুব খানের পতন ঘটল। আয়ুব খান গদিচ্যুত হল বটে কিন্তু তার ফলে পাকিস্তানের জনসাধারণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটল না। আয়ুব খানের সামরিক সরকারের পরিবর্তে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার এসে তার স্থান অধিকার করে বসল। তারই পরিণামে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আন্দোলন পূর্ববঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে ১৯৭১ সালে অকথ্য অত্যাচার, লাঞ্ছনা এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হল রক্তস্নাত নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রঙ্গমঞ্চের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের এই সংগ্রামের ফলে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের পতন ঘটল। আয়ুব খানের সহকর্মী এবং তার মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য কুখ্যাত ভূট্টো এই গোলযোগের সুযোগ নিয়ে সরকারের গদি দখল করে বসল। দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত ভূট্টোর এই সরকার নামে সামরিক সরকার নয় বটে, কিন্তু কার্যতঃ সামরিক সরকারের সঙ্গে তার চরিত্রগত কোনই প্রভেদ নেই। ইতিপূর্বে রাজনৈতিকভাবেই সচেতন

ও সক্রিয় পাঠান ও বালুচদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন চলে আসছিল, ভূট্টোর আমলে তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। তদুপরি সরকারের প্ররোচনায় তাদের দালাল ও উপদলগুলি বিরোধী পক্ষের নেতা ও কর্মীদের গুপ্ত হত্যার কাজে নিয়োজিত হল। বহু বিশিষ্ট কর্মীকে এই গুপ্ত হত্যার শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। এই শহীদদের মধ্যে বিশিষ্টতম যিনি তিনি হচ্ছেন ৯০ বছরের বৃদ্ধ আবদুস সামাদ খান আচকজাই। শহীদ আবদুস সামাদ খানের রক্তপাতে পবিত্র বেলুচিস্তানে আজও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বীর বালুচদের দুর্দম সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

———